এটিএম শামসুল হুদা

ফিরে দেখা জীবন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে ব্রিটিশদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া আমাদের শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্তমান অবস্থা কী এবং কেন তারা এই দশায় পৌঁছেছে, লেখকের সুদীর্ঘ কর্মজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে খণ্ড খণ্ড চিত্রের মাধ্যমে এ বইয়ে তা উপস্থাপন করা হয়েছে। বর্ণিত সব ঘটনা লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত। গল্পের মতো করে লেখা এসব ঘটনা পাঠককে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর ভেতরের অনেক অজানা বিষয় সম্পর্কে যেমন অবহিত করবে, তেমনি এসব অনাচার থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কীভাবে নিজেকে রক্ষা করা যায়, সে সম্পর্কেও তাঁরা কিছু ধারণা লাভ করতে পারবেন।

Prothoma
201402000210
360.00

ISBN 978 984 90660 5 4
9 789849 066064
Taka 360.00

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠান কীভাবে চলবে তার আনুষ্ঠানিক বিধিবিধান আছে। কিন্তু অন্তরালে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ, অনুরাগ-বিরাগও এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় বিশাল ভূমিকা রাখে। সাধারণ নাগরিকেরা এসবের কিছুই জানতে পারেন না। এটিএম শামসুল হুদা অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বাংলাদেশের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। এ বইয়ে তিনি তাঁর স্কুলজীবন থেকে শুরু করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনে অতিবাহিত সময়কাল পর্যন্ত কিছু প্রতিষ্ঠানে পর্দার অন্তরালে সংঘটিত কিছু সত্য ঘটনা গল্পচ্ছলে উপস্থাপন করেছেন। বিধৃত কাহিনিগুলো পাঠ করে পাঠকের মনে কিছুটা হতাশা জন্মাতে পারে, তবে সবচেয়ে বড় কথা পাঠক এর মধ্যে আশার আলোও দেখতে পাবেন। সহজ ভাষায় লেখা সুখপাঠ্য একটি বই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোকচিত্র : খালেদ সরকার

এটিএম শামসুল হুদা

জন্ম ১০ জুলাই ১৯৪৩, মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে বিএ (অনার্স) ও এমএ-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে ১৯৬৬ সালে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জনপ্রশাসন বিষয়ে এমএ এবং পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন। ৩৪ বছরের চাকরিজীবনে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সরকারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে সর্বোচ্চ নির্বাহী পদে দায়িত্ব পালন শেষে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে ২০০০ সালে অবসর গ্রহণ। বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন (২০০৭-১২)। এটিএম শামসুল হুদা দেশ-বিদেশে অনুষ্ঠিত সভা-সেমিনারে বহু প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। ইংরেজিতে লেখা তাঁর বইয়ের মধ্যে *স্মল ফারমার অ্যান্ড দ্য প্রবলেম অব অ্যাকসেস* এবং *কো-অর্ডিনেশন ইন পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন বাংলাদেশ* উল্লেখযোগ্য। এটিএম শামসুল হুদা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, ঢাকার বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য এবং বাংলা একাডেমির সাম্মানিক ফেলো।

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরে দেখা জীবন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটিএম শামসুল হুদা

ফিরে দেখা জীবন

প্রথমা প্রকাশন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরে দেখা জীবন
গ্রন্থস্বত্ব © এটিএম শামসুল হুদা
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০১৪
মাঘ ১৪২০, ফেব্রুয়ারি ২০১৪
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : কাইয়ুম চৌধুরী
সহযোগী শিল্পী : অশোক কর্মকার
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৪১ তোপখানা, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ৩৬০ টাকা

Fire Dekha Jibon
by ATM Shamsul Huda
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone : 8180081
e-mail : prothoma@prothom-alo.info

Price : Taka 360 only

ISBN 978 984 90660 6 4

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

আমার সহধর্মিণী
নীলুফার হুদা
ও
অতি আদরের সন্তান
সীমান হুদাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

ভূমিকা	৯
পূর্বলেখ	১৩
শিক্ষাজীবন : ফরিদপুর জিলা স্কুল	২০
শিক্ষাজীবন : রাজেন্দ্র কলেজ ফরিদপুর	২৮
শিক্ষাজীবন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৪৫
চাকরিজীবনের প্রস্তুতিপর্ব : আইসিএস, আইএএস এবং সিএসপি	৬১
চাকরিজীবনের প্রস্তুতিপর্ব : কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং সিএসএস	৭৭
চাকরিজীবনের প্রস্তুতিপর্ব : শিক্ষানবিশকাল	৯৪
কর্মজীবন : মাঠপর্যায়	১১৫
কর্মজীবন : সচিবালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	১২৯
নির্বাচন কমিশনের সময়কাল	১৬৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

কালের কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই—কাল অনন্ত, অসীম। তবু কালপ্রবাহের নিরন্তর স্রোতে সিক্ত মানুষ যুগে যুগে, দেশে দেশে এমন কিছু অসাধারণ ঘটনার সৃষ্টি করে কিংবা মুখোমুখি হয়, যা অসীমকে সীমায় আবদ্ধ করে ওই সময়কালকে একধরনের বিশিষ্টতা ও স্বকীয় রূপ দেয়। এই স্বকীয়তা এতই সুস্পষ্ট ও উচ্চকিত যে, সহজেই এই সময়কালকে আগের ও পরের সময়কাল থেকে পৃথক করে দেখা যায়।

আমাদের প্রজন্মের অনেকেই তিনটি কালের মুখোমুখি হয়েছে। কালের পরিবর্তনের মূলসূত্র রাজনৈতিক, তবে রাজনীতির সঙ্গে আরও বহু কিছু ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকায় এসব ছিল একধরনের সামগ্রিক সামাজিক পরিবর্তন। ২০০ বছর পর ইংরেজ শাসকদের বিদায় একটি কালের অবসান এবং ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় আরেকটি কালের সূচনার ইঙ্গিত দেয়। নয় মাস সশস্ত্র সংগ্রামের পর পাকিস্তান থেকে অবমুক্ত হয়ে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তৃতীয়কালের যাত্রা শুরু হয়।

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি শাসন থেকে স্বাধীনতা অর্জনের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক অঙ্গীকার ছিল দেশে পূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে জনগণের উন্নত জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, ব্রিটিশরাজের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার ছয় দশকের অধিককাল পরও সেই অঙ্গীকার বহুলাংশে অপূর্ণই থেকে গেছে।

অথচ এমনটি না-ও হতে পারত। ব্রিটিশরাজের বিদায়কালে পাকিস্তান ও ভারত উভয় রাষ্ট্রই তাদের হাতে সযত্নে লালিত বিচারব্যবস্থা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইসিএসসহ বিভিন্ন সিভিল সার্ভিস ক্যাডার, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং সশস্ত্র বাহিনীর মতো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ সচল অবস্থায় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়। মেধাকে প্রাধান্য দিয়ে এসব প্রতিষ্ঠানের সব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও কর্মজীবন পরিচালনা করার ফলে তাঁরা নিজেদের কাজকর্মে ঈর্ষণীয় নিরপেক্ষতা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

উভয় দেশের রাজনৈতিক নেতাদের কিছু প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে, আইসিএস সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা থাকলেও দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এসব প্রতিষ্ঠানে কোনো মৌলিক পরিবর্তন না এনে আত্তীকরণ করা হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও নিরপেক্ষতা সুসংহত করার লক্ষ্যে মেধাভিত্তিক নিয়োগ এবং কর্মজীবনের পরিকল্পনাও অব্যাহত থাকে। ভারতীয় এবং কিছু কম মাত্রায় পাকিস্তানি মৌলিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্তর্নিহিত শক্তি এই সূত্র থেকে উৎসারিত ভাবলে তা অমূলক হবে না।

বাংলাদেশের সৃষ্টিলগ্নেও এসব প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ চালু অবস্থায় প্রয়োজনীয় লোকবলসহ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের সংগঠনে বিভিন্ন সময়ে তথাকথিত সংস্কারের অজুহাতে নেওয়া বিভিন্ন হঠকারী সিদ্ধান্ত এবং বিগত শতাব্দীর শেষ দশক থেকে ব্যাপক রাজনীতিকীকরণের মাধ্যমে তাদের নিরপেক্ষ কৃষ্টিকে যেমন নির্বাসিত করা হয়েছে, তেমনি সংগত কারণেই, এদের দক্ষতার ক্রমাবনতিও প্রকট আকার ধারণ করেছে।

দেশে সুষ্ঠু গণতন্ত্র বিকাশের স্বার্থে গণতন্ত্রচর্চার পাশাপাশি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, নিষ্ঠাবান বিরোধী দলের পরিপোষণ ও রাজনৈতিক সমঝোতার গুরুত্ব অনুধাবন করেও প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতারা হীন দলীয় স্বার্থে তা অব্যাহতভাবে উপেক্ষা করে গেছেন। বরং তাঁরা গণতন্ত্রকে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার হাতিয়ার হিসেবে দেখেছেন, যেখানে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁদের এই অভিলাষ পূরণে সবচেয়ে বড় বাধা। এরকম ধারণা থেকেই এসব প্রতিষ্ঠানকে নানা কৌশলে দুর্বল করে নিজ দলের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যে রাজনীতিকীকরণ করা হয়। দলীয় আনুগত্য অবলীলাক্রমে মেধার স্থান দখল করে নেয়। দলীয়করণের এই বিষবাষ্প সর্বত্র ব্যাপৃত হয়ে দেশের আপামর জনসাধারণকেও প্রভাবিত করছে। এমন পরিস্থিতিতে দেশে আইনের শাসন, স্বচ্ছ ও জবাবদিহি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশাসন, সুষ্ঠু গণতন্ত্রের ধারা, দক্ষ ও নিরপেক্ষ আমলাতন্ত্র—এককথায় দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সুদূরপরাহত হয়েছে। উন্নত-শির সব রাষ্ট্রীয় মৌলিক প্রতিষ্ঠান কালান্তরের আবর্তে এখন বিপন্ন।

পক্ষান্তরে পাকিস্তান, যাকে অনেক বাংলাদেশি বোদ্ধা ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যায়িত করতে চান, সেখানে আজও ব্রিটিশদের কাছ থেকে পাওয়া মৌলিক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো মোটামুটি নিরপেক্ষতা ও দক্ষতার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। সে দেশের রাজনীতি নানা পরস্পরবিরোধিতা ও আন্তর্জাতিক চাপের মুখে অনেকটা বিভ্রান্ত হলেও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতা সেখানকার রাজনীতিকে গণতন্ত্রের পথে ফিরিয়ে আনতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও ধারণতত্ত্ব বহুল আলোচিত এবং নতুন কোনো আবিষ্কার নয়। এই গ্রন্থে যা অভিনব, তা হলো এই প্রতিপাদ্য অবলম্বন করে ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলের কালান্তরিত প্রতিষ্ঠানগুলোর বাস্তব অবস্থা নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে খণ্ড খণ্ড চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন।

প্রথমে পাকিস্তানের উভয় অংশে এবং পরে বাংলাদেশে সুদীর্ঘ ৩৪ বছরের সরকারি চাকরি ও পরে পাঁচ বছর বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনকালে আমি অসংখ্য ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি। এসব ঘটনা সামগ্রিকভাবে কিংবা ব্যক্তিগত পর্যায়ে কখনো ছিল আনন্দের, কখনো বিষাদের; কখনো কাঙ্ক্ষিত, কখনো সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত—ঈর্ষা, বিদ্বেষ আর অপচিকীর্ষার ঘটনাও কম ছিল না। বর্ণিত ঘটনাগুলোর বিশেষত্ব এই যে, এসব আমার চোখের সামনে সংঘটিত হয়েছে কিংবা আমি সরাসরিই এসব ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলাম। এই প্রক্রিয়ায় যাঁদের সম্পর্কে দুটি ভালো কথা বলা সম্ভব হয়েছে, সেটি করতে আমি কোনো কার্পণ্য করিনি এবং সশ্রদ্ধচিত্তে আমি তাঁদের নামও উল্লেখ করেছি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বর্ণিত বিষয় সংবেদনশীল হওয়ায় এসব ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছি। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আজ আর জীবিত নেই, তবে যাঁরা আছেন, তাঁরা গ্রন্থটি পাঠ করে আহত হলেও দেখবেন যে বর্ণনায় কোনো অতিশয়োক্তি নেই।

এ ধরনের একটি গ্রন্থ রচনার জন্য আমার পরিবারের সবাই, শুভাকাঙ্ক্ষী, বন্ধুবান্ধব ও আমার অনুরক্ত অনেক সহকর্মী আমাকে বহুদিন ধরে তাগিদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে আসছেন। সত্য ঘটনাসংবলিত এ ধরনের গ্রন্থ রচনার বিড়ম্বনা অনেক। অনেকেই সত্যকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে চান না। সে জন্য প্রথমে আমি কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত থাকলেও পরে লেখার সিদ্ধান্ত নিই।

গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব নিতে সম্মত হওয়ায় আমি *প্রথম আলোর* সম্পাদক মতিউর রহমান এবং এটি দ্রুত ও সর্বাঙ্গসুন্দর আকারে প্রকাশনার সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত জাফর আহমদ রাশেদকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এটিএম শামসুল হুদা
গুলশান, ঢাকা

২০ জানুয়ারি ২০১৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্বলেখ

২০০৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি।

নিত্যদিনের রুটিনমাফিক বাড়ির পাশে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন পার্কে হাঁটা শেষ করে বাসায় ফিরতেই আমার স্ত্রী নীলুফার হুদা জানালেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ আমার সঙ্গে জরুরি একটা বিষয়ে আলাপ করতে চান। সে জন্য তিনি তাঁর সরাসরি টেলিফোন নম্বরটিও দিয়ে রেখেছেন।

ড. ফখরুদ্দীন ও তাঁর পরিবার আমাদের বহু পরিচিত। ১৯৬০-এর দশকের প্রথম দিকে আমরা কিছু সময় একসঙ্গে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে কাটিয়েছি। তিনি অর্থনীতির ছাত্র ছিলেন আর আমি ইতিহাসের। পরে আমরা উভয়েই তদানীন্তন পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে (সিএসপি) যোগদান করি। আমার সিএসপিতে প্রবেশকাল ছিল ১৯৬৬ আর তাঁর ১৯৬৩। এরপর ২০০২ সালে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ পেলে আমার বাড়ির পাশেই গভর্নরের সরকারি বাসভবনে বসবাস শুরু করেন। আর সময় করতে পারলে কালেভদ্রে পার্কেও হাঁটতে আসতেন। সেখানেও তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে অনেক কথাবার্তা হতো।

চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর আমি যে প্রচুর কনসালট্যান্সি করছি, ড. ফখরুদ্দীন তা জানতেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের সংস্কার কর্মসূচির ওপর একটা বিরাট কনসালট্যান্সি প্রকল্পে আমি অনেকের সঙ্গে উপদেশক হিসেবে চূড়ান্তভাবে মনোনীত হয়েছিলাম। এই কনসালট্যান্সি আরও দেড় বছর আগে শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাংলাদেশে যা হয়, এটার প্রক্রিয়াকরণে নানা বিপত্তির কারণে মূল সময়সূচি আর ঠিক থাকেনি। আমি এটির কথা ভুলেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়েছিলাম এবং ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যের ব্লুমিংটনে ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগে অধ্যয়নরত আমার মেয়ের এমবিএ-অনুবর্তী সমাবর্তন উৎসবে যোগ দেওয়ার সব বন্দোবস্ত চূড়ান্ত করে ফেলেছি। দুটি কার্যক্রম একই সময়ে পড়ে যাওয়ায় ওই উপদেশনার কাজটি আর করা সম্ভব হয়নি।

ড. ফখরুদ্দীন মনে হয় আমাকে কোনো একটা কনসালট্যান্সির কাজ দিতে চান—তাঁর জরুরি টেলিফোন কলের ওপর এই ছিল আমার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। আমি কিছুটা সময় বিশ্রাম করে গোসল সেরে তাঁকে টেলিফোন করলাম।

—হুদা, তোমার সঙ্গে খুব জরুরি একটা কথা আছে। যত তাড়াতাড়ি পারো তুমি যমুনায় চলে আসো। টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে ড. ফখরুদ্দীনের পরিচিত কণ্ঠস্বর।

শেরাটন হোটেলের কাছে যমুনা নামধারী বিরাট ভবনটি হলো প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবন। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। সে সময় রাষ্ট্রপতির পদের পাশাপাশি একজন উপরাষ্ট্রপতির পদও সৃষ্টি করা হয়। ১৯৮০-এর দশকের শেষ দিকে উপরাষ্ট্রপতির সরকারি বাসভবন হিসেবে যমুনাকে গড়ে তোলা হয়। কিন্তু ১৯৯১ সালে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে ভবনটি অন্য কারও ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত হয়। বেশ কিছুকাল অব্যবহৃত থাকার পর ২০০১ সালে বিচারপতি লতিফুর রহমান প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ওই বাসভবনে বসবাস করে গেছেন। ড. ফখরুদ্দীনও ওই সূত্রে সেখানে বসবাস করছেন।

বাসায় ফিরেই আমি আমার ড্রাইভারকে সেদিনের মতো বিদায় দিয়েছি। যমুনায় ট্যাক্সি কিংবা স্কুটারে প্রবেশ কষ্টসাধ্য হবে চিন্তা করে আমি পরের দিন ভোরে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করার প্রস্তাব রাখলাম।

সব শুনে তিনি বললেন, না, কাল নয়, তোমাকে আজ রাতেই আসতে হবে। তুমি অপেক্ষা করো। আমি তোমাকে আনার একটা ব্যবস্থা করছি।

পাঁচ মিনিট পর আবার প্রধান উপদেষ্টার ফোন। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একজন অফিসার আমাকে বাসা থেকে তুলে নেবে এবং সাক্ষাতের পর আবার বাসায় পৌঁছে দেবে বলে জানালেন তিনি।

যমুনায় পৌঁছার পর বিরাট ড্রয়িংরুমের এক পাশে আমি আর তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুখোমুখি। দু-এক কথার পর তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরাসরি জানালেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার (প্রনিক) পদের জন্য আমাকে মনোনীত করা হয়েছে। এখন শুধু আমার সম্মতির অপেক্ষা।

প্রস্তাবটি শুনে আমি বিস্মিত হলাম। পূর্বতন কমিশন অকালে বিদায় নেওয়ার পর বেশ কিছুদিন ধরে বিভিন্ন মহলে এবং সংবাদমাধ্যমে পরিচিত অনেক সহকর্মী ও বন্ধুর নাম আলোচনা হচ্ছিল। কোনো আলোচনাতেই আমার কোনো স্থান ছিল না। ২০০০ সালে আমার অবসর গ্রহণের পর বিভিন্ন সরকারের আমলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে আমার বহু সহকর্মী নিয়োগ লাভ করলেও আমার বিষয়টি ভুলেও কেউ কখনো বিবেচনায় এনেছেন বলে মনে হয় না। সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর পুনর্নিয়োগ যখন অনেকটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল, তখনো কোনো বিবেচনাতেই আমি পুনর্নিয়োগের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হইনি।

বিচারপতি লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০১ সালে তৎকালীন অর্থ উপদেষ্টা এম হাফিজউদ্দিন খানের সুপারিশে আমাকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দিয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের কিছুকাল পরই সে পদ থেকে আমাকে বিদায় দেওয়া হয়। ওই একই সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের প্রস্তাব সব স্তর অতিক্রম করে সর্বোচ্চ পর্যায়ে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়।

এতসব ঘটনার পর কনসালট্যান্সিই যে আমার অবসর-উত্তর জীবনের সবচেয়ে নিশ্চিত ও নিরাপদ আধার, আমি তা মনে-প্রাণে মেনে নিয়েছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কনসালট্যান্সি দাতাদের আর্থিক সাহায্যনির্ভর, যেখানে বিবেচ্য বিষয়ের ওপর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রয়োগ শুধু কাম্যই নয়, অপরিহার্যও। এসব কারণে এই অধিক্ষেত্রটি মোটামুটি রাজনৈতিক প্রভাব ও গতানুগতিক প্রশাসনিক দুর্নীতিমুক্ত। সংগত কারণেই প্রধান উপদেষ্টার কাছ থেকে একটা ভালো কনসালট্যান্সির প্রত্যাশা নিয়ে আমি যমুনায় গিয়েছিলাম।

—স্যার, আপনার প্রস্তাবটি আমার জন্য খুবই সম্মানের। বর্তমান সময়ে এ ধরনের একটি আমন্ত্রণ পাব, এমন আশা করিনি। তবে বিষয়টি নিয়ে আমাকে ভাবতে হবে আর আমার পরিবার-পরিজনের সঙ্গে কথা বলতে হবে। সে জন্য কিছুটা সময়ের প্রয়োজন। আর আমার হাতে কনসালট্যান্সির একটি কাজ শেষ পর্যায়ে আছে; সেটি শেষ না করে অন্য কিছু চিন্তা করা বোধ হয় ঠিক হবে না।

প্রধান উপদেষ্টার প্রস্তাবের ওপর এতগুলো কথা আমি একনিঃশ্বাসে বলে ফেললাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—ঠিক আছে। তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের সঙ্গে কথা বলে মনস্থির করো। তবে কিছুকাল নয়, আগামীকালের মধ্যেই তোমার মতামত আমাকে জানাতে হবে। দ্রুত জাতীয় সংসদ নির্বাচন করা খুবই জরুরি। সবাই এখন দিন-ঘণ্টা গুনছে। আর সিইসি পদে যোগ দিয়েও তুমি তোমার কনসালট্যান্সির বাকি কাজ শেষ করতে পারবে। আমাদের তাতে আপত্তি থাকবে না।

আমার কথার ওপর ড. ফখরুদ্দীনের প্রতি-উত্তর; তাঁর দৃপ্ত কণ্ঠস্বর থেকে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, সিইসি পদে যোগ দিতে আমি সম্মত হব, এটা তিনি ধরেই নিয়েছেন। আমার অসমাপ্ত কনসালট্যান্সির কাজ কীভাবে শেষ করব, তারও একটা ইঙ্গিত তিনি দিলেন, যাতে আমার সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়।

অপর দুই কমিশনার কারা হচ্ছেন এবং আমরা স্বাধীনভাবে কোনো ধরনের সরকারি হস্তক্ষেপ ছাড়া কাজ করতে পারব কি না, সে সম্পর্কে আমি খোলাখুলিভাবে প্রশ্ন রাখলাম।

প্রধান উপদেষ্টা অপর দুই কমিশনার সম্পর্কে আমাকে অবহিত করে আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারব বলে আমাকে আশ্বাস দিলেন। প্রয়োজনে নতুন আইন করে কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করলেন।

৩ ফেব্রুয়ারি আমি টেলিফোন করে প্রধান উপদেষ্টাকে প্রস্তাবিত পদে নিয়োগের বিষয়ে আমার সম্মতি জানালাম।

এটি প্রক্রিয়াকরণ করতে দু-এক দিন সময় লাগতে পারে বলে তিনি জানালেন এবং খুব কম সময়ের নোটিশে শপথ গ্রহণের জন্য আমাকে প্রস্তুত থাকতে বললেন।

নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন এতটাই জরুরি ছিল যে বিদ্যুৎ-গতিতে আমাদের নিয়োগের প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো। ৫ ফেব্রুয়ারি আমি এবং অপর কমিশনার হুহুল হোসাইন শপথ নিয়ে দায়িত্বভার গ্রহণ করি। অপর কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেনের নিয়োগ চূড়ান্ত হতে কিছুটা দেরি হয়। তিনি ১৪ ফেব্রুয়ারি শপথ নিয়ে কাজে যোগ দিলে বাংলাদেশের একাদশতম নির্বাচন কমিশন সংগঠিত হয়।

২০০৫ সাল থেকেই প্রধান নির্বাচন কমিশনার, অপরাপর কমিশনার এবং কমিশনের সার্বিক কর্মকাণ্ড, ভালো-মন্দ যা-ই হোক, মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার হতে দেখেছি। এদের খবর প্রচারিত না হলে মিডিয়াকর্মীদের কাজটি সেদিনের মতো অসম্পূর্ণ থাকল বলেই বোধ হয় অনেকে মনে করতেন। তবে কমিশনের বিষয়ে এদের আগ্রহের গভীরতা আর অন্তহীন জিজ্ঞাসার প্রখরতা দায়িত্বভার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রহণের দিনই কিছুটা আঁচ করতে পারলাম। এদের কথায় মনে হলো, এক নির্বাচন কমিশন যেমন অনাকাঙ্ক্ষিত ক্রিয়াকাণ্ডের মাধ্যমে দেশের বিকাশমান গণতন্ত্রকে সংকটের অতল গভীরে নিপতিত করেছে, তেমনি আরেকটি কমিশনকে সঠিক পথ অনুসরণ করে দ্রুত নির্বাচন দিয়ে গণতন্ত্রকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। নতুন নির্বাচন কমিশনে যাঁরা এলেন, তাঁরা কেমন লোক, তাঁরা কোন পথে যাবেন, যা করতে চান তা করতে পারবেন কি না এবং তা করতে পারলে কত সময়ে পারবেন—এমন এবং আরও হাজারো প্রশ্ন নিয়ে এরা আমাদের মেয়াদ অন্তে বিদায়ের দিন পর্যন্ত আমাদের অনুসরণ করেছে।

কোনো দেশে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ কিংবা নির্বাচন কমিশনের প্রতিটি কর্মকাণ্ড দিনের পর দিন সার্বক্ষণিকভাবে মিডিয়ায় প্রচার হতে দেখা যায় না, যেমনটি ২০০৫ সাল থেকে বাংলাদেশে হয়ে আসছে। প্রায় সব দেশেই ওই সব পদে নিয়োগ এবং নির্বাচন কমিশনের কর্মকাণ্ড প্রতিষ্ঠিত নিয়মে নীরবে ও নিভৃতে সম্পাদিত হয়ে থাকে। বেশি দূরে না গিয়ে সার্কভুক্ত দেশগুলোর দিকে তাকালেই এর প্রমাণ মিলবে। কে কখন কোথায় নিয়োগ পেল কিংবা কমিশন কী করছে, যা করছে, তা ঠিক করছে কি না—এ নিয়ে জনগণের মধ্যে আগ্রহ থাকলেও কোনো উৎকণ্ঠা দেখা যায় না।

আমাদের দেশেও অনেকটা এমনটিই ছিল। এমনকি ১৯৮০-এর দশকের পর থেকে আন্তদলীয় কোন্দল, সন্ত্রাস ও বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনী অনাচার প্রকট হতে থাকলেও নির্বাচন কমিশন ও কমিশনারদের সম্পর্কে জনগণের মধ্যে একধরনের নির্লিপ্ততা ছিল।

১৯৯১ সালে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর মাগুরা উপনির্বাচনে সংঘটিত কেলেঙ্কারির ঘটনা ছাড়া নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে। কতিপয় ক্ষেত্রে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে সফল হতে না পারলেও জনগণ কমিশনের প্রতি কোনো বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন করেনি। নির্বাচন কমিশনকে তারা নির্বাচনী রাজনীতি থেকে পৃথক করে দেখেছে এবং রাজনৈতিক অপসংস্কৃতির দায়ভার কখনোই কমিশনের ওপর আরোপ করেনি।

২০০৫ সালে বিচারপতি এম এ আজিজের প্রনিক হিসেবে নিয়োগ হঠাৎ করেই মিডিয়াকে নির্বাচন কমিশন ও এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সচকিত করে তোলে। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের একজন কর্মরত বিচারপতি থাকা অবস্থায় অপর একটি সাংবিধানিক পদে নিয়োগ সম্পূর্ণ অবৈধ—একজন বিচারপতি হিসেবে এ তথ্য জানার পরও বিচারপতি আজিজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্বোক্ত পদে ইস্তফা না দিয়ে প্রনিকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সময়মতো নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্বার্থে বিরোধী দল ও মিডিয়া একটি গুরুতর অন্যায় উপেক্ষা করে এই আশায় যে তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা ও সততার সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করে যাবেন। কিন্তু প্রনিক তাঁর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কমিশনকে দেশের সংঘাতময় ও বিদ্বেষপূর্ণ রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলেন। দীর্ঘদিন ধরে বহু যত্নে লালিত কমিশন ও নির্বাচনী রাজনীতির বিভাজন আকস্মিকভাবে ধসে পড়ে। নির্বাচনী রাজনীতি অবশ্যই মিডিয়ার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। ওই রাজনীতির সঙ্গে কমিশন অবিসংবাদিতভাবে যুক্ত হয়ে যাওয়ায় কমিশনও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আজিজ কমিশন প্রণীত ভোটার তালিকা সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রধান অন্তরায় ছিল এমনটি ভাবলে একটি জটিল ও বহুমুখী সমস্যাকে অতি সহজ করে দেখার মতো হবে। ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নের দাবি ছিল অনেক গভীরে প্রোথিত সমস্যাগুলোর একটি দৃশ্যমান অনুষঙ্গ মাত্র। আসল বিষয় কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা। কোনো নতুন কমিশন কাজে এসেই এটা পায় না—তাদের আচার-আচরণ ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে এ বিশ্বাসযোগ্যতা গড়ে তুলতে হয়।

২০০৬ সালে অনুষ্ঠিতব্য নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতিপর্ব থেকেই কমিশনের প্রতি জনগণের আস্থার অভাব পরিলক্ষিত হয়। একটি নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য ভোটার তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে কমিশনারদের মধ্যে ঐকমত্যের অভাব এবং প্রনিকের একক সিদ্ধান্তে তড়িঘড়ি করে প্রণীত ভোটার তালিকার নির্ভুলতা ও স্বচ্ছতা সম্পর্কে জনমনে গভীর সন্দেহের সৃষ্টি হয়। অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ভোটার তালিকার প্রসঙ্গটি এত দূর গড়ায় যে বিরোধী দল কমিশন পুনর্গঠন করে সম্পূর্ণ নতুনভাবে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন, নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার বিরাজনীতিকীকরণ এবং স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স সংগ্রহের পরই নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি অব্যাহত রাখে। আর সরকার প্রনিক-নির্দেশিত ভোটার তালিকার ভিত্তিতে নির্বাচনী ব্যবস্থার কোনো রকম পরিবর্তন ছাড়াই নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে অনড় থাকে। একপর্যায়ে কমিশন ২২ জানুয়ারি ২০০৭ তারিখ নির্বাচনের দিন নির্ধারণ করে ঘোষণা দিলে বিরোধী দলের আন্দোলন আরও তীব্র আকার ধারণ করে। সহিংসতা এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে অনেক নিরীহ নাগরিককে জীবন হারাতে হয়।

অনাকাঙ্ক্ষিত এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরি অবস্থা ঘোষণা, ১২ জানুয়ারি ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে আরেকটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন, তৎকালীন নির্বাচন কমিশন-ঘোষিত ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে গৃহীত সব কর্মকাণ্ড অকার্যকর ঘোষণা, আজিজ কমিশনকে অপসারণ এবং নতুন কমিশন গঠন—এসব পদক্ষেপ নতুন এক রাজনৈতিক পরিবেশের জন্ম দেয়। এটি অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও অপ্রত্যাশিত ছিল না। প্রধান দুই দলের ছকে বাঁধা নির্বাচনী গণতন্ত্র হঠাৎ দৃশ্যপট থেকে অপসারিত হওয়ার ফলে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়—যদিও সংঘাতে বিধ্বস্ত এই দেশটি কোন পথে যাবে, তা নিয়ে মৌন সংশয়ের পাশাপাশি সুদিনের প্রত্যাশাই ছিল অধিকতর সমুজ্জ্বল।

আমি এমন একটা সময়ে প্রনিকের দায়িত্ব পেলাম, যখন প্রতিষ্ঠানটি একটি প্রাণহীন, মানহীন, ব্যর্থ ও অকার্যকর সত্তায় পরিণত হয়েছে। একযোগে প্রনিকসহ সব কমিশনারের অসম্মানজনক অপসারণ ও দুই বছর ধরে কমিশন সম্পর্কে অব্যাহত বিরূপ সমালোচনা কমিশনের ভাবমূর্তিকেই শুধু ক্ষুণ্ন করেনি, এর লিখিত-অলিখিত অনেক ক্ষমতাকেই নানা রকম প্রশ্নের মুখোমুখি করেছে। দ্রুত সংসদ নির্বাচন দিতে হবে—এ দাবির বিপরীতে পাথেয় একগুচ্ছ নির্বাচনী আইন, যা দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের জন্য অপেক্ষারত; একদল হতোদ্যম, নির্জীব ও নির্বাক কর্মী, যাঁরা একজন আলোর দিশারির আশায় ব্যাকুল প্রহর গুনছেন এবং রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, মিডিয়া ও দেশের আপামর মানুষ, যারা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে কমিশনকে সব ধরনের সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

শপথ গ্রহণের পরদিন নিজ দপ্তরে বসে মনে হলো, আমি যেন একটা পরিত্যক্ত তরি নিয়ে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগর পাড়ি দেওয়ার দুঃসাহসিক অভিযানে নেমেছি। এই অভিযানে সফল হতে গেলে এই তরিতে আবার প্রাণ ফিরিয়ে আনতে হবে, নবযাত্রার মন্ত্রে ঝিমিয়ে পড়া মাল্লাদের উজ্জীবিত করতে হবে, গাইতে হবে নতুন দিনের জয়গান। অতীতের দুঃখময় সব স্মৃতি ভুলে শক্ত হাতে হাল ধরে সাগর পাড়ি দিতে হবে। জীবনের চলার পথে আগেও কয়েকবার এমন কঠিন সময় পার করতে হয়েছে। সেসব অভিজ্ঞতার ওপর ভর করেই আমাকে এগোতে হবে। সেসবের বর্ণনা দিয়েই আমার সর্বশেষ অভিযাত্রার পটভূমি রচনা করতে চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষাজীবন : ফরিদপুর জিলা স্কুল

অনার্স ক্লাসে ভর্তি হওয়া পর্যন্ত স্বল্পকালীন একটা পর্ব বাদে মফস্বল শহরের স্কুল-কলেজেই আমার প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাজীবন কেটেছে। প্রথম জীবনে বাবার চাকরির ফেরে খুব দ্রুত স্কুল বদল হয়েছে—অতি অল্প বয়সে এতসব স্কুল বদল হয়েছে যে সেসবের কথা আমার ভালো করে মনেও নেই। একবার শুধু প্রায় দুই বছর ঢাকায় থাকার সুযোগ হয়েছিল, যখন আমি সেন্ট গ্রেগরিজ হাইস্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হই। পঞ্চম শ্রেণীর ক্লাস শেষ হতে না হতেই বাবা চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজ জেলা শহর ফরিদপুরে ব্যবসায় নামলেন এবং ওই শহরেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। যাযাবরের মতো বহু জনপদ ঘুরে অবশেষে আমাদের পরিবারের একটা স্থায়ী আবাস নিশ্চিত হলো।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগ পর্যন্ত ভালো লেখাপড়ার জন্য ঢাকা শহরের স্কুল-কলেজগুলোর এখনকার মতো একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল না। ঢাকার তৎকালীন নামীদামি স্কুল-কলেজগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার মতো স্কুল-কলেজ প্রতিটি জেলা শহরে তো ছিলই, এমনকি মহকুমা শহর এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোনো কোনো থানার স্কুল-কলেজও তাদের কাতারে শামিল হওয়ার যোগ্য ছিল। ১৮৩২ থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত সাবেক পূর্ব বাংলার ১৫টি জেলা সদরের ১২টিতে একটি করে জিলা স্কুল ও অপর তিনটিতে কলেজিয়েট স্কুল স্থাপিত হয়। পাকিস্তান আমলে কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন স্থানে উন্নতমানের হাইস্কুলও প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ ছাড়া বেসরকারি উদ্যোগে তদানীন্তন জমিদার ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা উন্নতমানের বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করে গেছেন। ১৯৫৮ সালে যে বছর আমরা ম্যাট্রিক পাস করি, সে বছর ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছার জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাইস্কুল থেকে দুজন পরীক্ষার্থী মেধাতালিকায় প্রথম ও পঞ্চম স্থান অধিকার করে। ওই সময় কোনো এক বছর ভোলা জেলার চরফ্যাশন স্কুল থেকে একজন শিক্ষার্থী ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করলে চরফ্যাশন কোথায় জানার জন্য আমরা শিক্ষকদের কাছে ধরনা দিয়েছিলাম বলে মনে পড়ে। আর বর্তমান চাঁদপুর জেলার মতলব উচ্চবিদ্যালয়ের অব্যাহত সফলতা তো এখন এক অমর আখ্যান।

আমার ভর্তির জন্য ফরিদপুর জিলা স্কুল বাবার পছন্দের তালিকার শীর্ষে ছিল। পাশে অবস্থিত ফরিদপুর হাইস্কুলও নামেধামে কম ছিল না। তবে জিলা স্কুলে ভর্তি হতে কোনো বিড়ম্বনা হলো না। সেন্ট গ্রেগরিজ হাইস্কুলের ব্রাদার জেমসের সনদ দেখে শিক্ষাবর্ষের শেষ প্রান্তে হলেও আমাকে ভর্তি করে নেওয়া হলো। দেশের প্রথিতযশা একটা স্কুলে ভর্তি হতে পেরে মনটা আনন্দে ভরে গেল। এক বিরাট ঐতিহ্যের মুখোমুখি দাঁড়ালাম। আজ আমরা নিচু ক্লাসের ছাত্র হলেও একদিন হয়তো আমাদেরও অবদান রাখার ডাক আসতে পারে।

১৮৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত স্কুলটির চারপাশে এক মনোমুগ্ধকর মনোরম পরিবেশ। স্কুলের সামনে ও পেছনে বিরাট খোলা মাঠ। পেছনের মাঠটি সামনের মাঠের চেয়ে দ্বিগুণ বড়। প্রতিদিন ক্লাস শুরুর আগে সামনের মাঠে পিটি ও ড্রিলে সবাইকে অংশগ্রহণ করতে হতো। আর পেছনের মাঠটি ছিল খেলার মাঠ। ক্লাস ছুটির পর সেখানে মূলত ফুটবল খেলা যেত। পড়াশোনার সঙ্গে খেলাধুলার সমান গুরুত্ব ছিল। প্রতিবছর খুব ধুমধামের সঙ্গে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। সেখানে সফল প্রতিযোগীদের আন্তস্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পাঠানো হতো।

স্কুলের মূল শিক্ষাভবনটি ছিল লাল ইটের একটি উঁচু সুরম্য একতলা দালান। এর পেছন দিকে একপাশে টিনের উঁচু দোচালা ঘর। অষ্টম শ্রেণী থেকে উঁচু ক্লাসগুলোর স্থান দালানে আর নিচের শ্রেণীর ক্লাসগুলোর রুম বরাদ্দ ছিল টিনের ঘরে। তখনকার দিনে ফরিদপুর শহরে খুব স্বল্প বিদ্যুৎ পাওয়া যেত। আমাদের স্কুলে কোনো বিদ্যুৎ-সংযোগ ছিল না—গরমকালে ক্লাসরুম ঠান্ডা রাখার জন্য সিলিংয়ে বৃহদাকার পাখা ঝোলানো হতো। আর ক্লাসরুমের পেছনে একটা টুলের ওপর বসে একজন পাঙ্খা-পুলার নিঃশব্দে পাখার সঙ্গে যুক্ত রশি টেনে পাখা চালাত। মূল ভবনে আরও ছিল প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের অফিসরুম, অন্য সব শিক্ষকের কমনরুম এবং ক্ষুদ্র পরিসরের একটি মিলনায়তন। আর লম্বা ব্যারাকমতো আরেকটি দোচালা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টিনের ঘর ছিল ছাত্রদের হোস্টেল। কোনো আড়ম্বর নেই—এই সীমিত অবকাঠামোকে অবলম্বন করে একদল তরুণকে মানুষ করার কঠিন কাজে লিপ্ত আরেক দল নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক।

খেলাধুলার জন্য পর্যাপ্ত মাঠ এবং শিক্ষার উন্মুক্ত পরিবেশ যেকোনো পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য অপরিহার্য। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রতিষ্ঠিত অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই এখন শুধু ক্লাসরুমের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এরকম বদ্ধ পরিবেশে শিক্ষার্থীদের শুধু কারখানার প্রোডাকশন লাইনে প্রস্তুত সামগ্রীর মতো ডিগ্রিই প্রদান করা যায়, তাদের প্রতিভার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভব নয়। ঢাকা শহরে এই সমস্যা সবচেয়ে বেশি প্রকট। সরকারি পর্যায়ে নতুন শহর-উপশহর পরিকল্পনাকালে জনসংখ্যার অনুপাতে যথেষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণের সংস্থান করা হয় না এবং যা-ও করা হয়, তা অপ্রতুল। এবং সেগুলোর জন্যও প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি বরাদ্দ দেওয়া হয় না। সংশ্লিষ্ট সবাই জমির অভাব ও জমির অতি উচ্চমূল্যের দোহাই দিয়ে অতিগুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টিকে এড়িয়ে যান। জনগণের সামষ্টিক কল্যাণে যথাযথ মানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণ ব্যয় অধিক হলেও তা মেনে নিয়ে অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

মফস্বলে লেখাপড়া করলেও আমাদের মধ্যে কোনো কূপমণ্ডূকতা কিংবা হীনম্মন্যতার লেশমাত্র ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সব জেলার প্রতিনিধিত্বকারী এবং সমাজ ও বিত্তের বিভিন্ন স্তর থেকে আসা শিক্ষার্থীদের এক মহামিলন ক্ষেত্র ছিল আমাদের স্কুল। এখানে কে কোন জেলার লোক, কার কী ধর্ম কিংবা কার কী বিত্তবৈভব—এসব কোনো বিচার্য বিষয় ছিল না। আমরা সবাই জিলা স্কুলের ছাত্র—এটাই ছিল আমাদের পরিচয়। এখানে মেধাবিকাশের অনুশীলন করা হয়—বিভেদ কিংবা বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে পারে এমন কিছু বলা কিংবা করা আমাদের চিন্তাচেতনায় কখনো স্থান পায়নি। শিক্ষার্থীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ভিন্নতা এবং স্কুলের সামগ্রিক উদার পরিবেশ আমাদের দৃষ্টিকে জেলা শহরের ক্ষুদ্র গণ্ডির বাইরে প্রসারিত করেছে, যা পরবর্তী জীবনে আমাদের অনেকেরই পথচলার সহায়ক হয়েছে।

বিত্তবৈভব-নির্বিশেষে বিভিন্ন জেলা থেকে আসা শিক্ষার্থীদের সমাহার প্রধানত দুটি কারণে। প্রথম কারণ, মফস্বলে ভালো ভালো স্কুলের অবস্থান এবং ভাষা হিসেবে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ। আর দ্বিতীয় কারণ, ওই সব স্কুলে যেকোনো সময় ও যেকোনো শ্রেণীতে বিড়ম্বনাহীন ভর্তির সুযোগ। ওই সময় বদলিযোগ্য কর্মকর্তাদের সন্তানদের আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল—যদিও অন্যদের মতো ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই শুধু কাঙ্ক্ষিত স্কুলে ভর্তি হওয়া যেত। এসব বিষয় বিবেচনা করে বদলিযোগ্য কর্মকর্তারা তাঁদের বদলিস্থলে, তা যেখানেই হোক না কেন, সপরিবারে বসবাস করতেন। উচ্চশিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাদের আচার-আচরণ যেমন তাঁদের কর্মস্থলের সমাজকে কিছুটা হলেও প্রভাবিত করেছে, তেমনি তাঁদের সন্তানসন্ততিরা স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডে স্থানীয়দের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে এক পরম প্রীতি ও সৌহার্দ্যের পরিবেশ সৃষ্টিতে মূল্যবান অবদান রেখেছে। ১৯৮০-এর দশকের পর থেকে বাংলাদেশের এই অতিপরিচিত চিত্রটি ক্রমান্বয়ে দৃশ্যপট থেকে মুছে গেছে। মফস্বল শহরের সরকারি আবাসিক ভবনগুলো এখন আর বাসিন্দাদের কোলাহলে মুখরিত হয় না—দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ম্লান করে সেখানে এক বিরাট শূন্যতা ভর করেছে। মফস্বলে কর্মকর্তারা একাকী নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন এবং রাজধানী শহরে ফিরে যাওয়ার প্রহর গুনতে থাকেন। আজকের এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এক দিনের সৃষ্টি নয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে দেশের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থাসহ সামাজিক পরিবর্তন শুধু সরকারি কর্মকর্তা নয়, সমগ্র দেশবাসীকে ঢাকামুখী করেছে।

স্বাধীনতার পর সরকারি কর্মকর্তাদের সপরিবারে মফস্বলে না যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ মফস্বলের স্কুলগুলোর শিক্ষার মানের অব্যাহত অধোগতি আর ইংরেজি মিডিয়ামে পড়শোনার সুযোগের অভাব। আমাদের সময় ইংরেজি মিডিয়াম-বাংলা মিডিয়ামগত বিভাজন খুব প্রাসঙ্গিক ছিল না। তখন ম্যাট্রিক পর্যন্ত লেখাপড়ার মাধ্যম ছিল বাংলা। তবে ইংরেজিকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে খুব যত্নের সঙ্গে শেখানো হতো। কারণ, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজি। এ শিক্ষানীতির কারণে শুধু ইংরেজি শিক্ষকই নয়, অন্যান্য শিক্ষকও ইংরেজি ভাষা ব্যবহারে খুব একটা অসুবিধার সম্মুখীন হতেন না।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য একটি বেসরকারি খাত তখনো গড়ে ওঠেনি। অর্থনীতি ছিল প্রায় পুরোপুরিই কৃষিনির্ভর, যেখানে গ্র্যাজুয়েটদের কর্মসংস্থানের খুব একটা সুযোগ ছিল না। আর সরকারি খাতেও উচ্চশিক্ষিত যুবকদের জন্য চাকরির সুযোগ ছিল সীমিত। আমাদের সময় শিক্ষকতাকে অনেকেই সম্মানজনক পেশা হিসেবে বিবেচনা করতেন। বহু উচ্চশিক্ষিত ও মেধাবী ছাত্র শিক্ষক হিসেবে তাঁদের কর্মজীবন শুরু করেন। অন্যদের কথা বাদ দিয়ে শুধু আমাদের জিলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, কতটা উচ্চশিক্ষিত হয়েও তাঁরা কত কম বেতনের চাকরি করে গেছেন। জিলা স্কুলে আমার প্রথম প্রধান শিক্ষক মুজিবুল হক যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। তিনি বদলি হয়ে গেলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রিপ্রাপ্ত নুরুল হক। আর সর্বশেষ কাজী আম্বর আলী ছিলেন ভারতের আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ (অনার্স) ও এমএ ডিগ্রিধারী। তখনকার দিনে সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের পদমান ছিল গেজেটেড দ্বিতীয় শ্রেণী। দেশ-বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিয়ে বর্তমান বাংলাদেশে কেউ দ্বিতীয় শ্রেণীর চাকরি করবেন বলে মনে হয় না। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশবাসীর চাকরির ভাগ্য অনেক প্রসারিত হয়েছে, যেখানে সকল মাস্টার্স ডিগ্রিপ্রাপ্ত প্রার্থী প্রথম শ্রেণীর চাকরি পাওয়ার আশা করে থাকেন; যদিও বর্তমানে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন ডিগ্রির মান গুণগতভাবে অনেক ক্ষেত্রেই ব্রিটিশ কিংবা পাকিস্তান আমলে প্রাপ্ত ডিগ্রির মানের সমতুল্য নয়।

বাংলাদেশে সরকারি চাকরির সংখ্যা ও সুযোগ-সুবিধা প্রসারিত হলেও সরকার স্কুলশিক্ষকদের ক্ষেত্রে তাঁদের চাকরির পদমর্যাদা উন্নত করা তো দূরের কথা, পাকিস্তান আমলে প্রধান শিক্ষক ও অন্য শিক্ষকদের সমপর্যায়ের অন্য সরকারি কর্মকর্তাদের মান উন্নয়নকালে তাঁদের বিষয় বিবেচনাতেই নেয়নি। প্রধান শিক্ষকদের মতো দ্বিতীয় শ্রেণীর পদে নিয়োজিত প্রশাসন, কৃষি, প্রাণীসম্পদ, সমবায়, মৎস্য ইত্যাদি বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের পদমান সরকার বিভিন্ন সময়ে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করলেও স্কুলের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে তা কার্যকর হয় মাত্র ২০১১ সালে। ৪০ বছরের এ অবহেলা এবং অন্য পেশার চাকরি অধিকতর আকর্ষণীয় হওয়ার ফলে পাকিস্তান আমলে যে মানের প্রার্থী শিক্ষক নিয়োগের জন্য পাওয়া যেত, সেই ধারা আর অব্যাহত থাকল না। আর সরকার বিষয়টির গভীরে না গিয়ে ঢাকার উচ্চবিত্ত ও উঠতি মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য মফস্বলের সব লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও ত্যাগী পুরোনো শিক্ষকদের পর্যায়ক্রমে ঢাকায় বদলি করে বিভিন্ন সরকারি স্কুলে নিয়োগ দেয়। যাঁদের দিয়ে ওই সব পুরোনো শিক্ষকের শূন্যস্থান পূরণ করা হলো, তাঁরা জ্ঞানে-মানে তাঁদের পূর্বসূরিদের সমকক্ষ ছিলেন না। বিশেষ করে ইংরেজি প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের অভাব প্রকট হয়ে দেখা দিল।

১৯৭৪ সালে আমেরিকায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে যাওয়ার আগে আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার পুরোনো শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা করতে যাই। অবাক বিস্ময়ে জানলাম যে আমাদের সময়ের পিটি শিক্ষক ছাড়া আর সবাইকে ঢাকায় বদলি করে দেওয়া হয়েছে। সরকারি স্কুলগুলোর শিক্ষকদের পদ অবশ্যই বদলিযোগ্য। তবে তাঁরা দীর্ঘ সময় পর বদলি হতেন এবং সাধারণত মফস্বলের স্কুলগুলোর মধ্যেই এই বদলি সীমাবদ্ধ থাকত। মফস্বলকে খালি করে ঢাকায় একমুখী বদলি দেশ স্বাধীন হওয়ার পরই কার্যকর হতে দেখা গেল।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজির বাধ্যতামূলক শিক্ষা বাতিল করে এটিকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রাখা হলো। মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম বাংলাই চালু ছিল। যেটা করার দরকার ছিল তা হলো, ম্যাট্রিক-পরবর্তী শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষার প্রচলন। ইংরেজি ভাষাশিক্ষার রীতিতে হস্তক্ষেপ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার ও প্রয়োগের প্রধান দাবিদার, এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু এ সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইংরেজি শিক্ষাকে আকস্মিকভাবে বিসর্জন দেওয়ায় একটি আন্তর্জাতিক ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হলো। ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদানের জন্য প্রায় দেড় শ বছর ধরে যে মানবসম্পদ ও অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছিল, তা কয়েক বছরের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে গেল। এতে দেশের বিত্তবানদের কোনো ক্ষতি হলো না—তাঁরা তাঁদের সন্তানদের ইংরেজিতে লেখাপড়া করানোর জন্য দ্রুত ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল গড়ে তোলার পদক্ষেপ নিলেন। কিন্তু দেশের সিংহভাগ শিক্ষার্থী একটি সহজলভ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে রইল। বিশ্বায়নের দাপটে এখন ইংরেজির ব্যবহার অপরিহার্য—কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার সুযোগের অভাবে মফস্বলের শিক্ষার্থীরা, ইংরেজি শিক্ষিত অনেকের চেয়ে মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে কার্যক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে। সরকার দেরিতে হলেও ইংরেজি ভাষাচর্চা ও অনুশীলনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারলেও যে হঠকারী সিদ্ধান্তের ফলে দেড় শত বছরের ঐতিহ্যবাহী মানবসম্পদ ও অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে গেছে, তা পুনর্গঠনে বহু সময়ের প্রয়োজন হবে।

পাকিস্তান আমলে শিক্ষকদের বেতন অপর্যাপ্ত হলেও অপ্রতুল ছিল না। শিক্ষকেরা শিক্ষাদানকে সমাজের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব হিসেবে মনে করতেন। আমাদের সময়ে নোটবইয়ের প্রচলন ছিল না। দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের প্রণীত পাঠ্যপুস্তক আর ক্লাসে শিক্ষকদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই পাঠ্য বিষয় বুঝে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। সরকারি স্কুলের কোনো শিক্ষক প্রাইভেট টিউশন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিংবা কোচিংয়ে লিপ্ত হতেন না। এটা তখনকার দিনের সরকারি শিক্ষকদের জন্য নীতিবিগর্হিত ছিল। অবশ্য বেসরকারি স্কুলের কোনো কোনো শিক্ষক কালেভদ্রে অর্থের বিনিময়ে প্রাইভেট টিউশন কিংবা কোচিং ক্লাসের আয়োজন করতেন। সেটাও মূলত ইংরেজি ও অঙ্কে দুর্বল শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার জন্য। ম্যাট্রিকের টেস্ট পরীক্ষার পর ফাইনাল পরীক্ষায় স্কুলের ফল অন্যান্য বছরের চেয়ে আরও ভালো করার লক্ষ্যে স্কুল কর্তৃপক্ষ বাছাই করা কিছু ছাত্রের জন্য বিশেষ কোচিংয়ের ব্যবস্থা করত। আমাদের সময়ও ১৫ জনকে এ ধরনের কোচিং দেওয়া হয়েছে।

আমাদের সময়ে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র মাধ্যমিক স্কুলের পাঠক্রম নির্ধারণ, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও সনদ প্রদানের নিমিত্ত পূর্ব পাকিস্তান মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড নামে কেবল একটি বোর্ডই দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান আমলেই ১৯৬১ সালে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশে ক্রমান্বয়ে আরও সাতটি বোর্ডসহ মোট নয়টি বোর্ড চালু করা হয়।

বোর্ডের পরীক্ষায় ফরিদপুর জিলা স্কুলের কৃতিত্ব শিক্ষক, ছাত্র ও জেলার অধিবাসীদের জন্য গর্বের বিষয় ছিল। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এমন কোনো বছর গত হয়নি, যখন জিলা স্কুল মেধাতালিকায় একাধিক স্থান দখল না করেছে। ১৯৫৮ সালে যে বছর আমরা ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হই, সে বছর সারা দেশে কমবেশি ১২৬ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। তার মধ্যে আমাদের স্কুল থেকে প্রথম বিভাগ পায় নয়জন। আমাদের মধ্য থেকে আমার সহপাঠী, ১৯৬৬ খ্রান্তিকের সিএসপিতে আমার সহকর্মী ও আমাদের নিজ উপজেলা নগরকান্দার অধিবাসী এ কে এম জালালউদ্দীন সপ্তম স্থান অধিকার করে। কোনো এক পরীক্ষকের চরম অবহেলা ও অদক্ষতার কারণে সে প্রথম স্থান অর্জনের গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়। শুধু তা-ই নয়, ফরিদপুর কেন্দ্রের সব পরীক্ষার্থী ওই পরীক্ষকের কারণে একই রকম পরিণামের শিকার হয়। পরে এ প্রসঙ্গে আরও আলোচনা করব। এ দুর্ঘটনা সত্ত্বেও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ নয়জনের মধ্যে আমরা চারজনই প্রথম গ্রেডের বৃত্তি লাভে সক্ষম হই।

প্রধান শিক্ষকের প্রশংসাপত্র ও ম্যাট্রিক পরীক্ষার মার্কশিট হাতে করে যেদিন শেষবারের মতো স্কুল থেকে বিদায় নিলাম—এক আনন্দ-বেদনার অদ্ভুত মিশ্র প্রতিক্রিয়া মনটাকে আচ্ছন্ন করে রাখল। এত দিনের পরিচিত পরিবেশ, স্কুলের শিক্ষক, সহপাঠী, পাঙ্খা-পুলার, দারোয়ান—সবার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এত নিগূঢ় ছিল যে মনে হলো, আমরা আত্মীয়-পরিজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেড়ে কোনো এক অজানা দেশে যাওয়ার জন্য বিদায় নিচ্ছি। কখনো যদি আবার এখানে ফিরে আসি হয়তো সবাইকে দেখতে পাব না। পুরোনোদের জায়গা দখল করে নেবে নতুন আর কিছু লোক, যারা আমাদের হয়তো চিনতেও পারবে না। আবার এর সঙ্গে ছিল একটা অব্যক্ত আনন্দের অনুভূতি। জীবনের এক পর্যায় পেরিয়ে আরেকটা পর্যায়ে আমরা অবগাহন করতে যাচ্ছি। সেখানে আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে, জানি না, তবে এই অজানাকে জানার আগ্রহ ঘিরে শঙ্কা যেমন ছিল, তেমনি ছিল এক অনাবিল আনন্দ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষাজীবন : রাজেন্দ্র কলেজ ফরিদপুর

কলেজ পর্যায়ের লেখাপড়া যে ফরিদপুর শহরের প্রখ্যাত রাজেন্দ্র কলেজেই সম্পন্ন করতে হবে, তা নিয়ে পরিবারের মধ্যে কোনো দ্বিমত ছিল না। আমাদের অভিভাবকেরা সুযোগ থাকলে, নিজ বাড়িতে থেকেই পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। এর বিকল্প ছিল ঢাকা শহরের কোনো নামী কলেজে ভর্তি হওয়া; কিন্তু তখন ঢাকা শহরের সঙ্গে ফরিদপুর শহরের যোগাযোগব্যবস্থা এত কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ ছিল যে খুব বেশি প্রয়োজন না হলে ও পথে কেউ পা রাখত না।

ফরিদপুর জিলা স্কুলের মতো রাজেন্দ্র কলেজও এক বিশাল ঐতিহ্যের অধিকারী। বিগত শতাব্দীর প্রথম দিকে জেলা শহরে অনেক ভালো স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়, এমনকি একটি উচ্চমাধ্যমিক কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু ডিগ্রি পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার জন্য কোনো ডিগ্রি কলেজ তখনো আলোর মুখ দেখেনি। এ অভাব দূর করার জন্য তখনকার দিনের তুখোড় সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা অম্বিকাচরণ মজুমদার একটি ডিগ্রি কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়ে শহরবাসীর কাছ থেকে ৪০ হাজার টাকা সংগ্রহে সক্ষম হন। পরে ফরিদপুরের বাইশরশির জমিদার ৫০ হাজার টাকার অনুদান দিতে সম্মত হলে তাঁর বাবা রাজেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরীর নামে রাজেন্দ্র কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফরিদপুর পৌরসভা ও সরকার নামমাত্র মূল্যে শহরের কেন্দ্রস্থলে ৫ দশমিক ৫ একর জমি বরাদ্দ দিলে ছোট্ট একটি ভবন আর উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের মাত্র ২৯ জন ছাত্র নিয়ে ১৯১৮ সালে কলেজ তার যাত্রা শুরু করে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত এই কলেজ ১৯২৩ সালে ইংরেজি, দর্শন ও অঙ্কশাস্ত্রে অনার্স কোর্স চালু করার অনুমতি পায়। তখনকার দিনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কোনো কলেজ কর্তৃক অনার্স কোর্স প্রদান খুবই বিরল ঘটনা ছিল। কতটা খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করলে এ সুযোগ পাওয়া সম্ভব, অনার্স প্রদানকারী কলেজের সীমিত সংখ্যা তার কিছুটা ইঙ্গিত বহন করে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর ওই বছরই জারিকৃত 'ইস্ট বেঙ্গল এডুকেশন অর্ডিন্যান্স' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনাকারী সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অধিভুক্ত করার ক্ষমতা প্রদান করে। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সমসাময়িক ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ধাঁচে শিক্ষাপ্রদানকারী আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল। অধিভুক্তকরণের কোনো কার্যসূচি তখন বিবেচনা করা হয়নি। বর্ণিত অধ্যাদেশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অতি দ্রুত ১৯৪৭ সালেই দেশের অন্যান্য কলেজের সঙ্গে রাজেন্দ্র কলেজও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ক্যাম্পাসের বাইরে পরিচালিত সব অনার্স কোর্স বন্ধেরও সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৯৪৯ সাল থেকে রাজেন্দ্র কলেজে অনার্স কোর্স পরিচালনা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়।

রাজেন্দ্র কলেজের অবকাঠামোগত কোনো স্বল্পতা ছিল না। কলেজের নামে আকৃষ্ট হয়ে অনেক দূরদূরান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে লেখাপড়া করতে আসত। তাদের হোস্টেলের সমস্যা ছিল। কলেজে শিক্ষাগ্রহণকালেই আমরা নতুন হোস্টেল ভবন নির্মাণ হতে দেখেছি। তবে বহিরাগতদের জন্য লেখাপড়ার অন্যতম সহায় ছিল অপেক্ষাকৃত অবস্থাবান ব্যক্তিদের বাড়িতে 'লজিং' থাকা। ইংরেজি শব্দ lodging-এর অর্থ কিন্তু ভাড়ার বিনিময়ে স্বল্পকালীন থাকার ব্যবস্থা। আমাদের দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে 'লজিং' এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে শিক্ষার্থী আশ্রয়দাতার ছেলেমেয়েদের পড়ানোর বিনিময়ে বিনা মূল্যে থাকা ও খাওয়ার সুবিধা ভোগ করে। দীর্ঘদিনের প্রচলিত এ প্রথা এখনো চালু আছে। তবে আগের মতো বিপুল সংখ্যায় নয়।

অবকাঠামো যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ অন্য দুটি সম্পদ : সর্বোচ্চ মান ও যোগ্যতাসম্পন্ন একটি শিক্ষকমণ্ডলী আর জ্ঞান অন্বেষণে আগ্রহী, সৎ ও চরিত্রবান একঝাঁক নবীন শিক্ষার্থী। আমাদের সময়ে রাজেন্দ্র কলেজে এ দুটির কোনোটিরই অভাব ছিল না।

১৯৫০-এর পূর্ব বাংলায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও নানা ঐতিহাসিক কারণে লেখাপড়া, শিক্ষা-দীক্ষা, বিত্তবৈভব আর নামযশের দিক দিয়ে তাদের চেয়ে বর্ণহিন্দু এলিটরা অনেক বেশি অগ্রসর ছিল। আর ফরিদপুর শহর তথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফরিদপুর জেলায় সর্বক্ষেত্রে অন্যান্য জেলার তুলনায় হিন্দু এলিটদের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই রাজেন্দ্র কলেজের শিক্ষকমণ্ডলীর অধিকাংশই ছিলেন এই হিন্দু এলিট শ্রেণীভুক্ত। এঁরা সবাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের মেধাবী ছাত্র। অধিকাংশই অনার্স কিংবা এমএ বা এমএসসি কিংবা উভয় কোর্সেই প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্ত এবং এঁদের মধ্যে আবার কেউ কেউ চ্যান্সেলরের গোল্ড মেডেল পাওয়ারও গৌরব অর্জনকারী। এঁরা যে শুধু নিজেদের শিক্ষাজীবনের প্রতিটি পর্বে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, তা-ই নয়, ছাত্রদের শিক্ষাদানকে তাঁদের জীবনের একটা ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে নিঃস্বার্থ সেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও স্থাপন করে গেছেন। শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের প্রতি তাঁদের ত্যাগ ও নিষ্ঠাই দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়া তাঁদের সুখ্যাতির প্রধান কারণ ছিল।

১৯৫৮ সালে আমরা যখন কলেজে প্রবেশ করি, তার কিছুকাল আগে থেকেই হিন্দু-মুসলিম শিক্ষকদের সংখ্যার সমীকরণে পরিবর্তন শুরু হয়ে গেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত পুরোনো হিন্দু শিক্ষকদের অবসর কিংবা দেশত্যাগের ফলে সৃষ্ট শূন্য পদগুলোতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা নবীন মুসলিম শিক্ষকেরা নিয়োজিত হলেন। কিংবদন্তির মহান ব্যক্তিত্ব অধ্যক্ষ অবনীমোহন চক্রবর্তী অবসর নিয়ে ভারত চলে গেলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন উপাধ্যক্ষ শিশিরকুমার ভট্টাচার্য। তাঁকে আমরা কিছুকালের জন্য পেয়েছিলাম। অবসর নেওয়ার পর তিনিও স্থায়ীভাবে ভারতে বসবাসের জন্য চলে গেলে সরকার থেকে প্রেষণে অধ্যক্ষ নিয়োগ করা শুরু হয়। কলেজে আমাদের শিক্ষাজীবনকালেই প্রবীণ ও নবীন এবং হিন্দু-মুসলিম শিক্ষকদের মধ্যে সংখ্যার একটা ভারসাম্য স্থাপিত হয়।

অনেক অভিজ্ঞ পুরোনো শিক্ষক বিদায় হওয়ার পরও কিন্তু কলেজের শিক্ষার মান এতটুকুও ক্ষুণ্ন হয়নি। এত সবের পরও নবীন শিক্ষক হিসেবে আমরা যাঁদের পেয়েছি, বয়সে তাঁরা নবীন হলেও সবাই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। রাজেন্দ্র কলেজ বেসরকারি কলেজ হওয়ার ফলে এখানে শিক্ষকদের বেতন স্কেল আকর্ষণীয় ছিল এবং শিক্ষাজীবনের যেকোনো স্তরে কেউ প্রথম বিভাগ কিংবা শ্রেণী পেয়ে থাকলে প্রতিটির জন্য একটি করে অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট দিয়ে তাঁদের বেতন নির্ধারণ করা হতো। সে কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক প্রতিভাবান ছাত্র রাজেন্দ্র কলেজে শিক্ষকতার আমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করতেন। কারও কারও জন্য এখানে শিক্ষকতা অন্য চাকরিতে যাওয়ার আগে একটি সাময়িক ব্যবস্থার মতো ছিল। শিক্ষকতার পাশাপাশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব কৃতী ছাত্র সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতেন। এঁদের মধ্যে আমাদের সময়েই তিনজন কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তদানীন্তন সিএসপিতে যোগদান করেন। আরও অনেকে সুপিরিয়র সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারে চাকরি করার সুযোগ পান।

ম্যাট্রিক পরীক্ষায় আমরা যাঁরা জিলা স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম, তাদের মধ্যে শুধু আমি কলা বিভাগে ভর্তি হলাম। অন্য আরেকটি স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ সিদ্দিকুর রহমান আলমগীরও কলা বিভাগে আমার সহপাঠী ছিল। কিন্তু আমাদের সঙ্গে ম্যাট্রিকে সপ্তম স্থান অধিকারী এ কে এম জালালউদ্দীন ঢাকার নটর ডেম কলেজে ভর্তি হলো, যদিও তার বাবা ফরিদপুর শহরের স্থায়ী বাসিন্দা এবং ছেলের ঢাকা ভর্তির ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট আপত্তি ও অনিচ্ছা ছিল।

কেন জালাল অনেক কষ্ট করে হোস্টেলে থেকে ঢাকায় পড়তে আগ্রহী হলো নিজ বাড়ির দোরগোড়ায় রাজেন্দ্র কলেজের মতো ভালো কলেজ থাকার পরও, তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও কারণটি জানতে পারিনি। তবে আমার মনে হয়, ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বাংলা দ্বিতীয় পত্রের ফল তাকে ভীষণ বিমর্ষ করে তুলেছিল। বাংলা দ্বিতীয় পত্রটি বাংলা ব্যাকরণ ও কম্পোজিশন-সংক্রান্ত পেপার আর বাংলা প্রথম পত্রে থাকত বাংলা গল্প-প্রবন্ধ আর কবিতার ওপর পরীক্ষা। প্রথম পত্রে ভালো নম্বর তোলা খুব দুরূহ ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পত্রে সব সময়ই ভালো নম্বর পাওয়া যেত। আমাদের মার্কশিট স্কুলে আসার পর তা দেখে আমাদের শিক্ষকমণ্ডলী ও আমরা সবাই হতবাক হয়ে গেলাম। স্কুলের সব পরীক্ষার্থী বাংলা দ্বিতীয় পত্রে কম নম্বর পেয়েছে। জালাল পেয়েছে মাত্র ৩৭ নম্বর। অথচ বাংলা প্রথম পত্রে সে পেয়েছে ৭২। দ্বিতীয় পত্রে সে ৫০ নম্বর পেলে ওই পরীক্ষায় সে প্রথম স্থান অধিকার করত। কেন বাংলা দ্বিতীয় পত্রে এমন অগ্রহণযোগ্য একটা ফল পাওয়া গেল এবং জালাল কেন এত কম নম্বর পেল, জানার জন্য আমাদের প্রধান শিক্ষক কাজী আম্বর আলী নিজে ঢাকায় গিয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করেন। চেয়ারম্যান তাঁকে জালালের দ্বিতীয় পত্রের উত্তরপত্রটি দেখান। তাঁরা উভয়েই সংশ্লিষ্ট পরীক্ষকের অমনোযোগিতা ও গাফিলতির অনেক নিদর্শন দেখতে পান। তবে যেহেতু ফলাফল গেজেটে প্রকাশিত হয়ে গেছে, সে জন্য এ পর্যায়ে আর কিছু করার নেই মর্মে চেয়ারম্যান দুঃখ প্রকাশ করলেন। তবে জানা গেল, আমাদের বাংলা দ্বিতীয় পত্রের খাতাগুলো নেত্রকোনার কোনো এক গ্রামের হাইস্কুলের বাংলা শিক্ষকের কাছে পাঠানো হয়েছিল। অথচ ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহরের স্কুলগুলোর খাতা কিন্তু শহরের স্কুলগুলোর পরীক্ষকদের মধ্যেই বিলিবণ্টন করা হয়। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে এ রকমের বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হয়তো জালাল ঢাকায় ভর্তি হয়েছিল।

নটর ডেম কলেজে অবশ্য জালাল বেশি দিন থাকতে পারেনি। দ্বিতীয় বর্ষের শুরুতে সে ফরিদপুর ফিরে এসে রাজেন্দ্র কলেজে ভর্তি হয় এবং এখান থেকেই আমাদের সঙ্গে ফাইনাল পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়।

উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজি। আমরা যেন ভাষাটা মোটামুটি আয়ত্ত করতে পারি, সে জন্য সব শিক্ষকই ক্লাসে ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতেন। আমি আমার ইংরেজি জ্ঞানকে উন্নত করার জন্য পাঠ্যবই ছাড়াও আমাদের ইংরেজি শিক্ষক-মনোনীত কিছু সহজবোধ্য ইংরেজি সাহিত্যের বই এবং নিয়মিত *Morning News* পত্রিকাটি পড়তাম। টেবিলের পাশে সব সময় থাকত একটা *Oxford English Dictionary* আর A T Dev-এর *English to Bengali Dictionary.* কোথাও আটকে গেলে কিংবা কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে না পারলে দ্রুত অভিধান ঘেঁটে দেখতাম। আর অভিধান একটা এমন আকর্ষণীয় সংকলন যে একটা শব্দ দেখতে গিয়ে সহজাতভাবেই আরও অনেক শব্দ দেখা হয়ে যায়। এভাবেই আমার ইংরেজি শব্দভান্ডার সম্পর্কে জ্ঞান সমৃদ্ধ হতে থাকে।

ক্লাসে লেকচার বা আলোচনার পাশাপাশি কলেজ কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই উপস্থিত বক্তৃতা, গল্প ও প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করত। আমি এসব আয়োজনে সব সময় অংশগ্রহণ করতাম এবং ভুলভ্রান্তি নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতাম। আমাদের উপস্থাপনা কেমন হলো, কোথায় কোথায় আমরা ভুল করেছি, কোন শব্দের উচ্চারণ ঠিক হয়নি, আমাদের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক এসব বিষয়ে তাঁদের প্রতিক্রিয়া আমাদের জানাতেন। এভাবেই অনুশীলনের মাধ্যমে এবং অনেকটা নিজেদের প্রচেষ্টায় ব্যবহারিক ইংরেজির ওপর আমাদের সক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করেছি। এখানেও আমরা কোনো ধরনের প্রাইভেট টিউশন কিংবা কোচিংয়ের শরণাপন্ন হইনি।

কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য—এই তিন বিভাগেই উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রি পরীক্ষায় রাজেন্দ্র কলেজের কৃতকার্যতা ছিল সমসাময়িক অন্য কলেজগুলোর ঈর্ষার কারণ। তবে কলা বিভাগের চেয়ে বিজ্ঞান বিভাগের সাফল্যই ছিল বেশি। রাজশাহী প্রশাসনিক বিভাগের আওতাভুক্ত কলেজগুলো বাদে দেশের অন্য সব কলেজ তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ছিল: তাই এখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিযোগিতাও ছিল অনেক ব্যাপক ও তীব্র। ১৯৬০ সালে আমরা উচ্চমাধ্যমিক ফাইনাল পরীক্ষায় অবতীর্ণ হই। ওই পরীক্ষায় আমার সহপাঠী জালাল প্রথম স্থান অধিকার করে। কলা বিভাগে সারা বোর্ডে মাত্র ২৬ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়; তার মধ্যে রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আমরা তিনজন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হই এবং সবাই প্রথম গ্রেডে সরকারি বৃত্তি পাওয়ারও যোগ্যতা অর্জন করি।

আগেই উল্লেখ করেছি, গত শতাব্দীর প্রথম দিকে পূর্ব বাংলার ১৭টি জেলা শহরে কিছু বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির উদ্যোগে আর জনগণের সহযোগিতায় ডিগ্রি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব কলেজ দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলী এবং নিষ্ঠাবান পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশনা ও সহযোগিতায় অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। এর কিছুকাল পর প্রায় সব মহকুমা শহরেই বেসরকারি উদ্যোগে ডিগ্রি কলেজ স্থাপিত হয়। কিন্তু এরা জেলা শহরের প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অনেক পিছিয়ে ছিল এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্রমেই এদের অবকাঠামোগত অপর্যাপ্ততা ও আর্থিক অনটন এদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা ও মান অর্জনে বাধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আইয়ুব খানের সামরিক সরকার বেসরকারি ডিগ্রি কলেজগুলোকে সরকারীকরণের এক কার্যক্রম গ্রহণ করে। প্রয়োজনীয় সম্পদের অভাবে জর্জরিত কলেজগুলোর জন্য এটি অবশ্যই একটি শুভ উদ্যোগ ছিল; তবে কোন কোন কলেজ সরকারীকরণের আওতাভুক্ত হবে, তা বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে নির্ধারণ করার প্রয়োজন ছিল। রাজেন্দ্র কলেজ আর্থিকভাবে মোটেই অসচ্ছল ছিল না; শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ও মেধাবী ছাত্রদের সমন্বয়ে একটি শিক্ষকমণ্ডলী কার্যরত ছিল এবং শিক্ষা অনুরাগী সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি শক্তিশালী পরিচালনা পরিষদ গঠিত ছিল। দুর্ভাগ্যবশত, ১৯৬৮ সালে রাজেন্দ্র কলেজকে সরকারীকরণ করা হয় এবং তার পর থেকেই এই কলেজে শিক্ষার মানের অধোগতি শুরু হয়। সরকারীকরণের ফলে কলেজের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও সত্তাটি সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র ভর্তি, শিক্ষক নিয়োগ ও বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনাসংক্রান্ত রীতিনীতি সব অকার্যকর হয়ে পড়ে; এগুলোর পরিবর্তে সরকারি নিয়মনীতি চালু হয়। এই ঢালাও সরকারীকরণের ফলে যেসব শিক্ষক রাজেন্দ্র কলেজের মতো কলেজে নিয়োগের জন্য মনোনীত হতে ব্যর্থ হয়ে মহকুমা শহরের কলেজে চাকরিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাঁরা বদলিযোগে জেলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহরের কলেজগুলোতে সহজেই প্রবেশের অধিকার পেয়ে গেলেন। তাঁরা তাঁদের কাঙ্ক্ষিত কলেজ ও পদে সমাসীন হলেন ঠিকই কিন্তু শিক্ষার মান আর কলেজের সফলতার ধারাকে ধরে রাখতে ব্যর্থ হলেন।

রাজেন্দ্র কলেজ আজ দ্বিখণ্ডিত। শহরের ক্যাম্পাস ছাড়াও শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে বায়তুল আমানে ৩৮ একর জমির ওপর একটি নতুন ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে শহরের ক্যাম্পাসে এখন সব উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রি (পাস) কোর্সের ক্লাস পরিচালনা করা হয়। অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ের ক্লাস নেওয়া হয় বায়তুল আমান ক্যাম্পাসে। এমনটাই যদি হওয়ার ছিল তবে রাজেন্দ্র কলেজকে সরকার স্পর্শ না করে বায়তুল আমানেই সম্পূর্ণ নতুন একটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ স্থাপন করতে পারত। ঢাকা শহরে সরকার কিন্তু তা-ই করেছে এবং এর ফলও শুভ হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি কলেজগুলোর মধ্যে সব সময়ই একটা প্রতিযোগিতার আবহ থাকে, যা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয় পক্ষকেই শিক্ষার মানের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তাদের তৎপর রাখে।

প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে ফরিদপুর শহরে শিক্ষাজীবনের পাট চুকিয়ে চাকরির সুবাদে শুধু বাংলাদেশের বিভিন্ন জনপদেই নয়, দুনিয়ার বহু স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু নিজ স্থায়ী আবাসে শিক্ষাজীবনের স্মৃতি আজও এতটুকু মলিন হয়নি। জীবনের চলার পথে ক্ষণিকের জন্য যখন ফরিদপুরের শিক্ষাজীবনের কথা মনে পড়ে, তখন এতটা দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেছে মনেই হয় না। কখনো কখনো হঠাৎ আমার চারপাশে আমার শিক্ষক আর সহপাঠীদের চিরচেনা মুখ আর তাদের কণ্ঠস্বর এক মোহনীয় স্মৃতির জগৎ রচনা করে। পরিবারের পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেই আমাদের কাছের বলে জানি আর আমাদের শিক্ষকেরা পরিবারের আর সবার মতো আমাদের আপনজন। শত বাধাবিপত্তি, অভাব-অনটন আর নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও আমাদের শিক্ষকেরাই আমাদের পাঠদান করেছেন; আমাদের বিপদে-আপদে অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করে তাঁরাই আমাদের রক্ষা করেছেন, সর্বোপরি আমাদের ভালো মানুষ হওয়ার দীক্ষা দিয়েছেন। আমাদের শিক্ষকদের ত্যাগ ও নিষ্ঠা আমাদের জীবনে সুখ, শান্তি ও প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে। তাঁদের অপত্য স্নেহ ও ভালোবাসা আর নিঃস্বার্থ দান আমরা কোনো দিন ভুলতে পারব না।

বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের ফরিদপুর শহর জেলা সদর হলেও বর্তমান সময়ের একটি উন্নত ও বর্ধিষ্ণু উপজেলার মতো ছিল। কতিপয় কর্মকর্তার অফিস আর বাসভবন ছাড়া শহরের আর কোথাও কোনো বিদ্যুতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবস্থা ছিল না; শহরজুড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয় ১৯৬৮-এর পর থেকে। বিনোদনের তেমন কোনো অবকাঠামো ছিল না। শহরে একটিমাত্র সিনেমা হল ছিল, যেখানে ভারতীয় ছবি প্রদর্শন করা হতো। পাবলিক লাইব্রেরি কিংবা কলেজের লাইব্রেরির দায়দায়িত্ব সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের ধারণা এত সীমিত ছিল যে বিদেশি কোনো সাময়িকী কিংবা সাপ্তাহিকের গ্রাহক হওয়ার মতো কোনো আগ্রহ তাদের ছিল না। টেলিভিশন তো ছিলই না, আর রেডিওতেও কলকাতার আকাশবাণীর খবর আর রেডিও সিলোনের বাণিজ্যিক প্রোগ্রামে তখনকার দিনের জনপ্রিয় হিন্দি ফিল্মের রেকর্ডের গান শোনা যেত। আমাদের জন্য বাইরের দুনিয়ার প্রায় সব কটি জানালাই বন্ধ ছিল। এমন বিরস ভুবনে ঘন কুয়াশা ভেদ করে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো আমি দুটি অনাবিল আনন্দ আর পরিতৃপ্তির উৎস আবিষ্কার করেছিলাম, যা ফরিদপুরের শিক্ষাজীবনকে আরও মধুর ও স্মরণীয় করে রেখেছে।

১৯৫৫ সালের মাঝামাঝি সময়। আমাদের বাসায় *দৈনিক ইত্তেফাক* আর *মর্নিং নিউজ* রাখা হতো। বাবা ইংরেজি পত্রিকাটি আমার স্বার্থে রেখেছিলেন, যাতে ওটি পড়ে আমি আমার ইংরেজি ভাষার ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করি। *ইত্তেফাক*-এর ওপর আমার মনোযোগ তত বেশি ছিল না। একদিন *ইত্তেফাক*-এর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে দেখি, ঝকঝকে মনোরম ছাপা আর নানা রকমের স্কেচে সজ্জিত হয়ে দাদাভাইয়ের সম্পাদনায় 'কচি-কাঁচার আসর' নামে ছোটদের জন্য একটি নতুন বিভাগের যাত্রা শুরু হয়েছে। রুদ্ধশ্বাসে পুরো পাতাটি মন্ত্রমুগ্ধের মতো পড়ে ফেললাম। অনেক দিন ধরে পাঠ্যবইয়ের বাইরে ভালো কিছু পড়ার অভাব কিছুটা হলেও দূর হলো।

এর কিছুকাল পর আসরের পাতায় দুটি বিড়ালের স্কেচের ওপর দাদাভাই একটা ছড়া লেখার প্রতিযোগিতা আহ্বান করলেন। হাতে লেখা দেয়াল পত্রিকায় ইতিমধ্যে কিছু কিছু ছড়া-কবিতা লিখেছি; তবে সেগুলো পত্রিকায় ছাপানোর জন্য পাঠাতে সাহস করিনি। প্রতিযোগিতার ব্যাপারটি দেখে মনে একটা দুরাশার সঞ্চার হলো। ভাবলাম, চেষ্টা করে লিখেই দেখি না কী রকম দাঁড়ায়। তখন বোধ হয় গরমের ছুটি। হাতে অফুরন্ত সময়। অনেক কাটছাঁট করে একটা ছড়া দাঁড় করালাম। তবে এটি পাতে তোলার মতো হয়েছে কি না, সে সম্পর্কে আশ্বাসের দরকার বোধ করলাম। অনেক ভেবেচিন্তে স্কুলের বাংলার টিচারের কাছে যাওয়া হলো। ছুটির দিনে তাঁর বাসায় যাওয়ায় তিনি যুগপৎ আনন্দিত ও বিস্মিত হলেন। আস্তে আস্তে তাঁকে আমি আগমনের উদ্দেশ্যটা জানালাম। তিনি সহাস্যে বললেন, আরে, এতে এত সংকোচের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী আছে? দেখি তুই কী লিখেছিস? দুরু দুরু বুকে তাঁকে ছড়াটি এগিয়ে দিলাম। তিনি মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলেন আর আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাঁর মন্তব্যের অপেক্ষায় রইলাম। পড়া শেষে স্যার সজোরে বলে উঠলেন, আরে, এটি তো অত্যন্ত চমৎকার একটি ছড়া হয়েছে। তুই আজই এটি পোস্ট করে দে।

ধন্যবাদ জানানোরও আর অপেক্ষায় থাকলাম না। এক দৌড়ে বাসায় গিয়ে ছড়াটিকে যতটা সুন্দর করে লেখা যায়, লিখলাম। তারপর খামে দাদাভাইয়ের ঠিকানা লিখে দেড় মাইল দূরের হেড পোস্ট অফিসে গিয়ে নিজের হাতে ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে এলাম।

এরপর প্রতীক্ষার পালা। অবশেষে সব প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে মাস দুয়েক পর প্রতিযোগিতার ফল বেরোল। আমার ছড়াটি প্রথম বিবেচিত হয়ে আসরের পাতায় ছাপা হলো। পত্রিকায় ছড়াটি ছাপার হরফে দেখে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কিছুদিন পরই পার্সেলে আমার কাছে পৌঁছে গেল দাদাভাইয়ের স্বাক্ষর করা দুটি পুরস্কারের বই। আমার কিশোর জীবনে এটি ছিল এক বিরাট আনন্দঘন অভিজ্ঞতা।

এ ঘটনার পর থেকে আসর যেন আমাকে নেশার মতো পেয়ে বসল। অনগ্রসর যোগাযোগব্যবস্থার কারণে ঢাকার দৈনিক পত্রিকাগুলো স্টিমার-ট্রেন হয়ে পরদিন সকাল ১০টার দিকে হকারের হাতে পৌঁছাত। আর বর্ষার মৌসুমে লঞ্চপথে ওই দিন বিকেলে পৌঁছাত টেপাখোলা লঞ্চঘাটে। ইতিমধ্যে আমার এই অত্যুৎসাহী কর্মকাণ্ডে আমার একজন সাথি জুটে গেল। সে আমারই সহপাঠী এ কে এম জালালউদ্দীন, যার কথা আমি একটু আগেই উল্লেখ করেছি। দুজনে মিলে আমরা আসরের দিনের *ইত্তেফাক* তাড়াতাড়ি হাতে পাওয়ার জন্য হয় ফরিদপুর রেলস্টেশন, না হয় টেপাখোলা লঞ্চঘাটে একসঙ্গে হেঁটে হেঁটে চলে যেতাম। দুই কিলোমিটার দুই কিলোমিটার করে চার কিলোমিটার রাস্তা রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে আমরা পাড়ি দিতাম শুধু আসরের পাতাটি তাড়াতাড়ি দেখার জন্য। মনে আছে, ১৯৫৫ সালের প্রলয়ংকরী বন্যায় যখন দেশ ভেসে যাচ্ছে, তখনো আমরা এক হাঁটু পানি ভেঙে টেপাখোলা গিয়ে কাগজ সংগ্রহ করেছি।

১৯৫৬ সালের শেষ প্রান্তিকে ঢাকায় কেন্দ্রীয় কচি-কাঁচার মেলা সংগঠিত হলো। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এর শাখা গঠন করা যাবে—আসরের পাতায় এমন একটা বার্তা প্রচার করা হলো। আমরা কয়েকজন, যারা স্কুল আর শহরের গণ্ডিকে খুব ছোট মনে করছিলাম, তারা একত্র হয়ে ফরিদপুরে একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেলা গড়ার চিন্তাভাবনা করলাম। উদ্দেশ্য একটাই, নতুন কিছু করতে পারা এবং বৃহত্তর পরিবেশে পরিচিত হওয়া। লেখাপড়া তো আছেই। এর বাইরেও কিছু করতে হবে। নইলে বড় একঘেয়ে লাগছে পড়াশোনাটাও।

যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। কয়েকজন মুরব্বিও ধরলাম। তাঁদের বেশির ভাগই শিক্ষক। তবে কেউ কেউ ছিলেন সরকারের পদস্থ কর্মকর্তা। শিক্ষকদের দু-একজন মৃদু আপত্তি করলেন। তাঁদের ধারণা, আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করার ব্যবস্থাটা পোক্ত করছি। ফরিদপুর শহরে তখন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাঁরা নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন, তাঁদের মধ্যে তিনজন ব্যক্তিত্ব আমাদের খুব শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন জেলা জজ আবদুল মওদুদ। তিনি পরে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োজিত হয়ে সেই পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। জনাব মওদুদের বহু লেখা তখন বিভিন্ন পত্রিকা ও সাহিত্য সাময়িকীতে প্রকাশিত হতো। আরেকজন ছিলেন বাবু জয় গোবিন্দ ভৌমিক, যিনি পরে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশের প্রথম রিলিফ কমিশনার নিয়োজিত হন। আর তৃতীয় ব্যক্তিটি ছিলেন জেলা স্কুল ইন্সপেক্টর সুজাত আলী, যাঁর বেশ কিছু কবিতা তখনকার দিনের কিশোর পত্রিকা মাসিক *আলাপনী*তে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁরা সবাই কিন্তু মেলা সংগঠনে তাঁদের সমর্থন জানালেন। তবে আবদুল মওদুদ তাঁর চাকরির কারণে মেলার উপদেষ্টা পরিষদে অন্তর্ভুক্ত হতে সম্মত হলেন না; জয় গোবিন্দ ভৌমিক আর সুজাত আলী সানন্দে উপদেষ্টা পরিষদে যোগ দিতে সম্মত হলেন। তাঁদের সমর্থন আর শুভেচ্ছা নিয়ে ১৯৫৭ সালের প্রথম দিকে ফরিদপুরের মতো একটি অনগ্রসর জেলা শহরে আমরা দেশের দ্বিতীয় মেলাটি গঠন করি। নাম 'ফরিদপুর উন্মেষণী কচি-কাঁচার মেলা'। অবশ্য এখন মনে হয় 'উন্মেষণী' শব্দটি একটু বেশি আলংকারিক ছিল: আরও ছোট ও সুন্দর শব্দ হতে পারত। তবে নামটি নির্বাচন করেছিলেন আমাদের স্কুলের সংস্কৃতের শিক্ষক অমূল্য ব্যানার্জি। তিনি আমাদের আবার ব্যাকরণও পড়াতেন। সুতরাং বাংলা ভাষায় নাম রাখতে গেলে তাঁকেই শব্দ নির্বাচনের কাজটি করতে হবে, এমন একটি ধারণা থেকেই তিনি মেলার নামকরণ করেছিলেন। আর বাকি গুরুজনেরাও তা-ই মেনে নিয়েছিলেন।

মেলা আর আসর ফরিদপুর শহরের বাইরে আমাদের পরিচিতি আর চিন্তার গণ্ডি প্রসারিত করেছিল। উন্মেষণী মেলার বহু ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল দুটি কিশোর সংকলনের প্রকাশ। প্রথমটির প্রকাশকাল ১৯৫৮: এটির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাম ছিল *উন্মেষ*। দ্বিতীয়টি প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে, নাম রাখা হয়েছিল *স্বাপ্নিক*। দুটি সংকলনই ফরিদপুর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এ দুটি সংকলন প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ঢাকার বহু স্বনামধন্য শিশুসাহিত্যিকের সঙ্গে পরিচয় হয়। মেলা ও আসরের সমসাময়িক বন্ধুদের সঙ্গে তো বটেই।

কচি-কাঁচার আসর ও মেলা নানাভাবে আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে। ফরিদপুরের শিক্ষাজীবনে এ ধরনের একটি সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে আমরা জেনেছি প্রতিষ্ঠান তৈরি ও পরিচালনার বিভিন্ন সমস্যা ও সেগুলো মোকাবিলার কিছু কৌশল। জেনেছি, কী করে সবাই মিলে কাজ করতে হয় আর এ প্রক্রিয়ায় বন্ধুত্ব স্থাপন করেছি অজস্র জনের সঙ্গে, যাদের প্রায় সবাই আজ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের এসব কাজে অনুপ্রেরণার উৎস ছিলেন দাদাভাই। মেলাকে সস্নেহে লালন করে তিনি এটিকে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে দিয়ে রেখে গেছেন এক গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য। দেশের শিশু-কিশোরদের মানসিক ও চারিত্রিক উন্নয়নে নব নব উদ্ভাবন আর চিন্তা ও চেতনার উৎকর্ষ এই ঐতিহ্যকে আরও বেগবান ও অর্থবহ করতে পারে—বর্তমান প্রজন্মের কাছে এটাই ছিল দাদাভাইয়ের প্রত্যাশা।

বিশ্ববিদ্যালয় আর পরবর্তীকালে চাকরিজীবনে মেলা, আসর আর দাদাভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগে কিছুটা ভাটা পড়ে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, বিশেষ করে ১৯৮০-এর দশকের পর থেকে এ যোগাযোগ আবার খুব নিবিড় হয়। এবার দাদাভাইয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা হয় একটু ভিন্ন ধরনের। এ সময়ে তাঁর সর্বতো প্রচেষ্টা ছিল মেলার জন্য একটি নিরঙ্কুশ স্থায়ী ঠিকানা। ঢাকায় একখণ্ড জমি পেতে হবে এবং সেখানে কিছু একটা স্থাপনা রেখে যেতে হবে, যাতে মেলা একটা স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। অর্থ ও লবিংয়ে দুর্বল প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ ধরনের আশা উচ্চাভিলাষী বটে। কিন্তু এ বিষয়ে দাদাভাইয়ের দৃঢ় প্রত্যয়, নিষ্ঠা আর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বপ্ন সত্যিই একদিন বাস্তবে রূপ নেয়। ৩৭/এ সেগুনবাগিচায় এক বিঘার মতো খাসজমি সরকার থেকে মেলাকে অনুদান হিসেবে প্রদান করা হলো। নোরাড ও জাপান সরকারের সহযোগিতায় ১০ তলার ভিত দিয়ে বর্তমানে চারতলা ভবনে স্থাপিত হয়েছে তিন শ আসনবিশিষ্ট একটি অডিটরিয়াম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ। নামকরণ করা হয়েছে 'কচি-কাঁচার ভবন'। এটির আরও বহুবিধ উন্নয়নের সুযোগ আছে। দাদাভাইয়ের অন্যতম গুণগ্রাহী খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ এখন কেন্দ্রীয় মেলার পরিচালক; আমি আর আমার মতো আরও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েকজন মেলার আজীবন সদস্য ও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য। দাদাভাইয়ের হাতে গড়া এই প্রতিষ্ঠানটি, এর ঐতিহ্য আর এর কীর্তিকে আমরা শুধু ধারণই করব না, নতুন প্রজন্মকে সঙ্গে নিয়ে আমরা বহুদূর এগিয়ে যাব।

কচি-কাঁচার আসর আর মেলা থেকে ভিন্নতর আরেকটি আনন্দের উৎস ছিল প্রায় সব ছুটিতেই নানাবাড়ি বেড়ানো। ভিন্নতর এ জন্য যে এই ভ্রমণ মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। প্রতিবারই ভ্রমণ শেষে ফরিদপুর ফিরে মনে হতো, বিরাট একটা দুঃসাহসিক অভিযান শেষ করে এলাম। যে কাজ খুব সহজেই করা যায়, সে কাজে আনন্দ নেই। কষ্ট করে কাঙ্ক্ষিত ফল পেলে তবেই না তা আনন্দের হয়।

আমার মায়েরা ছিলেন চার বোন। তাঁদের কোনো ভাই ছিল না। নানাবাড়ি পদ্মার ওপারে মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলার হরিণা গ্রামে। সেখানে ইছামতী নদীর পাড়ে বাংলোমতো সুন্দর বাড়ি, যেটি বানাতে আমার বাবা নানিকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। আমাদের ঘন ঘন যাওয়া-আসার কারণে নানি সব সময় বাড়িটিকে খুব পরিপাটি করে রাখতেন। আমার নানা বার্মায় (বর্তমানে মিয়ানমার) চাকরি করতেন। আমাদের জ্ঞান হওয়ার পর থেকে তাঁকে পূর্ণ অবসর জীবন যাপন করতে দেখেছি। বার্ধক্যের কারণে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়: পুরো সংসার একক ভাবে নানিই পরিচালনা করতেন। সামান্য শিক্ষিত হলেও তিনি ছিলেন অসাধারণ গুণের অধিকারী। সহায়-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে তিনি যেমন দক্ষ ছিলেন, তেমনি রান্নাবান্নার কাজে তাঁর কোনো জুড়ি ছিল না। বিভিন্ন রকম সাধারণ ও পোশাকি খাবার তৈরিতে তিনি অসম্ভব পারদর্শী ছিলেন; ছত্রিশ রকমের পিঠা-পায়েস তিনি বানাতে জানতেন। আর এগুলো তৈরির কৌশল তিনি তাঁর সব কটি মেয়েকেই খুব ভালো করে শিখিয়েছিলেন। তাঁর এই মূল্যবান উত্তরাধিকার, যত দিন আমার মা ও খালারা জীবিত ছিলেন, বহন করেছেন পূর্ণোদ্যমে।

সংসার পরিচালনা ও রান্নাবান্নার কাজে নানির একটি কর্মিবাহিনী ছিল। এরা সবাই নানির গ্রামের লোক, তাঁর বর্গাচাষি এবং তাদেরই মেয়ে-বউ। এদের কাজ ভাগ করে দিয়ে সময়মতো কাজ আদায় করা এবং সব আয়োজন অতি স্বচ্ছন্দে পরিচালনা করার মতো তাঁর সহজাত একটা দক্ষতা ছিল। তাঁর এ দক্ষ ব্যবস্থাপনা দেখে আমি সব সময়ই মুগ্ধ হতাম। সুযোগের অভাবে আমার নানি আজকালকার মেয়েদের মতো লেখাপড়া করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর মধ্যে আমি যে গুণাবলির সমাহার দেখেছি, লেখাপড়া করতে পারলে তিনি শুধু গৃহিণীই না থেকে আরও অনেক বড় কাজের যোগ্য হতে পারতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নানাবাড়ি ভ্রমণের প্রকৃষ্ট সময় ছিল বর্ষা আর শীতকাল। পদ্মা পাড়ি দেওয়ার পর্ব বাদে, বর্ষাকালে যাতায়াত খুবই সহজ ছিল। বর্ষাকালের পদ্মা নৌকায় পাড়ি দেওয়া এক অসীম দুঃসাহসের কাজ ছিল। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা—এ তিন নদীর প্লাবনভূমিতে বাংলাদেশের অবস্থান। ১৯৫০-৬০-এর দশকে উজানের দেশে ব্যারাজ আর বাঁধের সংখ্যা নগণ্য ছিল। এই প্লাবনভূমির মাত্র ৭ ভাগ বাংলাদেশের, বাকি সব উজানের দেশের। কিন্তু বর্ষাকালে উজানের পানির ঢল দুকূল ছাপিয়ে তেড়ে আসে বাংলাদেশের দিকে। আরিচা এসে ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা মিলে পদ্মা নামে নতুন স্রোতোধারার জন্ম দেয়। এই পদ্মারই এক পাড়ে আমরা আর ও পাড়ে নানাবাড়ি। দুই নদীর সম্মিলিত ধারার এই বিপুল জলরাশি আর স্রোতের প্রচণ্ড বেগ—এ দুয়ে মিলে পদ্মাকে অশান্ত এক প্রমত্ত নদীতে পরিণত করত। নদীর এক পাড় থেকে অন্য পাড়ের নিশানা দেখা যেত না, যেদিকেই তাকানো যেত শুধু দেখা যেত তিন-চার হাত উঁচু ঢেউ ছন্দের তালে তালে নেচে সশব্দে একে অন্যের গায়ে ঢলে পড়ছে। একটু জোরে বাতাস বইলে ঢেউয়ের উচ্চতা আর শব্দের মাত্রা বেড়ে গিয়ে এক ভীতিপ্রদ পরিবেশের সৃষ্টি করত।

নদীকে কেন্দ্র করেই নদীপারের মানুষের জীবন ও জীবিকা। ঢেউকে ভয় পেয়ে এখানে কারও জীবন থেমে থাকে না; ভয়কে জয় করেই সামনের পথে এগিয়ে যেতে হয়। এসব নদীর পথ ধরে বেড়ে ওঠা মাঝি-মাল্লারা এ দুর্যোগপূর্ণ নদীপথ পাড়ি দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের নিশ্চিত অবলম্বন। ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা নদীঘাট থেকে পদ্মার ওপারে লক্ষ্মীকুল পর্যন্ত গয়নানৌকা নামের একধরনের বিশালাকৃতির নৌকা এ ভ্রমণের জন্য পুরো বর্ষাকালেই পাওয়া যেত। গয়নানৌকা এক বিশেষ ধরনের মজবুত ও দৃষ্টিনন্দন নৌকা ছিল। পেছনের গলুই থেকে সামনের গলুই পর্যন্ত লম্বায় কমপক্ষে ২০ ফুট আর নৌকার মাঝামাঝি স্থানে চওড়ায় কমবেশি ৮-১০ ফুট আকৃতির এ নৌকাগুলোকে ঝকঝকে ইস্পাত আর পিতলের পাত দিয়ে রকমারি নকশা বানিয়ে নৌকার খোলে গেঁথে সাজানো হতো। মেয়েরা তাদের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য যেভাবে গয়না পরিধান করে থাকে, তেমনি গয়নানৌকার সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্যও বিভিন্ন ধাতুর পাত দিয়ে নকশার কাজ করা হতো। এ জন্যই বোধ হয় গয়নানৌকার এ ধরনের নামকরণ। এ নৌকাগুলোর বৈশিষ্ট্য এই যে অনেক বড় ঢেউয়ের মাঝে এরা অনুকূল বায়ুপ্রবাহে ভর করে পাল তুলে কখনো দুই ঢেউয়ের মাঝ দিয়ে কিংবা কখনো ঢেউ কেটে কেটে স্বচ্ছন্দে চলতে পারে। দুই ঢেউয়ের মাঝখানে পড়লে যেমন মনে হতো দুই দিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে পানি এসে নৌকাটিকে গ্রাস করছে, তেমনি ঢেউয়ের ওপর থেকে নিচে নামলে একই রকমের অনুভূতি হতো। কখনো কখনো উদ্দাম ঢেউ সামনের গলুই ছাপিয়ে সামনের পাটাতন ডিঙিয়ে এক পাশ থেকে আরেক পাশে সশব্দে বিলীন হয়ে যেত। প্রথম প্রথম ভয়ে আমরা কুঁকড়ে থাকতাম আর কখন পাড় দেখা যাবে সেই সময়ের অপেক্ষায় থাকতাম। পরে আমরা বর্ষাকালে গয়নানৌকায় পদ্মা পাড়ি দেওয়াতে অনেকটাই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম এবং মাঝারি পর্যায়ের ঢেউয়ের দোলা আমাদের ভালোই লাগত।

উজানে অসংখ্য বাঁধ আর ফারাক্কা ব্যারাজ চালু করার পর থেকে পদ্মার সেই অমিত বিক্রম এখন অতীতের ইতিহাস। হাজার হাজার টন পলি জমে পদ্মার বুক এখন ভরে গেছে আর উজানে পানিপ্রবাহ মূল নদীপথ থেকে সরিয়ে ফেলার কারণে বর্ষাকালের পদ্মাও এখন ম্রিয়মাণ। তা ছাড়া রাস্তার একটা ভালো নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠার ফলে একমাত্র গভীর দক্ষিণের কয়েকটি উপজেলা আর দ্বীপ ছাড়া সবখানেই সড়কপথে যাতায়াত করা যায়। তবে অন্ধের মতো নিজের স্বার্থ দেখে নিচের অববাহিকার প্রয়োজন বিবেচনা না করে একতরফাভাবে অভিন্ন নদীর প্রবাহে অবকাঠামো নির্মাণ করে ভারত অনেক আন্তর্জাতিক চুক্তি ও বিধিবিধান লঙ্ঘন করেছে অথচ সমগ্র অববাহিকাকে একটি ইউনিট হিসেবে গণ্য করে সবার স্বার্থ রক্ষা করে উত্তম পানিব্যবস্থাপনা কার্যকর করা সম্ভব। বৃহৎ দেশ হিসেবে ভারতের এ রকমের উদার দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ হলেই তা সম্ভব।

গয়নানৌকার গন্তব্য ছিল লক্ষ্মীকুল ঘাট পর্যন্ত। এ ঘাটকে ঘিরে লক্ষ্মীকূলে একটি বর্ধিষ্ণু জনপদ গড়ে উঠেছিল। নারায়ণগঞ্জ-গোয়ালন্দ ঘাটের মিক্সড স্টিমারের যাত্রীরা এখানে ওঠা-নামা করতে পারত। পদ্মা নদীর অবিরাম ভাঙনের শিকার হয়ে উনিশ শ ষাটের দশকের শেষভাগে ঘাটটি নদীগর্ভে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় এবং নদী দুর্দান্ত বেগে আমার নানাবাড়ির দিকে ধেয়ে আসতে থাকে। লক্ষ্মীকুল থেকে আমার নানাবাড়ি নদীপথে আট-দশ কিলোমিটার দূরে। প্রমত্ত পদ্মা হাটবাজার-গ্রাম-বন্দর গ্রাস করতে করতে ১৯৭২ সালে হরিণা গ্রামকেও গ্রাস করে ফেলে। আমার নানাবাড়ি, খালাবাড়ি, অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের স্থাবর সম্পদ সব নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ফরিদপুর শহরে আবার কেউ কেউ মানিকগঞ্জ কিংবা সাভারের বিভিন্ন এলাকায় আবার নতুন করে তাঁদের জীবন শুরু করেন। নানা ১৯৬০ সালে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। নানি ভাগ্যবতী যে নদীভাঙনে তাঁর বহুদিনের সাজানো সংসার বিলীন হওয়ার আগেই ১৯৭১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। নিজ বাড়ির আঙিনাতেই তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন; বাড়ি ছেড়ে তাঁকে আর কোথাও আশ্রয় নিতে হয়নি।

লক্ষ্মীকূলে পৌঁছে গয়নানৌকা ছেড়ে ছোট এক মাল্লার নৌকায় খুব সহজেই নানাবাড়ির ঘাট পর্যন্ত পৌছা যেত। ইছামতী নদী আর কয়েকটি খাল-বিল পেরিয়ে অনেক আঁকাবাঁকা পথে এ দূরত্ব পাড়ি দিতে হতো। ভরা বর্ষাকালে সব জলপথই আমার কাছে একই রকম মনে হতো। কিন্তু মাল্লারা এ অঞ্চলের জলপথ সম্পর্কে এত ওয়াকিবহাল ছিল যে অবলীলায় বিলের পথ পরিবর্তন করে সবচেয়ে সোজা পথে আমাদের গন্তব্যে পৌছে দিত। ফরিদপুর থেকে সকালে রওনা দিলে বিকেলের দিকে নানাবাড়ি পৌছাতে পারতাম। পথে গ্রামবাংলার অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা দেখতে দেখতে টিফিন বাটিতে আনা খাবার খেয়ে দুপুরের আহারপর্ব শেষ করতাম।

শীতকালে নানাবাড়ি ভ্রমণ অনেক কসরত আর কায়িক শ্রমের ব্যাপার ছিল। টেপাখোলা ঘাট থেকে কিছুদূর যাওয়ার পর নতুন জেগে ওঠা চরের ওপর দিয়ে সাইকেলে কিংবা হেঁটে নাড়ারটেক পর্যন্ত যেতে হতো। দূরত্ব প্রায় আট কিলোমিটার। যখন ছোট ছিলাম, আমরা হাঁটতাম আর বাড়ির মেয়েরা যখন আমাদের সঙ্গী হতো, তারা পালকিতে উঠত। মালামাল নেওয়ার জন্য মিস্তি পাওয়া যেত; তাদের ঝাঁকার মধ্যে আমাদের ব্যাগ আর নানা-নানির জন্য মা-বাবার দেওয়া এন্তার জিনিস সাজিয়ে দিতাম। একটু বড় হয়ে আমরা যখন সাইকেল চালানো শিখলাম, তখন হাঁটার পরিবর্তে সাইকেল চালিয়ে নাড়ারটেক যাওয়ার চেষ্টা করতাম। তবে সেটাও খুব সুবিধার ছিল না। চরে সেরকম কোনো তৈরি রাস্তা ছিল না আর ঝুরঝুরা বালুর মধ্যে সাইকেল চালানোও কষ্টসাধ্য ছিল। তখন আমরা ওটাকে টেনে নিয়ে যেতাম।

শীতকালের শীর্ণকায় পদ্মা পাড়ি দেওয়া কোনো সমস্যাই ছিল না। নদী তখন একদম শান্ত, স্থির। দেখলে মনেই হয় না এই নদীই বর্ষাকালে কত প্রলয়ংকরী রূপ ধারণ করতে পারে। সময় থাকলে বারোয়ারি নৌকায় নদী পার হওয়া যায়—তবে যাত্রীতে নৌকা পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এগুলো অপেক্ষা করতে থাকে। আমরা অবশ্য সব সময়ই একটা দুই মাল্লার নৌকা ভাড়া করে তাৎক্ষণিক ওপারের উদ্দেশে রওনা দিতাম। নাড়ারটেক থেকে লক্ষ্মীকুল, পরে লক্ষ্মীকুল বিলীন হওয়ার পর আন্ধারমানিক পৌছাতে এক ঘণ্টার মতো সময় লাগত। সেখান থেকে আবার প্রায় পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে অথবা সাইকেলে আর মেয়েরা পালকিতে পার হতো। এ যাত্রাপথটি খুবই কষ্টের ছিল। নাড়ারটেকে দু-চারটি ছাপরার মধ্যে চায়ের দোকান ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লক্ষ্মীকুল কিংবা আন্ধারমানিক আরেকটু উন্নত হলেও মেয়েদের বিশ্রামের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তবু এত কষ্ট মাথায় করেই আমরা সুযোগ পেলেই নানাবাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করতাম।

নানাবাড়ির আকর্ষণ ছিল অনেক। প্রধান আকর্ষণ আমার নানি নিজেই। তিনি তাঁর অসংখ্য নাতি-নাতনিকে, বিশেষ করে আমাকে, অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁর হাতে তৈরি সুস্বাদু রকমারি খাবার আর নাশতার স্বাদ এখনো আমার মুখে লেগে আছে। নানি অত্যন্ত সুন্দরভাবে জীবনের অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসতেন। তাঁর জীবনের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা এবং আমার মা-খালা ও বাবা-খালুদের অনেক অজানা কথা, যা তাঁরা কোনো দিন হয়তো আমাদের বলতেন না, সেগুলো আমরা গল্পের মতো হাঁ করে নানির মুখ থেকে শুনতাম। অবাক হতাম, নানি এতটা বয়সেও এতসব কথা কী করে মনে রাখলেন!

নানাবাড়ির আরেকটা আকর্ষণ ছিল বাড়ির কাছের খালবিল আর ইছামতী নদীতে সাঁতার কাটা। কোনো ক্লাসে ভর্তি হয়ে আমাদের সাঁতার কাটার সুযোগ ছিল না। নিজেরা নিজেরাই কলাগাছের ভেলা ধরে কিংবা কলস উল্টো করে ধরে সাঁতার শিখেছি। আমার সাঁতারের কসরতে পাড়ার অসংখ্য ছেলে আমার সাথি ছিল। তাদের সঙ্গে হইহুল্লোড় করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাঁতার কাটতাম। কেউ বকা দেওয়ার কিংবা শাসন করার ছিল না।

নৌকা চালানো ছিল আরেকটি বিরল অভিজ্ঞতা। নানার দেশ এরকম নিচু আর সমতল ছিল যে বর্ষাকালে এক পাড়ার সঙ্গে আরেক পাড়ার যোগাযোগ শুধু নৌকার মাধ্যমেই সম্ভব ছিল। প্রতিটি বাড়ির ঘাটে একটি করে নৌকা বাঁধা থাকত। নানাবাড়ি থেকে সবচেয়ে কাছের বাজার ছিল লেছরাগঞ্জ। জলপথে পাক্কা চার কিলোমিটার দূরে। আমি সব সময়ই বাজারে যেতে ভালোবাসতাম আর বাড়ির রাখালের কাছ থেকে আস্তে আস্তে নৌকা চালনার কৌশল রপ্ত করে নিলাম।

ফরিদপুরের শিক্ষাজীবনকালে অসংখ্যবার নানাবাড়ি গিয়েছি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর সময় আর সুযোগের অভাবে নানাবাড়ি ভ্রমণের সুযোগ কমে আসতে থাকে। তারপর সরকারি চাকরিতে যোগ দেওয়ার পর বিশেষ চেষ্টা করে সময় বের করতে হতো। আমার নানি তখন নানা ধরনের অসুখে কাতর, প্রায় সময়ই বিছানায় পড়ে থাকেন। আমার সেজো খালা তাঁর কাছেই থাকতেন। তিনিই তাঁকে দেখাশোনা করতেন। ১৯৬৯ সালে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানে বদলি হয়ে গেলে নানির সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সস্ত্রীক দেখা করতে যাই। আমাদের দেখে নানির চোখে-মুখের আনন্দের অভিব্যক্তি এখনো আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। এক রাত থেকে পরদিন ভোরে যখন ঢাকার পথে নানাবাড়ি ছেড়ে আসি, আমার নানি খালার কাঁধে ভর করে বাড়ির পাশের রাস্তার কাছে আমরা দূরে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমাদের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে ছিলেন। তিনি কি জানতেন তাঁর সঙ্গে এটাই হবে আমাদের শেষ দেখা? মায়ের কাছে শুনেছি, ১৯৭১ সালে মৃত্যুর আগে তিনি আমার নাম ধরে আমাকে বহুবার তাঁর কাছে ডেকেছেন। আরেকবার শেষবারের মতো আমাকে দেখার সাধ ছিল তাঁর। কিন্তু স্বাধীনতাযুদ্ধের ফলে ২ হাজার মাইল দূরের বিচ্ছিন্ন প্রান্তর থেকে তাঁর এই অন্তিম সাধ মেটানোর কোনো সাধ্য আমার ছিল না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষাজীবন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রাজেন্দ্র কলেজে শিক্ষাগ্রহণকালে এরকমের একটা চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল যে ইতিহাসে অনার্স কোর্সে ভর্তি হয়ে আমার বিশ্ববিদ্যালয়-জীবন শুরু করব। ইতিহাসের প্রতি আমার আগ্রহ সৃষ্টির মূলে ছিলেন ইতিহাসের শিক্ষকেরা, বিশেষ করে উপাধ্যক্ষ শিশিরকুমার ভট্টাচার্য। অগাধ জ্ঞানের অধিকারী এই ব্যক্তি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে অনার্স এবং এমএতে প্রথম শ্রেণী ও একটি গোল্ড মেডেল পাওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই প্রথম জানলাম যে শুধু কিছু ঘটনাপঞ্জির বিবরণ আর রাজা-বাদশাদের যুদ্ধবিগ্রহ, হানাহানি, বিদ্রোহ আর বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনিই ইতিহাস নয়। ক্ষমতার লড়াই অনেক সময়ই অত্যন্ত কদর্য ও নির্মম; কিন্তু এগুলো সবই রাজনৈতিক ইতিহাসের উপাত্ত। রাজনীতিকে কেন্দ্র করে যে আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে ওঠে, সেগুলো অনুধাবন না করলে সমকালীন সমাজ ও জীবনের সামগ্রিক চিত্রটি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ইতিহাসে বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অতীতের ঘটনাবলির একটি অর্থবহ বর্ণনা থাকে। তবে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় কাজ হচ্ছে ওই সব ঘটনা বিশ্লেষণ করে কার্যকারণ ব্যাখ্যা করা এবং এ প্রক্রিয়ায় অন্তত বর্তমান সময়ের বিদ্যমান সমস্যাগুলো সমাধানে শিক্ষণীয় কিছু থাকলে তা তুলে ধরা। সমকালীন সময় ও পরিপার্শ্ব যেহেতু আমাদের অতীতের ঘটনাবলি বিবেচনার প্রেক্ষিত সৃষ্টি করে, সেহেতু প্রায়ই আমরা অতীতের ঘটনাকে সমসাময়িক রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করার প্রয়াস পাই। পরে জেনেছি যে 'সব ইতিহাসই সমসাময়িক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাস'—এ ধরনের বক্তব্য নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে যথেষ্ট মতানৈক্য আছে। তবে ইতিহাসের একজন আনাড়ি ছাত্র হিসেবে এ ধরনের ব্যতিক্রমধর্মী বক্তব্য আমার জন্য অনেক চমক ও আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল। মূলত তখন থেকেই ইতিহাস পড়ার বিষয়টি আমার জন্য পাকা হয়ে গিয়েছিল। ইতিহাস নির্বাচনের আরেকটি কারণ ছিল তদানীন্তন সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস (সিএসএস) পরীক্ষার ঐচ্ছিক বিষয়াবলির মধ্যে ইতিহাসের প্রাধান্য। আমি যেন তদানীন্তন সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান (সিএসপি) ক্যাডারভুক্ত হতে পারি, আমার বাবা সেটা মনেপ্রাণে চাইতেন। আমিও তাঁর এ ইচ্ছা পূরণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেওয়ার সংকল্প করেছিলাম।

ইতিহাসে ভর্তি হওয়া ছাড়াও আরেকটি ইচ্ছা ছিল সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র হওয়ার গৌরব অর্জন করা। যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড-কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য ছিল ছাত্রাবাসের ভিত্তিতে ছাত্রদের নিবন্ধন ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা। ছাত্রাবাসে কোনো ছাত্র বাস করুক কিংবা না করুক, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য কোনো-না-কোনো ছাত্রাবাসে তাঁকে অবশ্যই নিবন্ধিত হতে হবে। ছাত্রাবাস-প্রদত্ত নিবন্ধন নম্বরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে তাঁর পরিচয়ের ধারক। এ নম্বরের সূত্রেই সব প্রশাসনিক কাজ ও পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। তবে শুনেছিলাম, সলিমুল্লাহ হলে সিট পেতে অনেকেই আগ্রহী থাকেন। তাই অনেকের আবেদনই হল প্রশাসন থেকে সিটের অভাবে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ইতিহাস বিভাগে ভর্তির ব্যাপারে আমার মনে কোনো শঙ্কা না থাকলেও সলিমুল্লাহ হলে জায়গা হবে কি না, সে সংশয় নিয়েই জীবনের আরেক অধ্যায় শুরু করতে ঢাকার পথে রওনা হলাম।

ঢাকায় বোনের বাসায় আস্তানা গেড়ে পরদিন ভর্তির আয়োজনে লেগে গেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য কয়েকটি বিভাগ ঘুরে কাগজপত্র জোগাড় করতে হতো। অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে আইএ পরীক্ষার মার্কশিট জমা দেওয়াও জরুরি ছিল। সেটা পাওয়ার জন্য বকশীবাজারের বোর্ড অফিসে কয়েকবার ধরনা দিতে হতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের দপ্তর থেকে ভর্তির ফরম ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র এনে সেগুলো যথাযথভাবে পূরণ করে ভর্তির জন্য কাঙ্ক্ষিত বিভাগের দপ্তরে দাখিল করা ছিল পরবর্তী পর্যায়। তারপর নির্দিষ্ট দিনক্ষণে বিভাগীয় বাছাই কমিটির সঙ্গে সাক্ষাৎকার। বিভাগীয় প্রধানের অনুমোদনসহ যে ছাত্রাবাসে নিবন্ধিত হতে আমি আগ্রহী, সেই ছাত্রাবাসের প্রভোস্টের অফিসে ফরমটি জমা দিতে হবে। প্রভোস্টের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্ধারিত সময়ে সাক্ষাৎকারের পর তিনি অনুমোদন দিলে ওই ছাত্রাবাসের ছাত্র হিসেবে ভর্তির সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হতো।

পারিবারিক কিছু অসুবিধার কারণে ভর্তির জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঢাকায় আসতে পারিনি। বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে যখন আমি ইতিহাস বিভাগে ফরম জমা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত, তখন জানতে পারলাম, সলিমুল্লাহ হলের আবাসিক ছাত্র হিসেবে ফরম জমা দেওয়ার তারিখ এক দিন পরই শেষ হয়ে যাচ্ছে। মনে তখন গভীর শঙ্কা, আদৌ আমি সলিমুল্লাহ হলের আবাসিক ছাত্র হিসেবে ভর্তি হতে পারব কি না। আরও বেশি শঙ্কিত হলাম এ কথা জেনে যে হলের প্রভোস্ট ড. মাযহারুল হক কঠিন শৃঙ্খলার অনুসারী। সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলে তাঁর কাছ থেকে কোনো অনুকম্পা পাওয়া যাবে না। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হাতে হাতে ইতিহাস বিভাগের অনুমোদন নিয়ে ওই দিনই হলে ভর্তির ফরম জমা দেওয়া, যাতে পরের দিন যথাসময়ে আমি প্রভোস্ট সমীপে সাক্ষাৎকারের জন্য হাজির হতে পারি।

এ রকম একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে আমি ইতিহাস বিভাগের দপ্তরে ওই দিনই বিভাগীয় প্রধানের সাক্ষাৎকারের অনুরোধ জানাই। বিভাগীয় প্রধান ওই দিন অফিস করে বাসায় ফিরে গেছেন। এ জন্য পরের দিন ছাড়া কোনোভাবেই সাক্ষাৎকার সম্ভব নয় বলে অফিস সহকারী আমাকে জানালেন। আমি যখন অফিস সহকারীর সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত, তখন পাজামা-পাঞ্জাবি পরা সুদর্শন এক যুবক ভারী গলায় সহকারীর কাছে ব্যাপারটি জানতে চান। সব শুনে তিনি আমার কাছে দেরিতে আসার কারণ জিজ্ঞেস করেন। আমার কথা শুনে তিনি আমার ম্যাট্রিক ও আইএ পরীক্ষার রেজাল্ট এবং অন্য কোনো বিভাগে ভর্তির আবেদন করেছি কি না, জানতে চান। সব শুনে তিনি বিভাগীয় প্রধানের রুমে ঢুকে ফোনে তাঁর বাসায় কথা বলেন। রুম থেকে বের হয়ে তিনি অফিস সহকারীকে তক্ষুনি ফরমটি বিভাগীয় প্রধান ড. হালিমের নয়াপল্টনের বাসভবনে গিয়ে তাঁর অনুমোদন সংগ্রহ করে আমাকে হাতে হাতে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তারপর আমাকে লক্ষ করে আশ্বাসের সুরে বললেন: তুমি ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করে ফরম নিয়ে যাবে। তারপর নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, তিনি আমাদের প্রথম বর্ষ অনার্স ক্লাসে ইউরোপের ইতিহাস প্রথম পত্র পড়াবেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে আরও কথা হবে। এই হৃদয়বান আর সুদর্শন ব্যক্তিটিই ছিলেন শহীদ গিয়াসউদ্দিন আহমদ, যাঁর মাধ্যমে ইতিহাস বিভাগের সঙ্গে আমার একটি মধুর সম্পর্কের সূচনা হলো। ঢাকা শহরের অচেনা পরিবেশে অপ্রত্যাশিত এই সাহায্য ও সহমর্মিতা আমার মনে অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশা আর আনন্দের সঞ্চার করেছিল। ওই দিনই হলের ফরম জমা দিয়ে পরদিন দুপুরে প্রক্টরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় পেলাম।

ঢাকায় আমার আগমন এই প্রথম নয়; এর আগেও কয়েকবার ঢাকায় এসেছি। আজিমপুর কলোনি কিংবা নিউ মার্কেট যাওয়া-আসার পথে রাস্তা থেকে সলিমুল্লাহ হলের নান্দনিক সৌন্দর্য, সূর্যের আলোয় ঝলমল হরিদ্রাভ গম্বুজের সারি, লম্বা টানা বারান্দা, সামনের চওড়া লন আর টেনিস কোর্ট দুই চোখ ভরে দেখেছি আর এখানে থাকতে পারলে কেমন হবে, তা নিয়ে ক্ষণিকের জন্য হলেও স্বপ্নের ইন্দ্রজাল রচনা করে বিভোর হয়েছি।

পরদিন নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগে হল চত্বরে পৌঁছে গেলাম। শান্তিনগর থেকে রিকশায় চেপে রাস্তার দুই পাশে বড় বড় গাছের স্নিগ্ধ ছায়া আর আলোর লুকোচুরির ভেতর দিয়ে এ পথচলা ছিল আনন্দের। শাহবাগ থেকে রোকেয়া হলের মোড় পর্যন্ত অনেক কটা কৃষ্ণচূড়াগাছ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পরিবেশকে আরও সুন্দর ও মোহনীয় করে তুলেছিল। রাস্তাঘাটে গাড়িঘোড়া কিংবা লোকজনের তেমন কোনো ভিড় নেই; একটা অলস নির্লিপ্ততা যেন ঢাকাবাসীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সবুজের আঁচলে ঘেরা ঢাকা শহরের অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর অনাবিল প্রশান্তি ভর্তির জন্য ছোটাছুটির কাজ অনেকটাই সহনীয় করে দিল।

নীলক্ষেত অভিমুখী রাস্তা থেকে হলের বাইরের গেট পেরিয়ে হল ভবনের দিকে সোজা গেলে হলে প্রবেশের লম্বা সিঁড়িবারান্দা সামনে পড়বে—এর দুই পাশে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ঢোকার দুটি কলাপসিবল গেট। প্রভোস্টের ব্যবহারের জন্য বাইরের রাস্তা থেকেই কিছুটা পুবে একটি গাড়িবারান্দা এবং বারান্দাসংলগ্ন আরেকটি কলাপসিবল গেট। প্রভোস্ট আসার সময় এই গেট খুলে দেওয়া হয় এবং তিনি চলে গেলে তা আবার বন্ধ করে দেওয়া হয়। ওই গেটের সামনেই আমরা প্রভোস্টের আগমনের অপেক্ষায় বসে আছি। হঠাৎ অফিসের কর্মচারী আর বেয়ারাদের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য লক্ষ করলাম। গাড়িবারান্দায় বহু পুরোনো মডেলের একটি গাড়ি এসে থামল। গাড়ি থেকে পুরু লেন্সের চশমা পরা এক প্রবীণ ব্যক্তি এদিক-ওদিক না তাকিয়ে সোজা তাঁর অফিসকক্ষে প্রবেশ করলেন। বুঝতে বাকি থাকল না তিনিই এ হলের স্বনামধন্য প্রভোস্ট ড. মাযহারুল হক। কিছুকাল পরই সাক্ষাৎকারের জন্য আমার ডাক পড়ল। সাক্ষাৎকারটি কোনো ধরনের যাচাই-বাছাইয়ের জন্য ছিল বলে মনে হলো না; বরং এটি ছিল একধরনের ব্রিফিং। তিনি আমার কাগজপত্র একঝলক দেখে শান্ত স্বরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন, আমাদের মতো বহু শিক্ষার্থী নানা কারণে উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। আমরা সৌভাগ্যবান যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাচ্ছি। আমরা যেন হল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য অনুসরণের যোগ্য হই—এ উপদেশ তিনি দিলেন। বাকি আনুষ্ঠানিকতার জন্য তিনি হল অফিসে যোগাযোগ করার নির্দেশ দিলেন। মফস্বল থেকে ঢাকায় এসে কোনো মুরব্বির সাহায্য কিংবা পরামর্শ ছাড়া এত সহজে ও স্বচ্ছন্দে ভর্তি হতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

১৯৩৪ সালের আগস্ট মাসে প্রায় ১৩ একর জমির ওপর তিন বছরের কম সময়ে মোগল স্থাপত্য অনুসরণে হলের বর্তমান ভবনটির নির্মাণকাজ সম্পন্ন করে এটি চালু করা হয়। চতুর্ভুজাকৃতি দোতলা এ ভবনের চারপাশ ঘিরে আবাসিক কক্ষগুলো ঠিক মাঝামাঝি উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একটি নয়নাভিরাম করিডর দ্বারা ইস্ট ও ওয়েস্ট হাউসে বিভক্ত। দেড় শ করে দুই হাউস মিলে তিন শ ছাত্রের আবাসনের পরিকল্পনা করে ভবনটি নির্মাণ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়-জীবন যেহেতু হলকেন্দ্রিক, সে জন্য হলের হাউস টিউটরদের তত্ত্বাবধান হল প্রশাসনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যারা হলের অনাবাসিক ছাত্র, তারাও কে কোথায় কীভাবে থাকে, সেটাও হল কর্তৃপক্ষের খোঁজ রাখার কথা; যদিও এ ধরনের কোনো কার্যক্রম আমাদের সময়ে পরিচালিত হতে দেখিনি।

হলের অভ্যন্তরে করিডরের দুই পাশে বিস্তৃত সবুজ ঘাসের লন এবং পরিকল্পিত ফুলের বাগান। নিয়মিত মালিরা এসে বাগানের পরিচর্যা করত। হলের বাসিন্দাদের সুন্দর স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য যা যা প্রয়োজন, হলের নকশা তৈরিকালে সেসবেরই সংস্থান করা হয়েছিল। প্রশস্ত একটি অডিটোরিয়াম, কমনরুম, ইনডোর গেমস রুম, মসজিদ ও অফিসের জন্য নির্দিষ্ট স্থান নকশা অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়েছিল। আর ছিল বিশাল একটি ডাইনিং রুম, যেখানে দুই শ ছাত্র একযোগে আহার সম্পন্ন করতে পারত। তবে দুই হাউসের মেসিং সম্পূর্ণ আলাদা ছিল এবং এদের বসার ব্যবস্থাও উত্তর-দক্ষিণে লম্বা টেবিলের সারি টেনে পৃথক করা ছিল।

আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সংস্কারের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছিল। কীভাবে জানি না জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা যারা ১৯৫৮ সালে ম্যাট্রিক পাস করেছিলাম, আমাদের দিয়েই এসব পরীক্ষার শুরু হয়েছিল। আমাদের আগের বছর পর্যন্ত যারা অনার্স কোর্সে ভর্তি হয়েছে—তারা তিন বছরের পাঠ্যক্রম সমাপ্ত করে শেষ বর্ষে একযোগে সব পেপারের পরীক্ষা দিতে পারত। কিন্তু আমাদের সময় নিয়ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলো, প্রতিবছর যেসব পেপার পড়ানো হবে, বছর অন্তে সেই পেপারগুলোর ওপরই চূড়ান্ত পরীক্ষা নেওয়া হবে। ওই ভিত্তিতে শেষ বর্ষে সব ফল যোগ করে অনার্স পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হবে। আবার পরীক্ষার ফলাফলের শ্রেণীবিন্যাসের জন্য প্রয়োজনীয় গড় নম্বরের হারও বর্ধিত করা হলো : যেমন প্রথম শ্রেণীর জন্য আগের নির্ধারিত শতকরা ৬০ নম্বরকে ৭০-এ উন্নীত করা হলো। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে Functional English এবং History of Scientific Development নামে দুটি অতিরিক্ত কোর্স কলা, বাণিজ্য ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের সবার জন্য বাধ্যতামূলক করা হলো।

আমি ইস্ট হাউসের নিচতলায় চার শয্যাবিশিষ্ট কক্ষে একটি সিটের বরাদ্দ পেলাম। হলের, বিশেষ করে, রুমের পরিবেশ আমার বাড়ির পরিবেশ থেকে ভিন্নতর ছিল। আমাদের হাউসের জন্য হাউস টিউটরের তত্ত্বাবধানে একটি মেস কমিটি গঠন করা হলো। তাদের সার্বিক দায়িত্বে দুপুর ও রাতের খাবারের বন্দোবস্ত করা হতো। চার বছর হলে অবস্থানকালে আমরা মাসিক মেসিং চার্জ ৩৫ টাকা থেকে শুরু করে শেষ বর্ষে ৪০ টাকায় শেষ করি। নাশতার খরচ আলাদা ছিল। হলের বাইরে টেনিস কোর্টের পাশে ছোট্ট একটি দালানে আমাদের ক্যাফেটেরিয়া ছিল। চুক্তিবদ্ধ একটি প্রতিষ্ঠান নগদ মূল্যে সকাল ও বিকেলের নাশতা সরবরাহ করত। সকালে খুব ভালো খেলেও আট আনার বেশি খরচ হতো না।

আইয়ুব খানের অনেক সংস্কারের মধ্যে একটা ভালো সংস্কার ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্যালেন্ট স্কিম স্কলারশিপের প্রবর্তন। অভিভাবকের আর্থিক অবস্থা নির্বিশেষে মেধাবী ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষায় সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে এই স্কিমের প্রবর্তন করা হয় আর আমাদের ক্লাসই প্রথম এ সুবিধা ভোগ করার সুযোগ পায়। আমরা যারা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম, তাদের অনেকেই প্রথম কিংবা দ্বিতীয় গ্রেডে সরকারি বৃত্তি পেয়েছিলাম এবং সেই সুবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের কোনো টিউশন ফি দিতে হতো না। আমি প্রথম গ্রেড হওয়ায় সরকারি বৃত্তি বাবদ প্রতি মাসে পেতাম ৩৫ টাকা আর ট্যালেন্ট স্কিমের অধীনে পেতাম ৬৫ টাকা—মোট ১০০ টাকা। উনিশ শ ষাটের দশকের প্রথম দিকে এ ১০০ টাকা বিরাট অঙ্ক এবং এ দিয়ে অনেক কিছু করা যেত। আর বই কেনার জন্য এককালীন অনুদান ছিল ২৫০ টাকা, যা দিয়ে আমি অনেকগুলো ভালো ইতিহাসের বই কিনেছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতে এ অপ্রত্যাশিত টাকা আসার ফলে আমাদের অনেকেই মাসে মাসে টাকা পাঠানোর দুশ্চিন্তা থেকে তাদের অভিভাবকদের মুক্ত করতে পারল। আবার আমার মতো অনেকের একটা ভালো জীবনযাপনের জন্য বাড়তি খরচ করার সুযোগ সৃষ্টি হলো। তখন ঢাকায় গুলিস্তান অ্যাভিনিউ (বর্তমান বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ) ছিল বর্ধিষ্ণু ঢাকা শহরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিনোদন ও বিপণনকেন্দ্র। নির্দিষ্ট কিছু করার না থাকলেও ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন এ এলাকায় ঘুরে বেড়ানো যথেষ্ট আনন্দের ছিল। এখানে কিছু দূর পরপরই সে সময়ের অল্প কটা ভালো রেস্টুরেন্টে অনেকের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও ভিড় করত। গুলিস্তান সিনেমা হলের তৃতীয় তলায় নাজ নামে ছোট্ট একটি সিনেমা হল ছিল, যেখানে খুব ভালো ভালো ইংরেজি মুভি দেখানো হতো। কয়েক বন্ধু মিলে ওখানে মুভি দেখে চৌ চিন চৌ রেস্টুরেন্টে চায়নিজ খাবার কিংবা রেক্সে কাবাব-পরোটা খেয়ে হলে ফেরা আমাদের মাসিক রুটিনের অংশ ছিল। হলের একঘেয়ে খাওয়া থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বাইরে কোথাও হয় কোনো আত্মীয় বাড়ি কিংবা বাইরের কোনো রেস্টুরেন্টে খাওয়ার কোনো বিকল্প ছিল না। সব সময়ই যে দামি রেস্টুরেন্টে খেতে হতো, এমন নয়। অল্প দামে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি-সংলগ্ন হোসিনা হোটেল কিংবা বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউর সেলিমাবাদ রেস্টুরেন্টের খাবারও মহার্ঘের মতো মনে হতো।

যেকোনো প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে গেলে লিখিত নিয়মকানুন এবং এগুলোর প্রয়োগের ব্যাপারটি তো থাকতেই হয়। তবে একটা প্রতিষ্ঠান মাপে অনেক ওপরে উঠে আসে এর অলিখিত বিধিবিধানের শক্তির ওপর। বলে-কয়ে কিংবা চোখে আঙুল দিয়ে আমরা হলে কীভাবে চলব, কাউকে তা শেখাতে হয়নি। বড়দের আচার-আচরণ লক্ষ করে আমরা নিঃশব্দে তা অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। দু-একজন যে এর ব্যত্যয় ঘটায়নি তা নয়, তবে এ ধরনের ব্যত্যয়কারীদের কেউ সুনজরে দেখত না। প্রথম বর্ষের ছাত্র হিসেবে আমরা যেমন আমাদের সিনিয়রদের সম্মান করেছি, সে রকম সম্মান আবার আমরা আমাদের জুনিয়রদের কাছ থেকেও পেয়েছি। এ আচরণবিধি ডাইনিং হলে, নাশতার টেবিলে, কমনরুমে—সব জায়গাতে একই রকম ছিল। সিনিয়ররা আমাদের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে আমরা উচ্চস্বরে কথা বলাও বন্ধ রাখতাম। সিনিয়রদের রুমের পাশ দিয়ে যাতায়াত যতটা সম্ভব এড়িয়ে যেতাম। হলের লনের সৌন্দর্য বজায় রাখার জন্য আমরা কখনো লনের ওপর দিয়ে হাঁটাচলা করতাম না; করিডর কিংবা বারান্দাই ছিল আমাদের হাঁটাচলার পথ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দীর্ঘদিন ধরে লালিত এই অলিখিত কোডের সবচেয়ে সফল প্রয়োগ দেখেছি হল জীবনের উত্তেজনাকর কিন্তু আনন্দঘন সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাজনীতিতে চারটি সংগঠন সক্রিয় ছিল—ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ, এনএসএফ এবং ছাত্র শক্তি। এসব দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের যোগাযোগ থাকলেও তারা তা প্রকাশ করত না। এ ধরনের যোগাযোগকে সাধারণ ছাত্ররা একটা গর্হিত কাজ বলে মনে করত। ছাত্র সংসদ নির্বাচনের আগে এ ধরনের যোগাযোগ-সম্পর্কিত অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ নির্বাচনী প্রচারণাকে অনেকটা প্রভাবিত করত। তবে সলিমুল্লাহ হলে ঐতিহ্যগতভাবে যারা ভিপি প্রার্থী হতো, তাদের বিশেষ কোনো রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা থাকত না। তাদের মনোনয়নের মাপকাঠি ছিল একটি আকর্ষণীয় জীবনবৃত্তান্ত। তাদের ম্যাট্রিক, ইন্টারমিডিয়েট ও অনার্স—তিনটিতে প্রথম শ্রেণী পেতে হবে। এ ছাড়া বিতর্ক, খেলাধুলা, সাহিত্যচর্চা ইত্যাদি অন্যান্য বিষয়েও তাদের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর থাকতে হবে। সব কটি পরীক্ষায় আমার প্রথম শ্রেণী থাকার সুবাদে ১৯৬৩ সালে সলিমুল্লাহ হল সংসদ নির্বাচনে এনএসএফ-ছাত্র শক্তির জোটের পক্ষ থেকে আমাকে ভিপি প্রার্থী করা হয়। ছাত্র ইউনিয়ন-ছাত্রলীগ জোটের পক্ষ থেকে আমার প্রতিপক্ষ ছিল মোহাম্মদ ফেরাসউদ্দিন। সে সময় এনএসএফকে সরকার-সমর্থক সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে বাকি ছাত্রসংগঠনগুলো তাদের অবস্থান অনেক সংহত করে নিয়েছিল। কোন ছাত্রসংগঠন কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক—এ নিয়ে একটা বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল এবং কোথাও কোথাও এ নিয়ে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটতে দেখা গেছে। তবে এত সবের পরও মুসলিম হলের পরিবেশকে তখনো কেউ কলুষিত করতে পারেনি। নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে অলিখিত কোডের প্রয়োগ দেখে আমি অনেক স্বস্তি ও আনন্দ পেয়েছি। একটি রীতি ছিল প্রধান ফটকের পাশে দোতলার সিঁড়ির নিচে এক পক্ষ এবং সিঁড়ির ওপরে আরেক পক্ষের প্রজেকশন মিটিং পরিচালনা—এ নিয়ে কোনো সমস্যা হয়নি। ভোটের দিন দুই ভিপি প্রার্থীকে একসঙ্গে বুথে গিয়ে ভোট দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। আমরা আনন্দঘন পরিবেশে তা করেছি। ভোট শেষে প্রধান ফটকের সিঁড়িবারান্দায় দুই ভিপি প্রার্থীকে সমাপনী বক্তৃতা দেওয়ার রীতিও আমরা পালন করেছি। ভোটের পরদিন নাশতার টেবিলে বসে দুই পক্ষের প্রচারকর্মীদের অন্য দিনের মতো একসঙ্গে বসে নাশতা খেতে দেখেছি। ওই নির্বাচনে ফরাসউদ্দিন জয়ী হয়েছিল, কিন্তু আমাদের মধ্যে সে জন্য কোনো বৈরিতার সৃষ্টি হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সলিমুল্লাহ হলের নান্দনিক সৌকর্য, সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা যতটা সমুজ্জ্বল, সে তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের পুরোনো ক্যাম্পাস অনেকটাই নিরাভরণ ও নিষ্প্রভ। সলিমুল্লাহ হলকে হলের প্রয়োজন অনুসারে নির্মাণ করা হয়েছিল। কলা অনুষদের স্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি। ঢাকা মেডিকেল কলেজের যে অংশে আমাদের ক্যাম্পাস পেয়েছি, তা ছিল মূলত ১৯০৫ সালে দ্বিখণ্ডিত বাংলা প্রদেশের সচিবালয়ের জন্য নির্মিত ভবনের একাংশ। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে গেলে সচিবালয়ের আর কোনো প্রয়োজনীয়তা রইল না। তখন ভবনজুড়ে স্থাপন করা হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। এ ভবনের পূর্বাংশে, বর্তমানে যেখানে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগ, সেখানেই কলা ও আইন অনুষদ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু।

সলিমুল্লাহ হল থেকে বের হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় যাওয়ার পথে মেডিকেল কলেজের ইউক্যালিপটাসের সারি পেরিয়ে ডান দিকে মোড় নিলেই অর্ধগম্বুজাকৃতি কলা ভবনের গেট—সেটির ওপারে শিক্ষক ও প্রক্টরের বাসভবন। গেট পেরিয়ে হাতের ডানে প্রথমে ডাকসু অফিস এবং পরে টিনের চালাঘরে মধুর ক্যানটিন। এগুলোর সামনে একচিলতে খোলা মাঠ, যার সামনে বহু সভা-সমিতি আর ছাত্র আন্দোলনের নীরব সাক্ষী হিসেবে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে সেই বিখ্যাত আমগাছ। আরও সামনে একেবারে দক্ষিণের সীমানা ঘেঁষে তখনকার দিনের রেললাইনের ধারে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য নির্মিত টানা দোতলা দালান, যেখানে বেশ কয়েকটি বিভাগীয় দপ্তরের অফিস স্থাপন করা হয়েছিল। ইতিহাস বিভাগের দপ্তরটি ছিল নিচতলার এক কোনায় মেডিকেল কলেজের দিকে। মূল ভবনের দোতলায় ওঠার সিঁড়ির পাশে স্থাপিত হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার আর দোতলায় ইংরেজি বিভাগীয় অফিস, কিছু ক্লাসরুম আর শিক্ষক ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক কমনরুম। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনকাল আমরা এখানেই অতিবাহিত করেছি। ১৯৬৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা, বাণিজ্য ও আইন অনুষদ নীলক্ষেতের নতুন ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হয়।

১৯৬০-এর দশকের শেষ ভাগ পর্যন্ত উচ্চশিক্ষার পীঠস্থান হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ছিল সর্বজনবিদিত। এ সময়ে এই খ্যাতির মূলে ছিল এর বিভিন্ন অনুষদের শিক্ষকমণ্ডলীর আন্তর্জাতিক পরিচিতি ও সুনাম। এগুলোর মধ্যে আবার ইতিহাস বিভাগের খ্যাতি ছিল অনেক বিভাগের চেয়ে বেশি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রত্নতত্ত্ববিদ ও প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ ড. আহমদ হাসান দানী ও প্রবীণ ইতিহাসবিদ ড. এম এ হালিমের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপস্থিতি বিভাগের জন্য গর্বের বিষয় ছিল। ড. এম এ করিম, ড. মফিজুল্লাহ কবীর, ওয়াদুদুর রহমান, সন্তোষ ভট্টাচার্য, ড. আবুল খায়ের ও গিয়াসউদ্দিন আহমদ তাঁদের নিজ অধিক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনামের অধিকারী ছিলেন। আর গিয়াসউদ্দিন আহমদের জ্ঞানপিপাসু মন আর ছাত্রদের প্রতি তাঁর অপার মমত্ববোধ ও সহমর্মিতা ইতিহাস বিভাগে তাঁকে সবচেয়ে জনপ্রিয় শিক্ষকের আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। অনার্স ক্লাসের মাত্র ৩৬ জন ছাত্রছাত্রীর প্রত্যেককেই আমাদের শিক্ষকেরা নামে চিনতেন এবং পরিবারের সদস্যদের মতোই আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করতেন। এমন একটি পরিপূর্ণ পরিবারের আপন দ্যুতিতে ভাস্বর তিনটি উজ্জ্বল নক্ষত্রকে বিজাতীয় আলবদর বাহিনী দেশ স্বাধীন হওয়ার কিছু আগে নির্মমভাবে হত্যা করে। অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক আবুল খায়ের ও অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহমদ সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁদের জীবন বিসর্জন দিয়ে গেলেন। আমাদের স্মৃতিতে তাঁরা চির অম্লান হয়ে থাকবেন।

১৯৬০-এর দশক বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। ওই সময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সব-জাতীয় পর্যায়ের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কেন্দ্রবিন্দু। ১৯৬১ সাল থেকেই আইয়ুব খানের সেনাশাসনের বিরুদ্ধে যে প্রবল আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে, তার সূচনা হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায়। পরে এ আন্দোলন আইয়ুব সরকার প্রবর্তিত সংবিধানের বিরুদ্ধে অনমনীয় অবস্থান গ্রহণ করে। এর সঙ্গে একই মাত্রায় চলতে থাকে ছাত্রবিরোধী শিক্ষা কমিশনের সুপারিশমালার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু বাঙালির অধিকারের সনদ ছয় দফা জাতির সামনে পেশ করলে আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ হয়। ১৯৫২-এর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির যে স্বাধীনতাসংগ্রামের সূচনা হয়, ষাটের দশকের নানামুখী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে তার সফল সমাপ্তি ঘটে।

আমাদের পাঠকালীন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক আন্দোলন হয়েছে এবং ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাতে অংশগ্রহণ করেছে। তবে এসব কর্মকাণ্ড শিক্ষা কার্যক্রমকে খুব একটা ব্যাহত করেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৬৪ সালের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্ররা, আগে পরের কয়েক বছরের ছাত্রদের মতো যথাসময়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করতে পেরেছে। শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়েই আমাদের সেশনজটের শিকার হতে হয়নি। সময়মতো শিক্ষাজীবন শেষ করে কর্মজীবন শুরু করা মানুষের জীবনবিকাশে কতটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুরুত্বপূর্ণ, তা আমরা বর্তমানকালের সেশনজটে ভুক্তভোগীদের আর্তি শুনে অনুধাবন করতে পারি।

এমএ পরীক্ষার ফল বেরোনোর আগেই নিজ কলেজ রাজেন্দ্র কলেজে কিছুকাল শিক্ষকতার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। যে কয় দিনই হোক, আবার পরিবারে ফিরে গিয়ে একসঙ্গে সময় কাটাব, এটা আমার জন্য একটা অতিরিক্ত পাওয়া ছিল। বাবা-মা বাড়িতে আমার অনুপস্থিতি খুব অনুভব করছিলেন। তবে ভবিষ্যতে যে লম্বা সময় নিয়ে এ রকমভাবে থাকা যাবে না, আমার কর্মজীবনগত পরিকল্পনাই আমাকে তা বলে দিচ্ছিল।

তিন-চার মাসের মাথায় পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বারাগলিতে নিখিল পাকিস্তান ইতিহাস সম্মেলনে যাওয়ার একটা সুযোগ পেলাম। এর আগে পশ্চিম পাকিস্তানে কখনো যাওয়া হয়নি। যদিও সিএসএস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি শুরু করব ভেবেছিলাম, তবু সেখানে যাওয়াতেই মনস্থির করলাম। আমাদের ডেলিগেশনের নেতা বিভাগীয় প্রধান ড. মফিজুল্লাহ কবীর। আমি ছাড়া অন্য তিন সদস্য হচ্ছেন আমার আগের ক্লাসের মহিউদ্দিন মাহমুদ হাফিজ, যিনি সিএসএস পরীক্ষায় প্রথম হয়ে চাকরিতে যোগদানের অপেক্ষায় আছেন আর বরিশাল বিএম কলেজ ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ইতিহাস বিভাগের দুই বিভাগীয় প্রধান।

ঢাকা, করাচি, লাহোর ও পেশোয়ার—এই চার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ ও নবীন শিক্ষকদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও মতবিনিময়ের জন্য এ সম্মেলনের আয়োজন। এ সেমিনারে গিয়ে দেখলাম, অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তুলনায় আমাদের ইতিহাস বিভাগের পাঠক্রম অনেক বেশি বহুমাত্রিক, বহু বিস্তৃত আর উদারপন্থী। মুসলিম ভারতের ইতিহাসচর্চা ও পাঠদানে তাঁরা যতটা আগ্রহী, প্রাচীন ভারত কিংবা ইউরোপের ইতিহাস পঠনপাঠনে ততটা নন। এমনকি সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা, যা ওই অঞ্চলের এক অবিনশ্বর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, সে বিষয়েও তাদের খুব একটা আগ্রহ দেখা গেল না। ওই বিষয়ের ওপর আমি একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলাম। ১৯৬৫ সালে পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ খোলা হলে ড. আহমদ হাসান দানী সেখানে যোগদান করে ভারতের প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীন ইতিহাসচর্চার ওপর কিছুটা গতিময়তা আনার চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৬৭ সালে লাহোর সিভিল সার্ভিস একাডেমি থেকে পেশোয়ার সফরকালে ড. দানীর সঙ্গে আমার শেষবারের মতো দেখা ও নৈশভোজে যোগ দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বারাগলি থেকে ফেরার এক মাসের মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে যোগদানের জন্য একটি নিয়োগপত্র পাই। এ নিয়োগ আমার জন্য খুব জরুরি ছিল। সিএসএস পরীক্ষার জন্য যে ধরনের বইপুস্তক ও সাময়িকী পড়া দরকার, তার কিছুই ফরিদপুরে নেই। আমি খুব শিগগির ঢাকায় এসে কাজে যোগ দিলাম। মতিঝিল কলোনিতে আমার এক আত্মীয়ের বাসায় উঠলাম। ছোট দুই রুমের ফ্ল্যাট। তার মধ্যেই কষ্ট করে আমার কাজ শুরু করলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় বিভাগেরই জুনিয়র শিক্ষকেরা সিএসএস পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন আবুল হাসান মাহমুদ আলী, অর্থনীতির প্রভাষক, যাঁর সঙ্গে পড়াশোনার ব্যাপারে আমাদের একটা পার্টনারশিপ গড়ে উঠল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাচেলর শিক্ষকদের জন্য তখন কোনো ফ্ল্যাট কিংবা হোস্টেলকক্ষ বরাদ্দ ছিল না। সে সময় বর্তমান কলা ভবনের পেছনে মূলত আন্তর্জাতিক ছাত্রদের বসবাসের জন্য তিনতলা একটি ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেল চালু করা হয়। ওই হোস্টেলেরই পশ্চিম দিকের উইংয়ে কয়েকটি সিঙ্গেল রুম বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্টহাউস হিসেবে ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত ছিল। আমরা খোঁজ নিয়ে জানলাম যে ওই কক্ষগুলো সব খালিই পড়ে থাকে; কদাচিৎ দু-একজন মেহমান আসেন। আমি আর মাহমুদ আলী মিলে উপাচার্য ড. এম ও গনির সঙ্গে দেখা করে ওই গেস্টহাউসের কয়েকটি কক্ষ ব্যাচেলর শিক্ষকদের জন্য বরাদ্দ করার অনুরোধ জানালে তাতে তিনি সম্মত হন। কিছুদিনের মধ্যে আমরা ওই গেস্টহাউসে বসবাস শুরু করি। গেস্টহাউসের বাবুর্চি আমাদের পছন্দমতো সকালের নাশতা তৈরি করে দিত। দুপুর আর রাতের আহার আন্তর্জাতিক ছাত্রদের মেসেই আমরা সেরে নিতাম। এভাবেই আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক পর্যায়ের স্বল্পকালীন জীবন শুরু হলো।

১৯৬৫ সালে ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলে আমাদের অবস্থানকালে ১৮টি দেশের শতাধিক ছাত্রছাত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে অধ্যয়নরত ছিল। চীন, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, নেপাল, শ্রীলঙ্কাসহ বহুসংখ্যক আফ্রিকান দেশের ছাত্রছাত্রীদের সমাগম হতো এখানে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানের ক্রমাবনতির কারণে বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি ওই সব দেশের শিক্ষার্থীদের আর কোনো আগ্রহ নেই। উপরন্তু তাদের নিজেদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষার মানের আপেক্ষিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে মান অবনত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের বিষয়টি এখন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। বরং বাংলাদেশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাত্রছাত্রীরাই এখন সুযোগ পেলে ভারত, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, সিঙ্গাপুরসহ এশিয়ার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার দ্বার সর্বক্ষেত্রে অবারিত থাকবে—এটাই বিশ্বায়নের চাহিদা। তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ যোগাযোগ ও বিনিময় পারস্পরিক না হয়ে কার্যত একমুখী প্রবাহে সীমিত হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ থেকে অনেকেই আঞ্চলিক দেশগুলোতে উচ্চশিক্ষার জন্য গমন করলেও ওই সব দেশ থেকে খুব একটা কেউ এখানে আসতে আগ্রহী হয় না।

কিন্তু কেন এমন হলো? একটু পেছন ফিরে দেখলে এ অবস্থার কিছুটা ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে।

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে পূর্ব বাংলার জাগ্রত মুসলিম সমাজ ভারতের অগ্রসর ও প্রভাবশালী হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতো জ্ঞানে-মানে তাদের কাছাকাছি পৌঁছার যে স্বপ্ন দেখেছিল, তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। ক্ষুব্ধ মুসলিম সমাজের ক্ষোভ কিছুটা প্রশমনের উদ্যোগ হিসেবেই ব্রিটিশরাজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সম্মত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত যারা এখানে লেখাপড়া করেছে, তাদের মধ্যে দুই ধরনের পরিপূরক মূল্যবোধ কাজ করেছে। প্রথমটি ছিল নিতান্তই ব্যক্তিগত স্বার্থসংশ্লিষ্ট। নিম্নবিত্ত ও উঠতি মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে দেখেছে ওপরে ওঠার এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটা নিশ্চিন্ত অবলম্বন হিসেবে। সমকালীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যক্তিস্বার্থ ছাপিয়ে তাদের মধ্যে আরেকটি মূল্যবোধ কাজ করেছে, যা ছিল দেশকে বিদেশি শক্তির গ্রাস থেকে মুক্ত করে নিজস্ব ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। এ দুই ধারার মূল্যবোধের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব কিংবা পরস্পরবিরোধিতা ছিল না। যারা লেখাপড়ার বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছে, তারা প্রত্যক্ষভাবে না হলেও নানাভাবে পর্যায়ক্রমিক স্বাধীনতার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে এবং যখন যেভাবে প্রয়োজন অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছে। একইভাবে যারা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল এবং এ বিষয়টাকেই প্রাধান্য দিয়েছে, তারাও শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে অবহেলার চোখে দেখেনি।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসেবে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সম্পদ ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ন্যায্য হিস্যা না পেলেও প্রাদেশিক সরকারের প্রয়োজনে নতুন নতুন অনেক পদ ও পদবি সৃষ্টি হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলে, সুযোগবঞ্চিত মুসলিম সমাজের অগ্রসর সদস্যদের ওপরে ওঠার পথ কিছুটা সুগম হলো। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় মৌলিক প্রতিষ্ঠান, যেমন—বিচারিক আদালত, বেসামরিক প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যম—সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এমন একটা প্রাতিষ্ঠানিক মান ও মর্যাদা অর্জন করেছিল, যা সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত যেকোনো দেশের জন্যই ঈর্ষণীয় ছিল। মেধা ও কঠোর মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিয়োগ ও পদোন্নতি ছিল এদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য আর নির্ভয়ে সব অযাচিত হস্তক্ষেপ উপেক্ষা করে কাজ করা ছিল এদের অঙ্গীকার। কখনো কখনো এসবের যে ব্যত্যয় হয়নি, তা নয়, তবে তা ছিল খুবই সীমিত।

কেন্দ্র ও প্রদেশে উভয় সরকারই বিদ্যমান শাসনব্যবস্থার মৌলিক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার জন্য দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত পদ্ধতি ও বিধিবিধান বহাল রেখেই সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছে। সেই সূত্রে শাসনব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে মেধার প্রাধান্য আর প্রশাসনকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত রাখার নীতি অব্যাহত থাকল। উন্নত জীবনের প্রত্যাশায় সমাগত সবাই নিশ্চিত হলো যে সবার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে সফল হলেই তাদের প্রত্যাশা পূরণ সম্ভব। আর এ প্রতিযোগিতার ভিত্তি আপেক্ষিক মেধা। দেশের বিদ্যমান নিয়মনীতি অনুসরণ করেই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হবে এবং এ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার উপায় হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত মান অর্জন—তা শুধু লেখাপড়া নয়, আচার-আচরণ ও সার্বিক মানসিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও। সেবার মান নির্ধারণের অন্যতম প্রধান নিয়ামক চাহিদার ধরনধারন। বর্তমান সময়ের মতো তখন বিদেশে লেখাপড়ার সুযোগ এত অবারিত ছিল না। তাই ছাত্র-শিক্ষকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছিল। আর মেধার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ ও কর্মজীবনে তাদের উন্নতি এই প্রক্রিয়াকে আরও সুসংহত করেছিল।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ আরেক দফা ১৯৪৭ সালের মতোই অত্যন্ত শক্তিশালী ও কার্যকর রাষ্ট্রের মৌলিক প্রতিষ্ঠানগুলো উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে জনস্বার্থের দোহাই দিয়ে এগুলোর কাঠামো ও রীতিনীতিতে যথেষ্ট হস্তক্ষেপের ফলে এদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে। যেকোনো সশস্ত্র সংগ্রামে স্বাভাবিক সময়ের চিন্তাধারা কিংবা নিয়মনীতি আর সার্বিকভাবে প্রযোজ্য থাকে না—যুদ্ধজয়ের জন্য যা করা হয়, তার সবই ওই সময়ের প্রেক্ষাপটে বৈধতা পায়। কিন্তু বিজয় অর্জনের পর বিজয়কে সুসংহতকরণের জন্য ক্রমান্বয়ে নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা খুবই প্রয়োজনীয়। তা না করতে পারলে কিংবা নীতিগতভাবে করতে না চাইলে দেশে অরাজক পরিস্থিতি উদ্ভবের আশঙ্কা থাকে। দেশের মৌলিক শাসনব্যবস্থাকে যে অবস্থানে রেখে মুক্তিযুদ্ধে আত্মনিয়োগ করা হয়েছিল, বিজয়ের পর সেই অবস্থানে ফিরে গিয়ে নব উদ্যমে ওই রাষ্ট্রব্যবস্থার আরও উৎকর্ষ সাধন করে সামনে এগিয়ে যাওয়াই ছিল সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জাতির আকাঙ্ক্ষা। গণতন্ত্রকে সুসংহত করার জন্য মুক্তিযুদ্ধকালীন স্থবির প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করে এগুলোর কর্মকাণ্ডকে আরও বেগবান ও গণমুখী করা অতিপ্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতায় আসীন সরকার এসব প্রতিষ্ঠানকে গণতন্ত্র বিকাশের সহায়ক হিসেবে না দেখে এদের প্রতিটিকে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিকেন্দ্র হিসেবে দেখেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের শক্তি বৃদ্ধি নয়, বরং এগুলোকে অধিকারে রাখার জন্য কৌশলে প্রভাবিত বা হতমান করা এবং নগ্ন দলীয়করণের মাধ্যমে এদের নিরঙ্কুশ আনুগত্য অর্জনই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলোর অভিন্ন লক্ষ্যে পরিণত হয়। ১৯৪৭-পূর্ববর্তী প্রজন্ম, যারা তাদের ছাত্রজীবনে পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ছিল এবং পরবর্তীকালে ভারত বিভাগের পর রাজনীতিতে কিংবা প্রশাসনে কিংবা শিক্ষকতায় সম্পৃক্ত হয়েছে, তাদের মধ্যে স্বাধীনতা-পূর্ব কিংবা স্বাধীনতার পর বর্তমানকালের আদর্শবোধ কিংবা নৈতিক অবস্থানের মধ্যে কোনো বিপরীতধর্মী পরিবর্তন লক্ষ করা যায়নি। তাদের আদর্শ, ন্যায়নিষ্ঠা ও নৈতিকতা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে নিঃশব্দে সঞ্চালিত হয়েছে এবং নব নব উদ্যোগ গ্রহণে নতুন প্রজন্মকে উজ্জীবিত করেছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে ১৯৭০-এর দশকে কখনো কখনো প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্বের শূন্যতাকালে যেসব ছাত্রনেতা জাতীয় প্রশ্নে ঈর্ষণীয় মানের নেতৃত্ব দিয়েছে এবং পরে মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে অংশগ্রহণ করেছে, তারাই তাদের উত্তরসূরিদের জন্য সমুন্নত আদর্শ কিংবা নৈতিকতার অনুকরণীয় উদাহরণ রেখে যেতে অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছে। বরং যা প্রতিনিয়ত দৃশ্যমান, তা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। রাজনৈতিক নানা মেরুকরণ এবং ব্যক্তিগত লোভ-লালসার কাছে নীতি আর আদর্শ পরাভূত হয়ে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মানের ক্রমাবনতির পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্ররাজনীতির প্রসঙ্গ আলোচনায় এসেছে। শিক্ষার মানের সঙ্গে ছাত্ররাজনীতির অবশ্যই সম্পৃক্ততা আছে। তবে বিষয়টি আরও জটিল, ব্যাপক ও বহুমাত্রিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকটের উৎস একাধারে ছাত্র, শিক্ষক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনৈতিক দল, সরকার ও রাষ্ট্র। বিগত শতাব্দীতে জাতীয় প্রশ্নে সংঘটিত আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকা এই গোষ্ঠীর সুপ্ত শক্তি সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলোকে সচকিত করে। তবে সে সময় রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন হিসেবে ছাত্রসংগঠন তাদের ভূমিকা পালন করুক—এটা সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাই সংযোগটা ছিল মূলত নেতৃপর্যায়ে এবং তা-ও সংগোপনে। স্বাধীনতার পর এটি প্রকাশ্য রূপ নেয়। জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক লড়াই সম্প্রসারিত হয় ছাত্ররাজনীতিতে। দলীয় শক্তি পরীক্ষার পথ ধরে ক্যাম্পাসে অনুপ্রবেশ করে সন্ত্রাস; ভর্তি ও হলে সিট বরাদ্দে সব নিয়মনীতি বিসর্জন দিয়ে দলীয় আনুগত্যকে প্রাধান্য দেওয়া শুরু হয়। হলে আধিপত্য বজায় রাখার তাগিদে ক্যাম্পাসে আমদানি করা হয় মারণাস্ত্র। ১৯৭৭ সালে আইন প্রণয়ন করে জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে ছাত্ররাজনীতিকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়ে তথাকথিত 'লেজুড়বৃত্তির ছাত্ররাজনীতি'কে বৈধ করা হয়। এ ভ্রষ্ট রাজনীতির হাত ধরে তথাকথিত ছাত্রনেতারা এখন নানা ধরনের আর্থিক ও সামাজিক দুর্নীতিতে জড়িয়ে ছাত্রসমাজের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের মহিমাকে ম্লান করে দিচ্ছে।

এ সংকট থেকে ছাত্রদের রক্ষা করার প্রাথমিক দায়িত্ব শিক্ষকদের। আর কিছু না হোক, তাঁদের দৃপ্ত নৈতিক শক্তি আছে বলে দেশবাসী আশা করতে পারে। কিন্তু জাতির পরম দুর্ভাগ্য এই যে, স্বাধীনতার পর তাঁরাও নোংরা দলীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারি প্রভাবমুক্ত রেখে স্বাধীন জ্ঞানকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে ১৯৭৩ সালে যে বিশ্ববিদ্যালয় আইনটি প্রবর্তন করা হয়েছিল, সেটিকে অপব্যবহার করে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সর্বক্ষেত্রে মেধাকে বিসর্জন দিয়ে দলীয় বিবেচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ এখন রুটিনে পরিণত হয়েছে। সব বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী শিক্ষকের অভাবে জ্ঞানের নতুন নতুন দিক উন্মোচন ও শিক্ষার মানের উৎকর্ষ সাধনে কোনো তৎপরতা নেই; এমনকি বিশ্বায়নের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন নতুন বিষয়ে দক্ষতা অর্জনে প্রশিক্ষণ দিয়ে নতুন প্রজন্মের কর্মসংস্থানেও তেমন কোনো সফল উদ্যোগ নেই। নানা অবক্ষয়ে আজ বিপন্ন ছাত্র ও শিক্ষক সমাজ এবং সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাকরিজীবনের প্রস্তুতিপর্ব : আইসিএস, আইএএস এবং সিএসপি

১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে বারাগলি সেমিনার থেকে ফেরার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পাশাপাশি সিএসএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য জোর প্রস্তুতি চলছিল। ওই সালের সেপ্টেম্বরে ভারতের সঙ্গে কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তান দ্বিতীয়বারের মতো এক অঘোষিত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। তবে খুব দ্রুত পাশ্চাত্যের দুই পরাশক্তির মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলে পরিস্থিতি আবার শান্ত হয়ে আসে। সিএসএস পরীক্ষা সময়মতো হওয়া নিয়ে যে সংশয় ছিল, তারও অবসান হয়।

সিএসএস পাকিস্তান সরকারের উদ্ভাবিত কোনো পদ্ধতি নয়, এটি ব্রিটিশরাজের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। ১৮৫৭ সালে তথাকথিত সিপাহি বিদ্রোহের অবসানের পর ব্রিটিশ সরকার সরাসরি ভারত শাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পরিচালনায় সহায়তার জন্য ব্রিটেন ইম্পিরিয়াল সিভিল সার্ভিসের প্রবর্তন করে। তবে কৌশলগত কারণে ইম্পিরিয়াল শব্দটি পরিহার করে ১৮৬১ সালে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস আইনের অধীনে ইম্পিরিয়াল সার্ভিসকে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে (আইসিএস) রূপান্তর করা হয়। কালক্রমে এই সার্ভিসের সম্পূরক আরও কয়েকটি সর্বভারতীয় সার্ভিস ও প্রথম শ্রেণীর কেন্দ্রীয় সার্ভিস প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৪ সালে এসব সার্ভিসকে সম্মিলিতভাবে সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস বা সিএসএস হিসেবে আখ্যায়িত করে এসব চাকরিতে নিয়োগের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক একটি সম্মিলিত পরীক্ষা গ্রহণ শুরু হয়। এভাবেই সিএসএস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরীক্ষার ধারণাটির উদ্ভব এবং তা বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন ছাড়াই সব কটি উত্তরসূরি দেশে এখনো অনুসরণ করা হয়।

আইসিএস, ভারতব্যাপী রেলওয়ে নেটওয়ার্ক, সুবিন্যস্ত বিচারব্যবস্থা ও আধুনিক সেনা প্রশাসন—ব্রিটিশরাজ তাদের সাম্রাজ্য রক্ষা করতে এসব প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবন করে। তবে উদ্ভাবন করেই তারা থেমে যায়নি, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর উপযোগ-উদ্যোগের মাধ্যমে এগুলোর উৎকর্ষ সাধন করে তাদেরকে সার্থকতার শীর্ষে নিয়ে গেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যমণি আইসিএস, যে প্রতিষ্ঠানকে ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ হাউস অব কমনসে বক্তৃতাকালে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ডেভিড লয়েড জর্জ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 'স্টিল ফ্রেম' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন।

প্রথম দিকে আইসিএসের সব পদই ব্রিটিশদের দখলে ছিল। এই সার্ভিসের নিয়োগ পরীক্ষাটি ছিল অত্যন্ত উঁচু মানের, যেখানে ব্রিটিশ নাগরিকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা ভারতীয়দের জন্য দুরূহ ছিল। এ ছাড়া শুধু লন্ডনেই আইসিএসের নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। সাত সাগর পাড়ি দিয়ে লন্ডনে গিয়ে এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ভারতীয়দের খুব একটা আগ্রহ ছিল না। এসবের পরও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় ভাই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৫২ সালে লন্ডনে গিয়ে আইসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন ও কৃতকার্য হন। তিনিই প্রথম ভারতীয় ও বাঙালি, যিনি ১৮৫৩ সালে আইসিএস ক্যাডারে নিয়োগ লাভ করেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ধাপে নানামুখী চাপের কারণে আইসিএসের 'ভারতীয়করণ' প্রক্রিয়া শুরু হয়। সেই লক্ষ্যে আইসিএসের নিয়োগপদ্ধতি সময়ে সময়ে ভারতীয়দের অনুকূলে পরিবর্তন করা হয়। ১৯২২ সালে গৃহীত প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি ছিল, একযোগে লন্ডন ও নয়াদিল্লিতে সিএসএস পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা, যাতে ভারতীয়রা দেশে বসেই এ পরীক্ষার অংশ নিতে পারে। আইসিএসে ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে আরও কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়। যেমন ১. প্রাদেশিক ও সম্প্রদায়গত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মনোনয়নের মাধ্যমে নিয়োগ; ২. প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ এবং ৩. আইনজীবীদের মধ্য থেকে মনোনয়নের মাধ্যমে নিয়োগ। প্রাপ্ত শূন্যপদের বিপরীতে কোন ক্যাটাগরি থেকে শতকরা কতজনকে নিয়োগদান করা হবে, তা সময়ে সময়ে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সবাইকে অবহিত করা হতো।

উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বয়সসীমা ছিল ২১ থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৪ বছর। চূড়ান্তভাবে বাছাই করা প্রার্থীদের ইংল্যান্ডে এক থেকে দুই বছর শিক্ষানবিশ অফিসার হিসেবে লন্ডনের অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ কিংবা লন্ডন স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজে নির্ধারিত পাঠক্রম অনুসরণ করে শিক্ষানবিশকালীন ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হতো।

অতি উচ্চমান অনুসরণপূর্বক আইসিএস অফিসারদের নির্বাচন, একই মানের নিবিড় প্রশিক্ষণ এবং চাকরিকালীন তাঁদের নিষ্ঠা, দক্ষতা ও সততার বিষয়ে উচ্চপর্যায়ের তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন সমগ্র ভারতে একটি মেধাভিত্তিক দক্ষ ও নিরপেক্ষ প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত করে। সাধারণ প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় ছাড়াও দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন, সাক্ষ্য আইন, বিভিন্ন রাজস্ব আইনসহ প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব ধরনের আইনের সারমর্ম ও ব্যাখ্যা সম্যক অনুধাবন ও পরবর্তী সময়ে কতিপয় মামলার কেস রেকর্ড তৈরির অনুশীলন শিক্ষানবিশকালে প্রশিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। এ ধরনের প্রশিক্ষণের কারণে আইসিএস কর্মকর্তারা শুধু কালেক্টর হিসেবেই নয়, বিচারক হিসেবে নিয়োগের জন্যও যোগ্য বিবেচিত হতেন। মূলত উচ্চ আদালতে তাঁদের নিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্দিষ্টসংখ্যক পদ সংরক্ষণ করা হতো। এভাবেই বেসামরিক প্রশাসন ও বিচার বিভাগের বিভিন্ন স্তরে আইসিএস অফিসারদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

আইসিএসের দক্ষতা ও নিরপেক্ষতা সমকালীন ভারতীয় প্রশাসনে অনেক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাঁদের এই আবহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে প্রশংসিত হয়েছে। তবে ভারতে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন জোরদার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বংশোদ্ভূত আইসিএসরা ব্রিটিশদের আজ্ঞাবহ হিসেবে সমালোচনার মুখে পড়েন। তাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, কর্তব্যে অবহেলা কিংবা সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহারের কোনো অভিযোগ ছিল না; অভিযোগ ছিল ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তাঁদের আনুগত্য ও তাদের অনুসৃত নীতির প্রতি সমর্থন। জওহরলাল নেহরু প্রায়ই ব্রিটিশ নীতিসমূহ সমর্থনের জন্য আইসিএস অফিসারদের বিদ্রূপ করতেন। কোনো এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আইসিএসকে 'neither Indian, nor civil, nor a service' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন মর্মে নেহরু তাঁর মেয়ে ইন্দিরা গান্ধীকে লেখা একটি পত্রে উল্লেখ করেছিলেন। প্রশাসনিক নীতিবোধ আর রাজনৈতিক আবেগ ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে ভারতীয় বংশোদ্ভূত আইসিএস অফিসারদের এক কঠিন পরস্পরবিরোধিতার মুখে ঠেলে দেয়। তবে সে সময় থেকেই অভীষ্ট রাষ্ট্রের পক্ষে তাঁদের সমর্থন নানাভাবে প্রকাশ হতে দেখা গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারত বিভাগের পর ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশেই নতুন সরকার ও প্রশাসন প্রতিষ্ঠাকালে প্রশাসনিক ধারাবাহিকতার অপরিহার্যতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দুই দেশের হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘটিত রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশে অনুগমনকারী লাখ লাখ শরণার্থীর পুনর্বাসন দুই দেশের জন্যই পর্বতপ্রমাণ সমস্যার সৃষ্টি করে। এ ছাড়া উভয় দেশেই বিভিন্ন প্রদেশ ও অঞ্চলের বৈচিত্র্যময় কৃষ্টি, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ের পুঞ্জীভূত সমস্যা এবং প্রয়োজনীয় অর্থ ও সময়ের অভাব দেশের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা নিশ্চিতকরণে বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। ব্রিটিশ আমলে নিয়োগকৃত ও স্বাধীনতার প্রাক্কালে নিজ ইচ্ছায় পছন্দের দেশে আত্তীকৃত আইসিএস অফিসার ও তাঁদের সহযোগী অন্যান্য ক্যাডার এবং বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী অত্যন্ত দক্ষতা ও সাহসিকতার সঙ্গে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম হন। আইসিএস অফিসারদের পরিচালনায় এবং রাজনৈতিক নেতাদের অকুণ্ঠ সমর্থনের ফলে নবীন দুটি রাষ্ট্র তাদের প্রারম্ভিক সমস্যাগুলো কাটিয়ে সামনে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়।

গোষ্ঠী হিসেবে আইসিএস কোনোকালেই ভারতীয় রাজনীতিবিদদের পছন্দের বিষয় ছিল না। তবে তখনকার দিনের রাজনীতিকেরা বৃহত্তর স্বার্থকে নিজেদের পছন্দ-অপছন্দের ঊর্ধ্বে স্থান দিতেন। তাঁরা ভালোভাবেই জানতেন যে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন একধরনের ক্রিয়াকাণ্ড আর স্বাধীনতা অর্জনের পর সেটিকে সুসংহতকরণ আরেক ধরনের কর্মযজ্ঞ, যা করতে গেলে ত্যাগ আর নিষ্ঠার সঙ্গে মেধা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। আইসিএস ও ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে অপছন্দ করলেও উভয় দেশের শীর্ষ নেতারা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং এই ব্যবস্থা পরিচালনাকারী কর্মকর্তাদের সার্বিক দক্ষতা ও নিষ্ঠা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। তাঁদের প্রতি বৈরিতা প্রদর্শন না করে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে তাঁদের সর্বতোভাবে নিয়োজিত করার রাজনৈতিক ইচ্ছার কারণে উভয় দেশেই আইসিএসের পুনর্ভব সম্ভব হয়।

মৌলিক কাঠামো ও পদ্ধতিসমূহে কোনো ব্যাপক পরিবর্তন ছাড়াই উভয় দেশে আইসিএস আত্তীকৃত হলেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উত্তরসূরি দুটি ক্যাডারের ভিন্নতা লক্ষণীয়। স্বাধীন ভারতে আইসিএস আত্তীকরণে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি বিতর্কের সৃষ্টি করে, সেটি ছিল আইসিএসের সর্বভারতীয় চরিত্র। ভারত বিভাগকালে আইসিএস, ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস ও ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস—এই তিনটি ছিল সর্বভারতীয় সার্ভিস। এসব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বভারতীয় সার্ভিস ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় সার্ভিসের কর্মকর্তারা ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে, যদিও সর্বভারতীয় ক্যাডারের কর্মকর্তারা তাঁদের চাকরিজীবনের অধিকাংশ সময়ই তাঁরা যে প্রদেশের বিপরীতে ক্যাডারভুক্ত, সেই প্রদেশের বিভিন্ন পদে নিয়োজিত থাকেন। সর্বভারতীয় কর্মকর্তাদের ওপর প্রাদেশিক সরকারগুলোর নিয়ন্ত্রণের অভাবকে তাদের দুর্বলতার অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী সর্বভারতীয় ক্যাডার অব্যাহত রাখার তীব্র বিরোধিতা করেন। কিন্তু ভারতের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে কেন্দ্রীয় নেতারা এটি অব্যাহত রাখার পক্ষে অবস্থান নেন। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও ভারতের উপপ্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গি, অকাট্য যুক্তি আর সংকল্পের দৃঢ়তার কারণে আইসিএসসহ সব ধরনের সার্ভিসকেই বিদ্যমান কাঠামো ও পদ্ধতির কোনো ধরনের ব্যাপক পরিবর্তন ছাড়াই ভারতীয় প্রশাসনে আত্তীকরণ করা হয়।

আত্তীকরণকালে দুটি বিষয়ে পরিবর্তন আনা হয়। তার একটি হলো পুনর্ভবিত আইসিএসের নামকরণ আর এই ক্যাডারের অফিসারদের বিভিন্ন প্রদেশে বরাদ্দকরণের নীতিমালা। আইসিএস নামের সঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার প্রগাঢ় সম্পৃক্ততার কারণে এটির নাম পরিবর্তন করে 'ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস' (আইএএস) রাখা হয়। আইএএস সর্বভারতীয় সার্ভিস হলেও এটি মূলত প্রতিটি প্রদেশের জন্য এক একটি আইএএস ক্যাডার। এসব ক্যাডারে সংরক্ষিত পদের বিপরীতে এঁরা নিয়োজিত হয়ে থাকেন। যে প্রদেশে তাঁরা ক্যাডারভুক্ত হন, কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় তাঁদের সেই প্রদেশেরই বিভিন্ন পদে কাজ করে যেতে হয়। এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারে কিংবা অন্যত্র তাঁদের পদায়ন হলে তা হয় ডেপুটেশনের মাধ্যমে। ব্রিটিশ ভারতে সর্বভারতীয় সার্ভিসের কোনো কর্মকর্তা তাঁর নিজ প্রদেশে ক্যাডারভুক্ত হতে পারতেন না। কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন সিএসএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে কোন প্রদেশে কতসংখ্যক পদ শূন্য আছে, তার একটি তালিকা প্রকাশ করে। প্রার্থীরা আবেদনপত্রের সঙ্গে কোন প্রদেশে তাঁরা ক্যাডারভুক্ত হতে চান, তার উল্লেখ করতে পারতেন। পরীক্ষার ফলাফল ও পছন্দের ক্রম বিবেচনা করে সর্বভারতীয় পদের জন্য কৃতকার্য প্রার্থীদের প্রদেশ বরাদ্দ করা হতো। আইএএস প্রতিষ্ঠাকালে নিজ প্রদেশে ক্যাডারভুক্ত হওয়া যাবে না, এই কঠোর বিধান কিছুটা পরিবর্তন করে ১ : ২ হারে নিজ প্রদেশে ক্যাডারভুক্ত হওয়ার বিধান করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থাৎ বর্তমানে দুজন নিজ প্রদেশের বাইরে ক্যাডারভুক্ত হওয়ার বিপরীতে একজন নিজ প্রদেশে ক্যাডারভুক্ত হতে পারেন।

ব্রিটিশ শাসকদের আজ্ঞাবহ হিসেবে কিছু সমালোচনা ও অনুযোগ থাকলেও স্বাধীন ভারতে আইসিএস অফিসারদের আত্তীকরণ প্রক্রিয়া খুব একটা বিতর্কের সম্মুখীন হয়নি। জওহরলাল নেহরু দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত দুই আইসিএস অফিসার চিন্তামান দেশমুখ এবং কেপিএস মেননকে যথাক্রমে তাঁর সরকারের অর্থ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন। স্বাধীনতার প্রথম দশকে কেন্দ্রীয় সরকারের সব গুরুত্বপূর্ণ পদে আইসিএস অফিসাররাই অধিষ্ঠিত ছিলেন। অপর এক আইসিএস অফিসার কৈলাস নাথ ওয়ানচু ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি নিয়োজিত হয়েছিলেন। এ ছাড়া আরও বহু আইসিএস অফিসার দেশের বিভিন্ন হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি কিংবা বিচারপতির পদ অলংকৃত করেছেন।

ভারতে আইসিএসের আত্তীকরণের প্রক্রিয়াটি রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা ও পার্লামেন্টে ১৯৫১ সালে অল ইন্ডিয়া সার্ভিসেস অ্যাক্ট পাস করার মধ্য দিয়ে একটি আইনি ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। যে কারণে পরবর্তী সরকারে যে দলই ক্ষমতাসীন হয়েছে, তাদের কেউ এটির কোনো ব্যাপক পরিবর্তনে উদ্যোগীই হয়নি। পক্ষান্তরে পাকিস্তানে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত কোনো সংবিধানই সবার মতৈক্যের ভিত্তিতে প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করা হয়েছে। পাকিস্তানে আইসিএসকে রূপান্তরের বিষয়ে ব্যাপক কোনো রাজনৈতিক আলোচনাও হয়নি। প্রশাসনিকভাবে পাকিস্তান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করে আইসিএস অফিসারদের আত্তীকরণ করা হয়। পরে ১৯৫৪ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান মন্ত্রিসভার একটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব অনুযায়ী পাকিস্তান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস নামটি পরিবর্তন করে সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান (সিএসপি) নামে আইসিএসের উত্তরসূরি হিসেবে একটি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় ভারতের মতো বিভিন্ন প্রদেশে ক্যাডারভুক্তির পরিবর্তে তাঁদের সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগের বিধান করা হয়। যদিও সিএসপি অফিসাররা তাঁদের কর্মজীবনের বিরাট একটা অংশ প্রাদেশিক সরকারের বিভিন্ন পদে অতিবাহিত করতেন, তাঁদের চাকরির চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে পরামর্শক্রমে তাঁদের চাকরি প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হতো। ভারতে ইংরেজিকে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে বহাল রাখার কারণে সেখানে এক প্রদেশের অধিবাসী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইএএস অন্য প্রদেশে স্বচ্ছন্দে তাঁর দাপ্তরিক কাজ নির্বাহ করতে পারতেন। কিন্তু পাকিস্তানে ইংরেজির পরিবর্তে বাংলা ও উর্দুকে যথাক্রমে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ব্যবহারের সরকারি নির্দেশ জারি করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন প্রদেশে সিএসপি অফিসারদের ক্যাডারভুক্তির পক্ষে যুক্তি খুব জোরালো ছিল না। তা ছাড়া দাপ্তরিক ভাষার বিষয়টি বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে প্রশাসনের প্রকৃতি ও গতিময়তার কারণে কোনো সহজ সমীকরণের বশবর্তী নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ ধরনের সমীকরণ সম্ভব হলেও অন্য অনেক ক্ষেত্রে তা আদৌ সম্ভব ছিল না। এ অবস্থায় প্রশাসনের সর্বস্তরে একটি নির্দিষ্ট ভাষার ব্যবহার শতভাগ কার্যকর করা যায়নি, সরকারি নির্দেশ আর বাস্তব অবস্থার মধ্যে পার্থক্যের কোনো সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়নি। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সচিবালয়গুলোতে দাপ্তরিক ভাষাসম্পর্কিত নির্দেশের পরও তা কার্যকর ছিল না। এসব দপ্তরে ইংরেজি ছিল লিখিত যোগাযোগের প্রধান বাহন। পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দুকে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটা অলিখিত দ্বৈততার উপস্থিতি উপেক্ষা করার উপায় ছিল না। সচিবালয়ের কাজটাই এমন যে, সেখানে লিখিত যোগাযোগই মুখ্য ভূমিকা পালন করে; কিন্তু মাঠপর্যায়ের প্রশাসনের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে প্রতিনিয়ত প্রশাসনকে জনগণের মুখোমুখি হতে হয় এবং জনগণের ভাষায় তাদের সঙ্গে কথা বলতে হয়। উর্দু মোটামুটি পোশাকি ভাষা হিসেবে চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ ও রেকর্ডপত্র সংরক্ষণের জন্য বিবেচনার যোগ্য ছিল। কিন্তু মৌখিক যোগাযোগের জন্য আঞ্চলিক ভাষায় কথোপকথনের পারদর্শিতা অপরিহার্য ছিল। এসব কারণে ভারতের মতো ভিন্ন প্রদেশে ক্যাডারভুক্তি না করার সিদ্ধান্ত যথাযথ ছিল মনে হয়।

আত্তীকরণ প্রক্রিয়ার ভিন্নতা ছাড়াও পাকিস্তানের প্রারম্ভিক সমস্যা ছিল ভারতের চেয়ে বহুগুণ জটিল। ভারত বিভাগের সময় পাকিস্তানের ভাগে প্রাপ্ত আইসিএস অফিসারদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত অপ্রতুল। আর বিভিন্ন প্রদেশে প্রতিনিধিত্বকারী অফিসারদের সংখ্যার মধ্যেও কোনো সমতা ছিল না। ওই সময় একজন বাঙালি মুসলমান আইসিএসকে আত্তীকরণের জন্য পাওয়া যায়নি। শুধু আসাম সিভিল সার্ভিসভুক্ত একজন ও বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসভুক্ত দুজন বাঙালিই নমিনেটেড আইসিএস হিসেবে চাকরিরত অবস্থায় পাকিস্তানে আত্তীকৃত হন।

১৯৪০-এর পর থেকে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন যতই বেগবান হচ্ছিল, ততই ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত আইসিএস অফিসাররা চাকরির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগেই অবসর নিয়ে ইংল্যান্ডে ফেরত যাচ্ছিলেন আর অ-ভারতীয়দের নতুন নিয়োগের হারও তাদের অনাগ্রহের কারণে ক্রমান্বয়ে কমে আসছিল। ১৯৪৭ সালে ১০২ জন ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত আইসিএস অফিসার তাঁদের চাকরির পূর্ণ মেয়াদকাল ভারতে অতিবাহিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁদের মধ্যে মাত্র ৩৫ জন পাকিস্তানের পক্ষে অপশন দেন। দুজন ভারতীয় খ্রিষ্টানসহ ৭৯ জন ভারতীয় মুসলিম আইসিএস পাকিস্তানে কাজে যোগদান করেন। খ্রিষ্টান দুজনের মধ্যে একজন হলেন স্যামুয়েল মার্টিন বার্ক ও অপরজন এ আর কর্নেলিয়াস। ১০৪ বছর বয়সে ২০১০ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বার্ক ছিলেন সবচেয়ে দীর্ঘজীবী আইসিএস অফিসার।

আইসিএস অফিসারদের সংখ্যাল্পতা প্রশাসন দ্রুত চালু করার পথে বাধার সৃষ্টি করে; কিন্তু তার চেয়েও বড় সমস্যা ছিল জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার অভাব। পাকিস্তানে যোগদানকারী মুসলিম আইসিএস অফিসারদের মধ্যে ব্রিটিশ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সচিব হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার মতো জ্যেষ্ঠতা কারোরই ছিল না। এঁদের মধ্যে ২১ জনের চাকরির মেয়াদ ছিল ১০ বছরের ওপরে কিন্তু ১৫ বছরের নিচে, আর বাকিদের চাকরিকাল ছিল ১০ বছর কিংবা তারও কম। এ অবস্থায় সরকার পরিচালনার জন্য ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত আইসিএস অফিসারদের সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৯৫০ সালে সাতজন ব্রিটিশ আইসিএস এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত ছিলেন। বাকি পদগুলো অপেক্ষাকৃত কনিষ্ঠ আইসিএস অফিসারদের পর্যায়ক্রমে পদোন্নতি দিয়ে পূরণ করা হয়। এই প্রক্রিয়াতে শুরু থেকেই পাকিস্তানি প্রশাসনে আইসিএস তথা সিএসপি অফিসারদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাকিস্তানে যোগদানকারী আইসিএস অফিসাররা সংখ্যায় নগণ্য হলেও স্বাধীনতার পরপর প্রশাসন প্রতিষ্ঠায় তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। তাঁদের মধ্যে পাকিস্তানের প্রথম পররাষ্ট্রসচিব মুহাম্মদ ইকরামুল্লাহর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর স্ত্রী বেগম শায়েস্তা সোহরাওয়ার্দী ইকরামুল্লাহ একজন পরিশীলিত লেখিকা ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। পাকিস্তান গণপরিষদের দুজন মহিলা প্রতিনিধির তিনি ছিলেন একজন। অপর আইসিএস আগা হিলালি পাকিস্তান ফরেন অফিসকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন এবং পরে পররাষ্ট্রসচিব নিয়োজিত হন। আফতাব গোলাম নবী (এজিএন) কাজী অর্ধশতাব্দী ধরে তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে বহু কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কুমিল্লা মডেল ও থানা ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের প্রবর্তক আখতার হামিদ খানের নাম দেশে-বিদেশে বহুল পরিচিত। মীর্জা মুজাফফর (এমএম)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহমেদ পাকিস্তানের পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান হিসেবে দীর্ঘ সময় সরকারে প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে গেছেন। আইসিএস গোষ্ঠীর মধ্য থেকে চারজন পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁরা হলেন: মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন (১৯৬০), এ আর কর্নেলিয়াস (১৯৬০-৬৮), এস এ রহমান (১৯৬৮) ও শেখ আনোয়ারুল হক (১৯৭৭-১৯৮১)। অপর খ্যাতিমান ব্যক্তি এম আর কায়ানি তদানীন্তন সামরিক সরকারের কঠোর সমালোচনার দায়ে সামরিক সরকার কর্তৃক সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ থেকে বঞ্চিত হন।

অখণ্ড পাকিস্তানে দুই দশকের বেশি সময় এবং স্বাধীন বাংলাদেশে ২০০০ সাল পর্যন্ত আরও তিন দশক ধরে সিএসপি অফিসাররাই ছিলেন প্রশাসনের মুখ্য নিয়ন্ত্রক। উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সমগ্র পাকিস্তানের মেধাবী ছাত্রদের সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের ফলে ব্রিটিশ ভারতের মতো অত উন্নতমানের না হলেও দেশে প্রাপ্ত সর্বোত্তম মানবসম্পদের সমন্বয়ে একটি মেধাভিত্তিক প্রশাসন এ দেশে সক্রিয় ছিল। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, কেন্দ্রীয় সরকারের সকল স্তরের চাকরিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নিবাসী চাকুরেদের সংখ্যার সমতাবিধানের জন্য প্রাপ্ত পদের ৩০ ভাগ মেধার জন্য উন্মুক্ত রেখে বাকি পদগুলোয় আধাআধি দুই প্রদেশের কৃতকার্য প্রার্থীদের মধ্য থেকে চূড়ান্তভাবে নিয়োগ করা হতো। কিন্তু প্রাদেশিক কোটার প্রচলন করা হলেও মেধাকে কোনোভাবেই বিসর্জন দেওয়া হয়নি। কারণ, প্রদেশের প্রার্থীদের বাছাই করা হতো সম্মিলিত পরীক্ষায় তাঁদের অর্জিত মানের ক্রমানুসারে।

গোষ্ঠী হিসেবে সিএসপি অফিসাররা তাঁদের ক্রিয়াকাণ্ডের জন্য অনেক প্রশংসার দাবিদার হলেও তাঁরা বেশ সমালোচিতও হয়েছেন। এঁদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমালোচনাকে তিন ভাগে ভাগ করে আলোচনা হতে পারে। সিএসপিদের ওপর আরোপিত এলিটিস্ট শ্রেণীচরিত্র থেকে মূলত প্রথম ভাগের সমালোচনার উদ্ভব। এসব সমালোচক সিএসপিকে একটি এলিট গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করে এলিটিজমের অনেক নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য এঁদের মধ্যে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। অভিযোগটা এমন যে 'আমরাই সর্বোৎকৃষ্ট'—এ ধরনের একটা উন্নাসিক দৃষ্টিভঙ্গি এঁদের চিন্তা-চেতনা ও কর্মকাণ্ডে সম্প্রসারিত হয়ে জনগণ থেকে এঁদের বিচ্ছিন্ন করে এমন একদল বিফল, স্বার্থপর ও উচ্চাভিলাষী কর্মকর্তার সৃষ্টি করেছে, যা প্রশাসনের জন্য শুভ হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজবিজ্ঞানীরা এলিটিজমকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, সে অনুযায়ী আইসিএস অবশ্যই একটি এলিট সার্ভিস। এলিটিজমের মূল ভিত্তি হচ্ছে সমাজের অন্যদের তুলনায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস। কতিপয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সদস্যরা যখন বিদ্যাবুদ্ধি, বংশগত পরিচিতি ও সামাজিক মর্যাদার সূত্রে দেশের আপামর মানুষের মধ্য থেকে নিজেদের অনেক ওপরে বলে মনে করেন, তখন থেকেই এলিটিজমের সূত্রপাত। আইসিএস বাছাই পরীক্ষায় মেধার প্রাধান্য ও কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ এবং প্রার্থীদের মধ্যে ব্রিটিশ অভিজাত শ্রেণীর একচ্ছত্র আধিপত্য—এ ধারণাকেই সমর্থন করে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত যাঁরা আইসিএস পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছিলেন, তাঁদেরও কেউ কিন্তু আপামর মানুষের মধ্য থেকে উঠে আসেননি। তাঁদের বংশগত ও সামাজিক পরিচিতি অবশ্যই দেশের সাধারণ লোক থেকে পৃথক করেছে। এলিটিজমের আরেকটি বৈশিষ্ট্যের কারণেও আইসিএস একটি এলিট সার্ভিস। গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্ব কিংবা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার স্বার্থে যেকোনো এলিট গোষ্ঠী কঠোরভাবে গোষ্ঠীতে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করে। এমনসব নিয়মনীতি প্রবর্তন ও অনুসরণ করা হয়, যেন কাঙ্ক্ষিত মান কোনোক্রমেই উপেক্ষা করা না হয়। ভারতীয়দের জন্য আইসিএস পরীক্ষার বিষয়াবলি শুধু যে জাতিগতভাবেই পক্ষপাতদুষ্ট ছিল, তা-ই নয়, ভারতীয়দের সবার পক্ষে দিল্লিতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ যেমন সময়সাপেক্ষ, তেমনি ব্যয়বহুলও ছিল। তাই অনেকে যোগ্য হলেও এখানে তাঁদের প্রবেশাধিকার নানা কারণে সহজ ছিল না।

সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের কারণে ইচ্ছাকৃত না হলেও আইসিএস অফিসার আর জনগণের মধ্যে শুরু থেকেই একধরনের দূরত্ব সৃষ্টি হতো। আর চাকরির সময় তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাপন ও চিন্তা-চেতনা এই দূরত্বকে আরও প্রকট করে তোলে। অত্যন্ত দক্ষতা ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার সঙ্গে আইসিএস অফিসাররা তাঁদের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তাঁদের প্রশাসনে যুক্তিবাদিতার প্রখরতা ছিল কিন্তু হৃদয়স্পর্শী কোনো মর্মবাণী উচ্চকিত ছিল না। যে কারণে এঁদের কাজকর্ম প্রশংসিত হলেও তাঁদের নিয়ে কেউ ভাবাবেগে আপ্লুত হয় না। যেকোনো সার্ভিসেই যুক্তিবাদিতার সঙ্গে সহমর্মিতার অবশ্যম্ভাবী দ্বন্দ্ব একটি মৌলিক সমস্যা এবং আইসিএসে এর মাত্রা অনেক বেশি ছিল।

পাকিস্তানের সিএসপি ব্রিটিশ ভারতে আইসিএসের উত্তরসূরি। এদের ভালো-মন্দের কিছু কিছু সিএসপিদের ওপর আরোপিত হবে, এটাই স্বাভাবিক এবং হয়েছেও তা-ই। তবে সিএসপি অফিসারদের সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস ও মর্যাদা এবং বিজাতীয় বনাম জাতীয় বিতর্কে জাতীয় হিসেবে পরিগণিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হওয়ার অন্তর্নিহিত সুবিধা সিএসপিদের অনেক ক্ষেত্রেই আইসিএস থেকে স্বতন্ত্র ধারায় অধিষ্ঠিত করেছে।

প্রথমত, আইসিএসের মতো সিএসপি একই সামাজিক শ্রেণীভুক্ত সদস্য-অধ্যুষিত নয়। সার্বিকভাবে পূর্ব পাকিস্তান নিবাসী ও পশ্চিম পাকিস্তান নিবাসী সিএসপি অফিসারদের মধ্যে এবং অন্য পর্যায়ে পশ্চিম পাকিস্তানের অঙ্গভুক্ত চারটি অঞ্চলের সিএসপিদের মধ্যে আন্ত-আঞ্চলিক সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের যথেষ্ট তারতম্য ছিল। পূর্ব পাকিস্তান থেকে যাঁরা সিএসপিতে নিয়োগ পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ২-৪ শতাংশ বাদে বাকি সবাই এসেছেন নিম্ন ও মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠী থেকে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব ছাড়া বাকি অঞ্চলগুলো থেকে সামন্ত প্রভুদের সন্তানেরাই সিএসপিতে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছেন বেশি। পাঞ্জাবেও ভূমিভিত্তিক অভিজাত শ্রেণীর দাপট পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য অঞ্চল থেকে কম ছিল না। তবে এদের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, ব্যবসা-বাণিজ্যে পাকিস্তানের অন্য অঞ্চল থেকে পাঞ্জাব অনেক বেশি অগ্রসর ছিল। বেশ কিছুকাল থেকেই সামন্ত প্রথার দুষ্টচক্রকে এড়িয়ে পাঞ্জাবে একটি প্রগতিপন্থী, উচ্চশিক্ষিত ও মার্জিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হচ্ছিল। ভারত বিভাগকালে সর্বস্ব হারিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা মুসলিম শরণার্থীদের পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপায় ছিল উচ্চপর্যায়ের চাকরিতে নিয়োগ লাভ। এ কারণেই পাঞ্জাব নিবাসী সিএসপিদের মধ্যে মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত অফিসারদের সংখ্যা পূর্ব পাকিস্তান নিবাসী অফিসারদের মতো সর্বব্যাপী না হলেও, যথেষ্ট ছিল।

দ্বিতীয়ত, সিএসপিতে নিয়োগের জন্য সিএসএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ আইসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের চেয়ে বহুগুণ সহজ ছিল। সিএসএস পরীক্ষা পাকিস্তানের প্রধান প্রধান শহরে অনুষ্ঠিত হতো। বিদেশে উচ্চশিক্ষারত প্রার্থীদের সুবিধার জন্য লন্ডন ও ওয়াশিংটন ডিসিতে পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের নির্ধারিত ফি ছিল মাত্র ২৫ টাকা। ২১ থেকে ২৪ বছর বয়সী যেকোনো পাকিস্তানি নাগরিক স্নাতক ডিগ্রি, অনার্স কিংবা পাস যা-ই হোক, অর্জন করে থাকলেই তিনি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হতেন। একটি শর্ত ছিল এই যে, শিক্ষাজীবনের কোনো পাবলিক পরীক্ষায় কেউ তৃতীয় শ্রেণী পেয়ে থাকলে তিনি অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন না। কোনো প্রার্থী সিএসএস পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তাঁর পছন্দের চাকরিটি পাওয়ার জন্য সর্বোচ্চ তিনবার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারতেন। সিএসএস পরীক্ষার দ্বার এভাবে অবারিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার ফলে পিএইচএডি ডিগ্রিধারী থেকে শুরু করে বিএ পাস কোর্সের বহু প্রার্থী এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন। আর একাধিকবার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার নজির অফুরন্ত, যদিও কৃতকার্যতার হার খুব বেশি নয়।

তৃতীয়ত, অধিকাংশ আইসিএস অফিসার ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত হওয়ায় দেশের জনগণের সঙ্গে তাঁদের আত্মিক যোগাযোগে যথেষ্ট ঘাটতি ছিল। কোনো কোনো আইসিএস অফিসার এ বিষয়ে তৎপর হলেও খুব সফলতা লাভ করতে পারেননি। এঁদেরকে সবাই বিজাতীয় হিসেবেই দেখেছে এবং সব সময়ই এঁদের থেকে একটা দূরত্ব বজায় রেখেছে। সিএসপি অফিসাররা এ দেশের সন্তান হওয়ার ফলে জনগণের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা অনেকটাই সহজ হয়েছে। জনগণ প্রশাসনকে সন্দেহের চোখে না দেখে বিভিন্ন সেবাপ্রাপ্তির আশায় প্রশাসনের মুখোমুখি হয়েছে। সিএসপিদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশে গণমুখী প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এমন দাবি যেমন অতিরঞ্জিত; তেমনি সিএসপি অফিসাররা সম্পূর্ণ জনবিচ্ছিন্ন থেকে আইসিএসের এলিটিজমের ধারাকেই অব্যাহত রেখেছেন, এমন অভিযোগও ভিত্তিহীন। ধীরে ধীরে হলেও নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান নিবাসী উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতার যে পরিবর্তন শুরু হয়েছিল, ১৯৬০-৭০ দশকের পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাই তার স্বাক্ষর বহন করে।

দ্বিতীয় ভাগের সমালোচনার উৎস দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন: রাজনীতিবিদ কিংবা রাজনৈতিক কর্মীরা সামগ্রিকভাবে প্রশাসন, বিশেষভাবে সিএসপিদের অনেক কর্মকাণ্ডকেই তাঁদের নিজস্ব এজেন্ডা বাস্তবায়নে বিরাট বাধা হিসেবে দেখেছেন। এই প্রক্রিয়ায় এঁদের মধ্যে সব সময়ই একটি প্রচ্ছন্ন বৈরিতা উভয়ের সম্পর্কে প্রায়ই টানাপোড়েনের সৃষ্টি করেছে—বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এই রেষারেষিকে অনেক সময় প্রকট আকার ধারণ করতে দেখা গেছে। রাজনীতিকদের বিদ্বেষের কারণ ব্যক্তিগত রেষারেষির চেয়ে বেশি ছিল গোষ্ঠীকেন্দ্রিক এবং এর উদ্ভব রাজনৈতিক বনাম প্রশাসনিক নৈতিকতার ভিন্নতর দর্শন থেকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য ক্ষমতা লাভ। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, কে কখন কীভাবে রাষ্ট্রীয় সম্পদ এবং রাষ্ট্রপ্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তবে সম্পদের অপ্রতুলতা আর সুযোগ-সুবিধার অপর্যাপ্ততার কারণে কোনো রাষ্ট্রই তার সব নাগরিকের চাহিদা মেটাতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষমতাসীনদের সদিচ্ছা থাকলেও সিংহভাগ নাগরিক তাদের প্রত্যাশাবঞ্চিত থেকে যায়। এমন পরিস্থিতিতে সুশাসন-অনুগামী প্রশাসনের রীতি হচ্ছে রাজনৈতিক প্রভুদের সম্মতিক্রমে সম্পদ আহরণ, নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টন এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট সুযোগ-সুবিধা বণ্টনের নীতিমালা প্রণয়ন এবং কঠোরভাবে তা অনুসরণ করে বণ্টন কার্যক্রম সম্পাদন। প্রশাসনিক নৈতিকতার ভিত্তি হচ্ছে নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে এমনভাবে সিদ্ধান্ত কার্যকর করা, যেন কেউ পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি, প্রতারণা কিংবা বিধিবিধান লঙ্ঘনের মতো কোনো অভিযোগ উত্থাপন না করতে পারে। নিয়মনীতি মেনে সীমিত সম্পদ কিংবা সুযোগ-সুবিধা যোগ্য ব্যক্তিদের দিলে বাদ পড়া ব্যক্তিদের মনে সে জন্য কোনো ক্ষোভের সঞ্চার হয় না। কিন্তু ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা বিধিবিধান উপেক্ষা করে কিংবা পরিবর্তন করে যখন অন্যায্য সুবিধা আদায় করেন কিংবা অযোগ্য ব্যক্তিকে সুবিধা প্রদান করেন, তখন প্রত্যাশিত সেবা ও সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত জনগণের মনে প্রশাসনের নৈতিকতা সম্পর্কে ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি হয়। যেকোনো বিবেকবান কর্মকর্তার জন্য এ পরিস্থিতি মোটেই কাম্য নয় এবং শত বিপত্তির মুখেও তাঁরা প্রশাসনিক নৈতিকতা সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট থাকেন। আর এখানেই প্রশাসনের সঙ্গে রাজনীতির বিবাদের একটি ক্ষেত্র তৈরি হয়।

জাতীয় থেকে স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত রাজনীতি নির্বাচকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তনির্ভর। রাজনীতিবিদেরা ভোটযুদ্ধে তাঁদের প্রত্যক্ষ ও নিকটতম সহযোগীদের দাবি মেটানোকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে থাকেন। দুর্ভাগ্যবশত রাজনৈতিক পর্যায় থেকে উত্থাপিত দাবিগুলো অধিকাংশ সময়ই প্রশাসনিক রীতিনীতির আওতায় নিষ্পন্ন করা সম্ভব হয় না। প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের রাজনীতিবিদদের মতো নির্দিষ্ট সময় অন্তর ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয় না; তাই তাঁরা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কঠোর ও অনমনীয় হতে পারেন। কিন্তু এ ধরনের রীতিনীতির শতভাগ অনুসরণ রাজনীতিবিদদের জন্য আত্মঘাতী হতে পারে। এই দ্বন্দ্বে অধিকাংশ সময়ই রাজনীতিকদের জয় অনিবার্য নয় এবং কখনো কখনো তাঁদের বিব্রতকর অবস্থায় পিছু হটতে হয়। এই প্রক্রিয়াতে প্রশাসন ও রাজনীতির ঠান্ডা লড়াই প্রশাসনের প্রতি রাজনীতিবিদদের বিদ্বেষ বহুগুণ বৃদ্ধি করে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা প্রকাশ্য আক্রোশের রূপ নেয়।

তৃতীয় ভাগের সমালোচনার উদ্ভব কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলোর বিভিন্ন সার্ভিসের সদস্যদের মধ্য থেকে। সিএসপি এবং অন্যান্য সার্ভিসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সদস্যদের চাকরির শর্তাবলির মধ্যে বিরাট ব্যবধান এই বৈরিতার অন্যতম প্রধান কারণ। বেতন-ভাতা, পদোন্নতি, বিদেশি সংস্থায় ডেপুটেশন, বিদেশে প্রশিক্ষণ—সবকিছুতেই সিএসপি অফিসারদের অগ্রাধিকার সুরক্ষিত ছিল। মাঠপর্যায়, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সচিবালয় ছাড়াও অন্যান্য ক্যাডারের উচ্চপদগুলো সিএসপি ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। এমনকি হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের জন্য নির্দিষ্ট পদসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সিএসপি অফিসার দিয়ে পূরণের জন্য সংরক্ষিত ছিল। একটি বিশেষ সার্ভিসকে এতসব সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার পেছনে অন্য কিছুর মধ্যে তিনটি প্রধান কারণ ছিল: এক, যেকোনো বছর সীমিতসংখ্যক মেধাবী প্রার্থীর প্রাপ্যতা; দুই, কাঠামোগত কারণে উচ্চপদের স্বল্পতা এবং তিন, সম্পদের অপ্রতুলতা।

১৯৪৮ সালে ২০১২ জন প্রার্থী দিয়ে পাকিস্তানে সিএসএস পরীক্ষার যাত্রা শুরু, যা ১৯৭০ সালে ১৫ হাজারের ঊর্ধ্বে উন্নীত হয়েছিল। প্রতিবছরের পরীক্ষায় কৃতকার্য প্রার্থীদের মেধার ক্রমের সঙ্গে তাঁদের শিক্ষাজীবনের রেকর্ড মিলিয়ে দেখা গেছে, প্রথম ৪০-৪৫ জন প্রার্থীর পর বাকিদের মেধা ও শিক্ষাজীবনের রেকর্ড তত উন্নত নয়। আরও এই প্রথম দিকের সবাই মোটামুটি সিএসপি কিংবা পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে নিয়োগ লাভ করেছেন। অন্য সার্ভিসেও কখনো কখনো কিছু কিছু মেধাবী প্রার্থী নানা ঘটনার ফেরে নিয়োগ পেয়েছেন; কিন্তু তাঁরা ব্যতিক্রম এবং সংখ্যায় নগণ্য। মেধা যদি বিভিন্ন চাকরির শর্তাবলির তারতম্যের কারণ হয়, তবে এই তারতম্যের একটা যুক্তিবাদী ভিত্তি ছিল।

এই তারতম্যের আরেকটি কারণ ছিল উচ্চপদের স্বল্পতা। আমাদের দেশে প্রশাসনিক কাঠামো সাধারণত পিরামিড আকৃতির হয়। অর্থাৎ নিচের দিকে প্রচুর পদের প্রয়োজন হয়, যা ওপরের পদসোপানে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। এই বাস্তবতায় সব সার্ভিসের পদোন্নতির সম্ভাবনা একই ধাঁচে বিন্যাস করা সম্ভব নয়।

সিএসপি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলোর পক্ষে-বিপক্ষে বহু গবেষণা হয়েছে এবং বিগত শতাব্দীর অনেক সময়জুড়ে শিক্ষাঙ্গনে ও বুদ্ধিজীবী মহলে এর ওপর অনেক প্রবন্ধ, সন্দর্ভ ও গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে সরকার-গঠিত কমিশনেও এসব বিষয় বিস্তারিত পর্যালোচনা করে অবস্থার পরিবর্তনের জন্য সুপারিশমালা সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছে। তবে আমরা জানি যে প্রশাসনিক সংস্কার অত্যন্ত দুরূহ ও জটিল একটি কাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে এসব সুপারিশ বাস্তবায়নের দৃঢ় অঙ্গীকার না থাকলে তা কখনো সম্ভব হয় না।

যেকোনো পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা বৃহত্তর সমাজেরই অংশ। সমাজ যেমন বিভিন্ন গুণমান আর চালচিত্রের লোক নিয়ে সংগঠিত হয়, এর বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনে এই বৃহৎ চিত্রের ক্ষুদ্রকায় প্রতিফলন তেমনি এই ধারারই স্বাভাবিক সম্প্রসারণ। সিএসপিদের পক্ষে-বিপক্ষের বিতর্কে কখনো এই যুক্তি দেওয়া হয় না যে এঁরা সবাই একই গুণগত মানসম্পন্ন ও নীতিজ্ঞানের অধিকারী। আর দশটি পেশার মতো সিএসপিও ভালো-মন্দ সব রকম মানুষ নিয়েই সংগঠিত। এঁদের মধ্যে অবশ্যই কেউ কেউ একধরনের উন্নাসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে নিজেদের জনগণের কাছে জাহির করার চেষ্টা করেছেন, অনেক সময়ই নিজেদের পূর্বপরিচয় বিস্মৃত হয়ে; কেউ কেউ ক্ষমতার দম্ভে জনগণের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন এবং কখনো কখনো ক্ষমতার অপব্যবহারও করেছেন। আবার এঁদের মধ্যে অনেকে দেশমাতৃকার উন্নয়নের জন্য দিনরাত নিরলস পরিশ্রম করে গেছেন এবং আরও অনেকে দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেদের জীবন দান করে গেছেন। তবে সিএসপিদের নিয়ে অধিক সমালোচনার কারণ তাঁরা সব সময়ই সরকারের উচ্চপদগুলোতে আসীন ছিলেন। কতিপয় সদস্যের অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের কারণে দেশ ও দশের কল্যাণে সিএসপি-গোষ্ঠীর অবদানকে অবমূল্যায়ন করলে তাঁদের প্রতি অবিচার করা হবে।

সম্পদের অপ্রতুলতা চাকরির সুযোগ-সুবিধা যৌক্তিকীকরণের পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোতে আন্তসার্ভিস বৈষম্য আদৌ প্রকট নয়; সেসব দেশের সরকার সব কর্মকর্তার একটা সুন্দর জীবনযাপনের জন্য পর্যাপ্ত বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে থাকে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে একই শ্রেণীভুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য প্রায় সমপর্যায়ের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া সম্ভব ছিল না। মাঠপর্যায় ও সচিবালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে মেধাবী ও দক্ষ কর্মকর্তার প্রয়োজন। এ জন্য বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মেধাবী ছাত্রদের সরকারি চাকরিতে আকৃষ্ট করতে হয়। আর তা করতে হলে আকর্ষণীয় চাকরির শর্তাবলির কোনো বিকল্প নেই। এই টানাপোড়েনের মধ্যে সরকার সজ্ঞানেই এই বৈষম্যমূলক বিভিন্ন সার্ভিসের প্রবর্তন করে।

সম্পদ অপ্রতুলতার দেশে কোনো গোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি অবশ্যই বিদ্বেষ ও ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে এই ক্ষোভ নিরসনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য পাকিস্তান সরকার কখনো দৃঢ়সংকল্প নিয়ে কোনো উদ্যোগ নেয়নি। আইসিএসের মতো নিয়ন্ত্রিত সার্ভিসেও ভারতীয়করণের স্বার্থে অন্যান্য সার্ভিস থেকে আইসিএসে মনোনয়নের একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছিল। একইভাবে অন্যান্য সার্ভিসের কর্মকর্তাদের ক্ষোভ ও হতাশা কিছুটা হলেও প্রশমনের জন্য সিএসপির কিছু পদে তাঁদের মধ্য থেকে যোগ্যদের আত্তীকরণের বিধান করা যেত। পাকিস্তান আমলে এবং বাংলাদেশেও প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রে যুক্তিবাদিতার চেয়ে রাজনৈতিক বিবেচনা অগ্রাধিকার পাওয়ার কারণে অনেক সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেছে।

সিএসপির বিরুদ্ধে এতসব সমালোচনা ও বিদ্বেষবাণীর পরও ১৯৭০ সাল পর্যন্ত গৃহীত সিএসএস পরীক্ষাগুলোতে অন্য পেশার প্রতি গভীরভাবে আগ্রহী নগণ্যসংখ্যক শিক্ষার্থী বাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের এমন কেউ খুব কম ছিলেন, যাঁরা অন্তত একবার হলেও ওই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেননি। বিদেশে চাকরির সুযোগ কিংবা একটা গতিময় বেসরকারি খাতের আবির্ভাব—এসব আরও অনেক পরের ঘটনা। আমাদের সময় সরকারি চাকরিই ছিল কর্মজীবনে প্রবেশের অন্যতম প্রধান অবলম্বন আর সিএসএস ছিল তখনকার দিনের হিসেবে কর্মজীবনে প্রবেশের সিংহদ্বার। অন্যদের মতো আমিও তাই এই সিংহদ্বার পেরোনোর পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার পথ ধরলাম।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাকরিজীবনের প্রস্তুতিপর্ব : কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং সিএসএস

সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত পাকিস্তানের প্রশাসন পূর্ণোদ্যমে চালু করার পথে সকল পর্যায়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অভাব বিরাট সংকটের সৃষ্টি করে। তবে সংকট যেমন সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে, তেমনি বাধা উত্তরণের পন্থা উদ্ভাবনেরও প্রেরণা জাগায়। করাচিতে কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং সিএসএস পরীক্ষার পুনঃপ্রবর্তন এই প্রক্রিয়ারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বল্পতা নিরসনের জন্য দ্রুত কর্মকর্তা নিয়োগ করে প্রশিক্ষণ শেষে তাঁদের কাজে লাগানো সে সময় পাকিস্তানের জন্য খুবই জরুরি ছিল। তবে রাজনৈতিক নেতা ও উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তারা কেউই আপৎকালীন সমস্যা মোকাবিলার নামে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক কর্মকর্তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত মান কোনোভাবেই অবনমিত করার পক্ষপাতী ছিলেন না। দেশের বিদ্যমান মানবসম্পদের মধ্য থেকে মেধাবী ও প্রতিভাবান প্রার্থীদের বাছাই করে যতটা সম্ভব মান অক্ষুণ্ন রেখে সিএসপি ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় সার্ভিসের কর্মকর্তাদের নিয়োগ করা তাঁদের লক্ষ্য ছিল। ব্রিটিশরাজের রেখে যাওয়া দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত প্রশাসনিক কাঠামোর ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত রাষ্ট্রের মৌলিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধারণ ও লালনের রাজনৈতিক সদিচ্ছা এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ভারত-পাকিস্তান বিভাগের সন্ধিক্ষণে পাবলিক সার্ভিস কমিশন শিক্ষিত ভারতবাসীর কোনো অজানা বিষয় ছিল না। ১৯২৮ সাল থেকেই দিল্লিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি সরকারি কর্মকমিশন পূর্ণমাত্রায় কর্মরত ছিল। চেয়ারম্যানসহ পাঁচ সদস্য নিয়ে এই কমিশনের যাত্রা শুরু। কমিশনের কার্যক্রম ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর ভাবমূর্তি সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার এতটা সতর্ক ছিল যে আইসিএস অফিসারদের স্বল্পতা সত্ত্বেও এর চেয়ারম্যান ও একজন সদস্য এবং কমিশনসচিব পদে অত্যন্ত দক্ষ আইসিএস অফিসারদের নিয়োগ দেয়। বাকি তিন সদস্যের মধ্যে একজন ছিলেন প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, অপরজন কাউন্সিল অব স্টেটের একজন সাবেক সদস্য এবং তৃতীয় জন ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এককালীন উপাচার্য। সেক্রেটারি অব স্টেট কর্তৃক তাঁরা পাঁচ বছর মেয়াদে নিয়োজিত হন এবং মেয়াদান্তে তাঁদের সবাই আবার পূর্ণ কিংবা আংশিক সময়ের জন্য পুনর্নিয়োগের জন্য বিবেচিত হতে পারতেন।

কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে উচ্চপদে আসীন হওয়ার যোগ্যতা রাখলেও তাঁদের দায়িত্বের সীমাবদ্ধতার কারণে কমিশন যথেষ্ট শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারেনি। প্রার্থী যাচাই ও নিয়োগের ক্ষেত্রে এটির কোনো কার্যকর ভূমিকা ছিল না। এর কাজ কেবল সীমাবদ্ধ ছিল পরামর্শদানের মধ্যেই। আর এর নিয়ন্ত্রণ গভর্নর জেনারেলের কাছে ন্যস্ত না করে সুদূর লন্ডনে কর্মরত সেক্রেটারি অব স্টেটের হাতে ন্যস্ত করায় একধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত দ্বৈততার সৃষ্টি হয়। একটা দক্ষ, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ কমিশন গঠন করা হলেও কাজের পরিধির সীমাবদ্ধতা ও দ্বৈততার কারণে এর কার্যকারিতা খুব দৃশ্যমান ছিল না।

১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইন এসব সীমাবদ্ধতার অনেকটাই দূর করতে সক্ষম হয়। বাস্তবতার নিরিখে কমিশনের নাম পরিবর্তন করে ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশন রাখা হয়। এটির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছ থেকে প্রত্যাহার করে গভর্নর জেনারেলের হাতে ন্যস্ত করা হয়। তবে এই আইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল বিভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি করা। সব প্রদেশই এককভাবে কিংবা অন্য প্রদেশের সঙ্গে যৌথভাবে কমিশন প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। এই বিধানটি যুগান্তকারী এ জন্য যে, এর মাধ্যমে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও পরবর্তী ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিতকরণের জন্য এই ক্ষমতালাভ জরুরি ছিল।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগকালীন পাকিস্তানের অঙ্গীভূত বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে শুধু পূর্ব পাকিস্তানেই নতুন করে ঢাকায় পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রতিষ্ঠা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে হয়। অন্য প্রদেশগুলো বিদ্যমান কমিশন ও জনবল উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয় এবং ওই কাঠামোর ওপর ভিত্তি করেই ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ড ও উন্নয়ন-প্রক্রিয়া শুরু করে।

অবিভক্ত বঙ্গ প্রদেশের জন্য ১৯৩৭ সালে কলকাতায় বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভারত বিভাগকালীন সময়ে একজন চেয়ারম্যান ও দুজন সদস্য কমিশনে কর্মরত ছিলেন। আইসিএস অফিসার স্যার আর্থার জুলেস ড্যাশ বঙ্গ প্রদেশের মুখ্য সচিব পদ থেকে ১৯৪২ সালে কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। তাঁর সঙ্গে সদস্য হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের অধ্যাপক শাহেদ সোহরাওয়ার্দি ও বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের সদস্য ও প্রাক্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রায় বাহাদুর এস এন রায় কর্মরত ছিলেন। স্যার ড্যাশ ও অধ্যাপক সোহরাওয়ার্দি উভয়েই পাকিস্তানে চাকরি করার পক্ষে অপশন দেন। তবে অধ্যাপক সোহরাওয়ার্দি ঢাকায় না এসে করাচি চলে যান এবং সেখানে পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনে নিয়োগ লাভ করেন। স্যার ড্যাশ ১০-১২ জন বাঙালি মুসলমান কর্মচারীসহ ১৯৪৭-এর আগস্ট মাসেই ঢাকায় আসেন এবং পূর্ব পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন।

পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জন্য উভয় প্রদেশের সম্মতিক্রমে ১৯৩৭ সালে লাহোরে যৌথ কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেশ বিভাগকালে পূর্ব পাঞ্জাব ভারতের অনুকূলে বরাদ্দ হলেও পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোর পাকিস্তানের ভাগে আসে। সে সময় একজন চেয়ারম্যান ও দুজন সদস্য কর্মরত ছিলেন। একইভাবে শুরুতে বোম্বে ও সিন্ধু প্রদেশের জন্য যৌথ কমিশন থাকলেও ঠিক স্বাধীনতার প্রাক্কালে সিন্ধু প্রদেশ একজন চেয়ারম্যান ও দুজন সদস্যসহ করাচিতে তাদের একক কমিশন প্রতিষ্ঠা করে।

ব্রিটিশরাজের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও তাদের প্রতিষ্ঠিত মান ও মর্যাদায় পুনরুজ্জীবন পাকিস্তান সরকারের একটা বিরাট সাফল্য ছিল। সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক নেতারা এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তারা যথাযথই অনুধাবন করেছিলেন যে রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে উপযুক্ত মান ও নৈতিকতার অধিকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর কোনো বিকল্প নেই। সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে জনবল বাছাই ও নিয়োগ একটি গতিশীল ও উন্নত প্রশাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত। তাঁরা আরও অনুধাবন করেছিলেন যে এ ধরনের কাজ নিষ্পন্ন করার জন্য এমনসব ব্যক্তিকে নিয়ে বিভিন্ন কমিশন গঠন করা প্রয়োজন, যাঁরা মেধা ও দক্ষতায় হবেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং যাঁদের সততা, নিষ্ঠা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও নিরপেক্ষতা হবে প্রশ্নাতীত। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও পূর্ব পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনে নিয়োজিত চেয়ারম্যান ও সদস্যদের জীবনবৃত্তান্ত পর্যালোচনা করলে এ রকম ধারণারই প্রমাণ পাওয়া যাবে।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সফল উপাচার্য এবং পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের যৌথ কমিশনের চেয়ারম্যান মিয়া আফজাল হোসেনকে পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রথম চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়। সদস্য হিসেবে তাঁর অপর সহকর্মীরা ছিলেন বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকে আসা অধ্যাপক শাহেদ সোহরাওয়ার্দি, পেশোয়ারের সাবেক জেলা ও দায়রা জজ খান সাহেব আবদুল গফুর খান ও সিন্ধুর মুখ্য কোর্টের সাবেক জজ চার্লস লোবো। পাকিস্তান প্রশাসনের ওপর গবেষণাকারী অধ্যাপক র‍্যালফ ব্রাইবান্তি কমিশনের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ওই কমিশন, বিশেষ করে এর চেয়ারম্যান মিয়া আফজালের অদম্য সাহস, নিষ্ঠা আর দূরদর্শিতার কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁরা পাকিস্তান কেন্দ্রীয় কমিশনকে এমন একটি মর্যাদা ও আস্থার আসনে অধিষ্ঠিত করেন যে পরবর্তী সময়ে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ওই কমিশনে উপযুক্ত মান ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছাড়া অন্য কাউকে নিয়োগের ব্যাপারে সরকারের অন্য রকম কোনো চিন্তারই সুযোগ ছিল না।

মিয়া আফজালের পর ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসের অন্যতম সদস্য ও খ্যাতিমান বাঙালি জাকির হোসেন ১৯৫২-৫৭ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োজিত ছিলেন। চেয়ারম্যান নিয়োগের আগে তিনি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ পদে নিয়োজিত ছিলেন। পরে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদও অলংকৃত করেছেন।

জাকির হোসেনের পর আইসিএস অফিসার মিয়া আমিনউদ্দিন চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত হন। চেয়ারম্যান নিয়োগের আগে তিনি গভর্নর জেনারেলের এজেন্ট ও বেলুচিস্তান প্রদেশের চিফ কমিশনার পদে কাজ করেছেন।

ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসের সদস্য লে. কর্নেল এ এস বি শাহ পরবর্তী চেয়ারম্যান নিয়োজিত হন। ১৯২৩ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে তিনি কিংস কমিশন্ড অফিসার হিসেবে তাঁর চাকরিজীবন শুরু করেন। পরে মিসরে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর তিনি কমিশনে চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসের অপর সদস্য ও প্রতিভাবান বাঙালি কাজী আনোয়ারুল হক লে. কর্নেল শাহর স্থলাভিষিক্ত হন। এই কাজে যোগদানের আগে তিনি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মুখ্য সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পরে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রীরও দায়িত্ব পালন করেন।

এরপর ১৯৬৫ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনজন আইসিএস অফিসার আগা আবদুল হামিদ (১৯৬৫-৬৬), নাজির আহমেদ (১৯৬৬-৬৯) ও আলী আসগর (১৯৬৯-৭১) পর্যায়ক্রমে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। এঁদের মধ্যে আগা আবদুল হামিদ কেন্দ্রীয় সরকারের কেবিনেট সচিব, নাজির আহমদ প্রতিরক্ষাসচিব ও আলী আসগর পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মুখ্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন।

পুনর্ব্যক্ত করা প্রয়োজন যে ১৯৪৭-৭১ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কমিশনে নিয়োজিত সব চেয়ারম্যানই ছিলেন তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। তাঁদের ভাবমূর্তি কেন্দ্রীয় কমিশনের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা সম্পর্কে জনগণের আস্থা অর্জনে যথেষ্ট সহায়ক ছিল।

শুধু চেয়ারম্যান পদেই নয়, সদস্য মনোনয়নের বিষয়েও সরকার বিবেচনাধীন প্রার্থীদের পেশাগত দক্ষতা, যোগ্যতা ও তাঁদের সার্বিক ভাবমূর্তি সম্পর্কে পর্যালোচনা করেই নিয়োগদান করেছে। এখানে কয়েকজন সদস্যের জীবনবৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে।

প্রথমেই উল্লেখ করা যায় পশ্চিম পাকিস্তানের ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন ও শিক্ষাসচিব ইউ ক্রামেটের কথা। কেন্দ্রীয় কমিশনে সদস্য নিয়োগের আগে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জুডিশিয়াল সার্ভিসের সদস্য ওয়াজিরজাদা সরদার গুল মোহাম্মদ খান কেন্দ্রীয় কমিশনে সদস্য নিয়োজিত হওয়ার আগে পশ্চিম পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের যৌথ কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শেখ আফজাল খান, নুসরত হাসান, সৈয়দ ফারুক মীর্জা, এম এস এইচ কোরেশী ও মফিজুর রহমান—তাঁরা সবাই সিএসপি ক্যাডার থেকে সদস্য হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন এবং কমিশনে যোগদানের আগে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

এ এইচ এম শামসুদ্দোহা, এ এম সাদউল্লাহ ও মালিক আতা মোহাম্মদ নুন—তাঁরা সবাই পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিসের সদস্য এবং কেন্দ্রীয় কমিশনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সদস্য নিয়োগের আগে সবাই প্রাদেশিক সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ড. এস এম হোসেন, এ এফ এম আবদুল হক, এম ফজলুর রহমান, ড. মফিজউদ্দিন আহমদ ও অধ্যাপক এম সফিউল্লাহ—তাঁদের সবাই শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং সদস্য হিসেবে নিয়োগের আগে সরকারের শিক্ষা বিভাগে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ড. এস এম হোসেন ও ড. মফিজউদ্দিন আহমদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদও অলংকৃত করেছেন।

এস এম হাসান ও শেখ মোহাম্মদ আকরাম উভয়েই পেশাগতভাবে ইঞ্জিনিয়ার। প্রথম জন পাকিস্তান ইস্টার্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার এবং পরের জন পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের প্রধান প্রকৌশলী (সেচ) পদ থেকে সদস্যপদ গ্রহণ করেন।

সামরিক বাহিনী থেকে নিয়োজিত একমাত্র সদস্য ছিলেন এয়ারভাইস মার্শাল এম এ রহমান। ১৯৭১ পর্যন্ত দুবার দেশে সামরিক শাসন জারি থাকলেও কেন্দ্রীয় কমিশনে সাবেক সামরিক কর্মকর্তাদের উপস্থিতি ছিল না বললেই চলে।

পূর্ব পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনে ১৯৪৭-৭১ সময়পরিসরে নিয়োজিত চেয়ারম্যান ও সদস্যদের পদমর্যাদা, মেধা ও যোগ্যতা কেন্দ্রীয় কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের চেয়ে কম ছিল না। এঁদের মধ্যে অনেকেই প্রাদেশিক কমিশনে কাজ করে পরে কেন্দ্রীয় কমিশনে নিয়োগের সুযোগ পেয়েছেন। পাকিস্তান সরকার সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতাকে যেকোনো কর্মকর্তার পরবর্তী নিয়োগকালে বিবেচনা করত, এ ধরনের নিয়োগ থেকে তার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিশনের প্রথম চেয়ারম্যান স্যার ড্যাশের বিষয়ে ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। আসাম সিভিল সার্ভিসের সদস্য খান বাহাদুর মোহাম্মদ মাহমুদ ১৯৫১-৫৩ পর্যন্ত চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান রেভিনিউ বোর্ড ও পাকিস্তান জুট বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন ১৯৫৩-৫৬ পর্যন্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর উপাচার্য ড. মাহমুদ হাসান ড. মোয়াজ্জেমের স্থলাভিষিক্ত হন এবং ১৯৫৬-৬১ সময়পর্ব পর্যন্ত ওই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, পাকিস্তান ইস্টার্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার ও চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান এম এ বারী ১৯৬১-৬৬ পর্যন্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ব পাকিস্তান জুডিশিয়াল সার্ভিসের সদস্য নূর মোহাম্মদ খান প্রথম সদস্য হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। পরে তাঁকে চেয়ারম্যান পদে উন্নীত করা হলে তিনি ১৯৬৬ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত ওই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

পূর্ব পাকিস্তান প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ড. এম এ রশীদ ১৯৭০ সালে চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন এবং দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন ওই পদে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রাক্কালে যে তিনজন সদস্য প্রাদেশিক কমিশনে কর্মরত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কমিশনের কাজ সম্পর্কে সবচেয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আলিমদাদ খান বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৬০ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত কমিশনের সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। পরে ১৯৬৭ থেকে দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত কমিশনের সদস্য হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। অপর সদস্য পূর্ব পাকিস্তান সিনিয়র এডুকেশন সার্ভিসের আবদুস সোবহান খান চৌধুরী চট্টগ্রাম সরকারি বাণিজ্য কলেজের অধ্যক্ষ, গণশিক্ষা বিভাগের উপপরিচালক ও যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তান দূতাবাসের শিক্ষা অ্যাটাশের দায়িত্ব পালনের পর ১৯৬৯ সালে কমিশনে যোগদান করেন। তৃতীয় সদস্য এম আনোয়ারুজ্জামান পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সড়ক ও জনপথ বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী ছিলেন। তিনিও ওই পদ থেকে ১৯৬৯ সালে সদস্য হিসেবে নিয়োজিত হন।

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো সংবিধানের বিধানসমূহ পরিপালন করে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করবে—দেশের জনগণ সেটাই প্রত্যাশা করে। দক্ষ ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান গঠনে দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রধানত দুভাবে তাঁদের অবদান রাখতে পারেন। প্রথমত, এসব প্রতিষ্ঠান যেন নির্বিঘ্নে তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে, সে জন্য সব ধরনের রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত রেখে তাদের পরিচালিত কর্মকাণ্ডে অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ; দ্বিতীয়ত, সব ধরনের লোভ-লালসা, স্বজনপ্রীতি আর দুর্নীতির ঊর্ধ্বে থেকে কোনো ধরনের অযাচিত হস্তক্ষেপ হলে তা প্রতিরোধে সক্ষম এমন মনোবল, শিক্ষা আর চারিত্রিক গুণাবলিসম্পন্ন ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে তাঁদের নিয়োগ নিশ্চিত করা। এই প্রক্রিয়ায় সাংবিধানিক পদগুলোর গুরুত্ব ও মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পদমর্যাদার ব্যক্তিদেরই শুধু বিবেচনায় আনা বাঞ্ছনীয়।

নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে তাঁদের দায়িত্ব হচ্ছে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এবং অব্যাহতভাবে তাঁদের চালচলন, আচার-আচরণ এবং কথায় ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজে এমন একটা আবহ সৃষ্টি করা, যাতে সংশ্লিষ্ট সব মহল তাঁদের সততা, নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা যেন সুষ্ঠুভাবে তাঁদের কাজ পরিচালনা করতে পারেন, সে জন্য প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো এবং লোকবল, অর্থ ও অন্যান্য সহায়ক সার্ভিস-প্রাপ্তিও নিশ্চিত করতে হবে।

পাকিস্তান আমলে, কেন্দ্র ও প্রদেশে, রাজনীতির গতি-প্রকৃতি যা-ই থাকুক না কেন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণের কোনো পরিকল্পিত উদ্যোগ দেখা যায়নি এবং রাজনৈতিক নেতারা এসব প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সত্তা ও নিরপেক্ষতার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। আর এসব প্রতিষ্ঠানকে দলীয় অধিকারে আনার কোনো ইচ্ছা তাঁদের ছিল না বলেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, বিশেষ করে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পদসমূহে, কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁরা দেশের সর্বোচ্চ মানের ব্যক্তিদের খুঁজে বের করেছেন। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কমিশন কঠোর নিরপেক্ষতা, সততা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করে এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করে গেছে। বাংলাদেশ কর্মকমিশন সম্পর্কে সাধারণভাবে এবং ১৯৯১ সালের পর থেকে বিশেষভাবে যেসব অনাচার ও দুর্নীতির রিপোর্ট প্রকাশিত হতে দেখা গেছে, পাকিস্তান আমলে এ ধরনের ঘটনা অকল্পনীয় ছিল। পিএসসির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলোর প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া কিংবা পরীক্ষায় গণহারে নকলবাজি কিংবা পিএসসির সংশ্লিষ্ট সদস্য ও স্টাফ-সহযোগে বিভিন্ন পরীক্ষার নম্বর কিংবা মেধাতালিকার মানের ক্রম পরিবর্তন—এসব অপকর্মের ফলে মেধাবী প্রার্থীদের পরিবর্তে তুলনামূলকভাবে দুর্বল প্রার্থীরা চাকরির জন্য মনোনীত হয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত হচ্ছেন। বিষয়টি আরও জটিল আকার ধারণ করেছে এ কারণে যে ক্ষমতাসীন দলের প্রশ্রয়ে দলীয় ক্যাডারের সরকারি চাকরিতে নিয়োগ নিশ্চিত করার জন্য এ ধরনের অপকর্ম সংঘটিত হচ্ছে। এসব ঘটনা কমিশনের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করে এটির প্রতি জনগণের আস্থা শূন্যের কোঠায় নিয়ে গেছে। তা ছাড়া বর্ণিত অভিযোগগুলোর কিছুটাও যদি সত্যি হয়, তাহলে তা সরকারি খাতে মানবসম্পদ উন্নয়নে বিরাট হুমকির সৃষ্টি করছে।

অবশ্য এসব দুষ্টাচার এক দিনের সৃষ্টি নয় এবং এ জন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিএসসিও এককভাবে দায়ী নয়। এসব সমস্যার মূল অনেক গভীরে প্রোথিত এবং স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকে তদানীন্তন সরকারের রাজনীতি এবং প্রশাসনের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক বিষয়ে তাদের একধরনের একচোখা দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই এসব সমস্যার শুরু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে যাঁরা দেশে থেকে কাজ করেছেন, তাঁদের এবং তাঁদের সব কাজকে দেশে প্রত্যাবর্তনকারী মুজিবনগর সরকারের রাজনীতিবিদ ও সরকারি কর্মকর্তারা সন্দেহের চোখে দেখে এসেছেন। ওই সময়ে সম্পাদিত সব কাজ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তিবিশেষকে প্রত্যাখ্যান করাটা ছিল নতুন সরকারের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া। সাধারণভাবে ব্রিটিশরাজের ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান আমলে প্রতিষ্ঠিত মেধাভিত্তিক প্রশাসনকে অনেক রাজনীতিবিদই গণরাজনীতির পথে বিরাট অন্তরায় হিসেবে বহু আগে থেকেই দেখে এসেছেন এবং এর আমূল পরিবর্তন কামনা করেছেন। স্বাধীনতাযুদ্ধ ও বাংলাদেশের অভ্যুদয় তাঁদের পছন্দমাফিক আমলাতন্ত্রকে ঢেলে সাজানোর একটা সুযোগ সৃষ্টি করে। এই প্রত্যাখ্যানের রাজনীতির ফেরে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছিল, তার সবই বাতিল ঘোষণা করা হয়। একইভাবে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক গৃহীত সিএসএস পরীক্ষা ও প্রাদেশিক কমিশন কর্তৃক গৃহীত প্রাদেশিক ক্যাডারগুলোর পরীক্ষা এবং ওই সব পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে নিয়োগকৃত সব কর্মকর্তার নিয়োগ বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়।

একটি প্রাদেশিক সরকারকে রাতারাতি জাতীয় সরকারে রূপ দিয়ে তা চালু করার জন্য বাড়তি অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রয়োজন হয়। মুজিবনগর সরকার প্রবাসী সরকার পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ থেকে ভারতে গমনকারী বেশ কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বিভিন্ন উচ্চতর পদে পদায়ন করেছিল কিংবা নতুনভাবে নিয়োগদান করেছিল। বাংলাদেশের চাকরিতে ওই সব পদে তাঁদের আত্তীকরণে জটিলতা দেখা দেয়। একইভাবে পাকিস্তানে আটকা পড়া বাঙালি কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা দেশে ফেরার পর তাঁদের আত্তীকরণেও অনেক বিলম্ব হতে থাকে। আর ১৯৭১ সালে নবনিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও তাঁদের নিয়োগ বাতিল হওয়ার ফলে বেকার হয়ে বসে থাকলেন। নতুন দেশে কাজ করার মতো যথেষ্ট মেধাবী ও প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা থাকলেও না থাকার মতোই অবস্থার জন্ম দেওয়া হলো।

মেধাভিত্তিক প্রশাসনের ওপর তদানীন্তন সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা দ্রুত বেশ কিছু সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন। সেগুলোর কিছু কিছু সম্পর্কে আরও পরে লেখার সুযোগ থাকবে। এই পর্যায়ে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের গঠনপ্রক্রিয়া ও কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু আলোচনা যথাযথ হবে। ১৯৭২ সালের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে আমি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব হিসেবে নিয়োজিত হই এবং ঘটনাচক্রে আমার অন্যান্য দায়িত্বের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর সব ক্যাডার সার্ভিসে নিয়োগ এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন-সংশ্লিষ্ট সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৭৩-এর সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষার জন্য দেশত্যাগের আগ পর্যন্ত আমি উচ্চপর্যায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগে কমিশন ও নিয়োগ বিষয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নিয়োগ-প্রক্রিয়া অবলোকন করার সুযোগ পেয়েছি।

দীর্ঘদিনের লালিত নিরপেক্ষ প্রশাসনের ধারণা থেকে সরে এসে প্রশাসনকে রাজনীতির প্রভাববলয়ে আনার প্রচেষ্টায় সরকারের কিছুটা দ্বিধার ফলে অনেক পরস্পরবিরোধিতারও সৃষ্টি হয়। প্রশাসনকে রাজনীতিকীকরণের লক্ষ্যে তারা স্থির ছিল ঠিকই, তবে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত নিয়মে এটিকে বৈধতা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাও তারা অনুভব করে। সে জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রতিষ্ঠা করা জরুরি ছিল। কিন্তু বাস্তবানুগ না হলেও একধরনের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষা শুধু সরকারের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও পদায়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল না—এটাকে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা স্বায়ত্তশাসিত ও সাংবিধানিক সংস্থাগুলোর তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হলো। বিশ্বব্যাপী কার্যরত কর্মকমিশনগুলোর আদলে পাবলিক সার্ভিস (প্রথম) কমিশনের পাশাপাশি পাবলিক সার্ভিস (দ্বিতীয়) কমিশন নামে আরেকটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হলো, যার কোনো দ্বিতীয় নজির দুনিয়ার আর কোথাও নেই। যাঁরা এই উদ্ভট ধারণার বশবর্তী হয়ে এই অকেজো প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তন করেছিলেন, তাঁরা সমগ্র বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে দেখেছিলেন বলে মনে হয় না। ১৯৭৭ সালে মেয়াদ বাড়ানোর আর কোনো উদ্যোগ না থাকায় পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য সৃষ্ট এই প্রতিষ্ঠান আপনা-আপনিই দৃশ্যপট থেকে অপসারিত হয়ে যায়।

একটি প্রাদেশিক সরকারকে জাতীয় সরকার এবং সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভূখণ্ডে সরকার পরিচালনার জন্য বিরাট জনবলের প্রয়োজন ছিল। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজ ও দ্রুত পন্থা ছিল সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মুক্তমনে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টির লক্ষ্যে যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনী কিংবা স্বাধীনতাবিরোধীদের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত হিসেবে চিহ্নিত ছিল, তাদের বাদ দিয়ে অন্যদের দ্রুত কাজে লাগানো। দেশে সক্রিয় এবং শক্তিশালী একটি কর্মকমিশন বিদ্যমান ছিল এবং এর চেয়ারম্যান ও সদস্যরা তাঁদের কাজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন। চেয়ারম্যান একজন প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ ও প্রকৌশলী। কোনো কারণে হয়তো তিনি সরকারের পছন্দের ব্যক্তি ছিলেন না—যে কারণে নতুন প্রথম কমিশন গঠনকালে তাঁর পুনর্নিয়োগ বিবেচনা করা হয়নি। তবে দেশের এই সংকটময় মুহূর্তে কমিশনের হাল ধরার জন্য একজন প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল। সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এ কিউ এম বজলুল করিমকে চেয়ারম্যান পদে নিয়োগদান করে। ড. করিম অত্যন্ত হৃদয়বান ও সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। প্রশাসন কিংবা তাঁর নিজস্ব পদমর্যাদা কিংবা দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি এতটাই নির্বিকার ও নির্বিরোধ ছিলেন যে, আইনগত কিংবা প্রথাগতভাবে তাঁর প্রাপ্য দাবিদাওয়া আদায়ের ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। তাঁর অফিস সরঞ্জাম ও লোকবল পাওয়ার জন্য তিনি কিছুদিন পরপরই আমার অফিসে এসে আমাকে বিব্রতকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দিতেন। আমি অনেকবার তাঁকে বলেছি যে আপনি সরাসরি সচিবের সঙ্গে এসব বিষয় নিয়ে আলাপ করুন। সেটাই যথাযথ এবং আপনার পদমর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সাংবিধানিক পদের অধিকারী ব্যক্তি উপসচিবের সঙ্গে তাঁর সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আলাপ করবেন, এটা শোভনীয় নয়। ড. করিমের আরেকটি অভ্যাস ছিল মুজিব কোট গায়ে চড়িয়ে অফিস করা। বেশ কিছুদিন এটা লক্ষ করার পর একদিন আমি বিনীতভাবে তাঁকে বললাম, স্যার, এই পোশাকটি সরকারি পোশাক হিসেবে পরার জন্য সরকারি কোনো নির্দেশ নেই। কর্মকমিশনের নিরপেক্ষ ভাবমূর্তির স্বার্থে এটা পরে অফিসে না যাওয়াই ভালো।

জনশ্রুতি এই যে, ড. করিম তাঁর বিভাগের একজন প্রাক্তন ছাত্র এবং প্রভাবশালী উদীয়মান নেতার সুপারিশে চেয়ারম্যান পদে মনোনীত হয়েছিলেন। এ ধরনের পদে এরকম সুপারিশ দোষণীয় কিছু নয়। তবে সুপারিশকারী ও সুপারিশকৃত উভয় ব্যক্তিরই এতটুকু বোধ থাকা উচিত যে তিনি বিবেচ্য পদের কর্তব্য ও দায়িত্ব নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে পালন করতে পারবেন কি না। তাঁর দুর্বল চিত্তের কারণে এমন কিছু বিষয়ে তিনি আইন-কানুন শিথিল করে নিয়োগের বিশেষ পদ্ধতির অনুমোদন দিলেন, যেখান থেকে প্রথম শ্রেণীর পদে নিয়োগগত মানের অবক্ষয়ের শুরু বললে অত্যুক্তি হবে না।

সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের সরকারি চাকরিতে নিয়োগের সুযোগ প্রদানের যুক্তি দেখিয়ে শুধু মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ৩৫০টি পদে নিয়োগের জন্য কমিশনের ছাড়পত্র সংগ্রহ করে। একই সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথাকথিত অমুক্তিযোদ্ধাদের চাকরিতে নিয়োগের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণেরও ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই গ্রুপের জন্য নির্ধারিত পদসংখ্যা ছিল ১৫০।

মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্য থেকে শুধু মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে চাকরিতে নিয়োগের পরিকল্পনাটি আদৌ সুবিবেচনাপ্রসূত ছিল না। সরকারি চাকরিতে নিয়োগ হয় সর্বকালেই প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে। তা ছাড়া প্রায় একই সময়ে মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তিযোদ্ধাদের একই ধরনের পদে নিয়োগের জন্য দুই ধরনের পরীক্ষা শুধু দৃষ্টিকটুই ছিল না, বৈষম্যমূলকও ছিল বটে। বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সবার জন্যই সংক্ষিপ্ত লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০ শতাংশ কোটায় তাঁদের নিয়োগ হলে বিতর্কের কোনো অবকাশই থাকত না।

মুক্তিযোদ্ধাদের মৌখিক পরীক্ষাও আইনসিদ্ধ ছিল না বলে অনেক বিতর্ক হয়েছে। এই মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব রুহুল কুদ্দুসের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। অথচ এই পরীক্ষা কমিশনে গ্রহণ করাই রীতিসিদ্ধ ছিল। মুখ্য সচিবের ওই কমিটিতে কর্মকমিশনের কোনো সদস্যও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। আমি ওই কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করেছি এবং দেখেছি যে ওই পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রার্থীর গুণাগুণ যাচাই করার বিন্দুমাত্র সুযোগ ছিল না। মনে হয়, যাঁদের নিয়োগ দেওয়া হবে, তাঁদের তালিকা আগেই প্রস্তুত ছিল; ওই কমিটির কাজ ছিল ওই তালিকাকে বৈধতা দেওয়া।

মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষ পরীক্ষার সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয় অধিকাংশ পরীক্ষার্থীর মুক্তিযোদ্ধা দাবির সত্যতা নিয়ে। চাকরিপ্রাপ্ত সবাই রাজনীতিবিদদের ঘনিষ্ঠজন, তাঁদের আত্মীয়পরিজন কিংবা রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন বলেই এঁদের ব্যাপক পরিচিতি। সেই সুবাদে মুক্তিযোদ্ধা না হয়েও এঁরা এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে নিয়োগলাভে সক্ষম হন। কেউ কেউ এমনও অভিযোগ করেছেন যে এঁদের মধ্যে শতকরা ৫০ জনও মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না। পুরো বিষয়টি সংকীর্ণ রাজনৈতিক সুবিধা নিশ্চিত করার জন্যই সাজানো হয়েছিল। তবে এই কাজটি দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে অনেক অপকৃষ্টির জন্ম দিল, যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব হবে না। আর এই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে নিয়োজিত '১৯৭৩-এর বিসিএস' কর্মকর্তারা খুব একটা সম্মানের সঙ্গে তাঁদের চাকরিকাল অতিবাহিত করতে পারেননি এবং অনেক সময় তাঁরা অহেতুক অবজ্ঞা আর বৈষম্যের শিকার হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অবশ্যই কিছু কিছু মেধাবী কর্মকর্তা ছিলেন, যাঁরা নিয়মিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেও এ ধরনের চাকরি পাওয়ার উপযুক্ত ছিলেন। ১৯৭১ সালে বিভিন্ন সার্ভিসে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সম্পর্কে সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধরন থেকে অনুমান করা বোধ হয় অন্যায় হবে না যে, প্রশাসনের স্বাধীন সত্তাকে খর্ব করে দলীয় আনুগত্যের মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁদের লক্ষ্য ছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুজিবনগর সরকারের নির্দেশ অমান্য করে যাঁরা পাকিস্তান সরকারের নিয়োগের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের নিয়োগ বাতিলের আদেশ সরকারের কঠোরভাবে অনুসরণ করা উচিত ছিল। তা না করে অনেক সময় অতিবাহিত করে তাঁদের চাকরিতে পুনর্নিয়োগ করা হয়েছিল। তবে তাঁদের ১৯৭১ সালের জ্যেষ্ঠতা না দিয়ে ১৯৭৪ সালের জ্যেষ্ঠতা প্রদান করা হলো। অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের ৩৫০ জন বিসিএসের নিচে এঁদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হলো। অথচ এঁরা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক গৃহীত সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষায় পাকিস্তানব্যাপী প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হয়ে চাকরি পেয়েছিলেন। লিখিত পরীক্ষা ছাড়া নিয়োজিত ৩৫০ জন কর্মকর্তার নিচে ১৯৭১-এর পুনর্নিয়োগকৃত প্রার্থীদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের ফলে বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান কর্মকর্তা সচিব পদে পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হলেন।

দেশের স্বাধীনতা অর্জনে মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান জাতি চিরকাল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে। তাঁদের আত্মত্যাগের প্রতিদান হিসেবে যা যা করা প্রয়োজন, জাতি তার সবই করতে সর্বদা প্রস্তুত। তবে মুক্তিযোদ্ধাদের নাম করে কোনো মহল যদি অন্যদের ন্যায্য দাবিকে ভণ্ডুল করে অন্যায়ভাবে বিভিন্ন রকম সুযোগ লাভ কিংবা ভোগদখলে ব্যাপৃত হয়, তার প্রতিবাদ করা এবং এ ধরনের অপচেষ্টা প্রতিহত করা প্রত্যেক সচেতন নাগরিকের দায়িত্ব।

যে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ওপর সম্পূর্ণ ভরসা করে আমরা পাকিস্তানব্যাপী একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, সেটি কেমন ছিল, সে সম্পর্কে একটু ধারণা দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত কমিশনের ইতিহাস এবং গতি-প্রকৃতি পর্যালোচনা করা হলো। পূর্ব পাকিস্তানি প্রার্থীদের জন্য কেন্দ্রীয় কমিশন হাজার মাইল দূরের একটি অদৃশ্য সত্তার মতো ছিল। সুদূর করাচিতে অবস্থানের ফলে আমরা এটিকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাইনি; এর কর্মকাণ্ড একটা বিশেষ সময়ে আমাদের সবাইকে স্পর্শ করে যায়। এই দূরত্বের ফলে কমিশন সম্পর্কে আমাদের মধ্যে যেমন নানা ধরনের কৌতূহল ছিল, তেমনি উদ্বেগও কম ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অত্যন্ত শৃঙ্খলার সঙ্গে ছকে বাঁধা সময় অনুযায়ী সিএসএস পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশ ছিল কেন্দ্রীয় কমিশনের একটা বিরাট সাফল্য। আধুনিক প্রযুক্তির বিস্ময়কর সব অবদান ব্যবস্থাপনার কাজে সহায়তার জন্য তখনো আবিষ্কৃত হয়নি। সনাতন পদ্ধতিতেই সব কাজ সম্পন্ন করতে হতো। তার পরও কোথাও কোনো বিচ্যুতি কিংবা বিলম্ব ঘটতে দেখা যায়নি। এর কারণ ছিল এই যে, এই নিয়োগ-প্রক্রিয়া সিএসএস পরীক্ষার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্লাসের ফাইনাল পরীক্ষার সঙ্গে যেমন সংযুক্ত ছিল, তেমনি সঠিক সময়ে ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কৃতকার্য প্রার্থীদের নিয়োগের সব আনুষ্ঠানিকতা পালন করে বিভিন্ন সার্ভিসের জন্য নির্ধারিত ট্রেনিং একাডেমির কোর্স পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী শুরু করার বাধ্যবাধকতাও ছিল।

সিএসএস পরীক্ষার আওতায় ছয়টি গুচ্ছভুক্ত বিভিন্ন সার্ভিসে নিয়োগের লক্ষ্যে প্রার্থীরা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতেন। মেধা ও প্রদেশভিত্তিক কোটা প্রতিটি গুচ্ছের জন্য পৃথকভাবে প্রয়োগ করা হতো। শুধু ষষ্ঠ গুচ্ছভুক্ত সার্ভিসগুলো দ্বিতীয় শ্রেণীর, বাকি সব প্রথম শ্রেণীভুক্ত; যদিও প্রথম গুচ্ছভুক্ত দুটি সার্ভিসের প্রারম্ভিক বেতন ও বেতন স্কেল প্রথম শ্রেণীর অন্যান্য সার্ভিসের বেতন ও স্কেলের চেয়ে সামান্য বেশি ছিল। যেসব সার্ভিসের জন্য প্রতিযোগিতা হতো, সেগুলো ছিল নিম্নরূপ :

AMARBOI.COM

প্রথম গুচ্ছ
১. সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান
২. পাকিস্তান ফরেন সার্ভিস

দ্বিতীয় গুচ্ছ
৩. পুলিশ সার্ভিস অব পাকিস্তান

তৃতীয় গুচ্ছ
৪. পাকিস্তান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিস
৫. পাকিস্তান রেলওয়ে অ্যাকাউন্টস সার্ভিস
৬. পাকিস্তান মিলিটারি অ্যাকাউন্টস সার্ভিস
৭. পাকিস্তান ট্যাক্সেশন সার্ভিস
৮. পাকিস্তান কাস্টমস ও এক্সাইজ সার্ভিস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ গুচ্ছ
৯. পাকিস্তান পোস্টাল সার্ভিস
১০. পাকিস্তান মিলিটারি ল্যান্ড অ্যান্ড ক্যান্টনমেন্ট সার্ভিস

পঞ্চম গুচ্ছ
১১. সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস
১২. অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার অব ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট

ষষ্ঠ গুচ্ছ (দ্বিতীয় শ্রেণী)
১৩. পাকিস্তান পোস্টাল সুপারিনটেনডেন্টস সার্ভিস
১৪. অ্যাসিস্ট্যান্ট ইনকাম ট্যাক্স অফিসার
১৫. এক্সিকিউটিভ অফিসার ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট

সিএসএস পরীক্ষা তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ভাগে লিখিত পরীক্ষা, তারপর মৌখিক পরীক্ষা এবং সবশেষে মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা। মোট ১৪০০ নম্বরের পরীক্ষার মধ্যে লিখিত পরীক্ষার জন্য বরাদ্দ ছিল ১১০০ নম্বর আর মৌখিক পরীক্ষার জন্য ৩০০ নম্বর। লিখিত পরীক্ষায় আবার ৫০০ নম্বর ছিল আবশ্যিক বিষয়গুলোর জন্য এবং ৬০০ নম্বর ছিল ঐচ্ছিক বিষয়গুলোর জন্য। আবশ্যিক বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল প্রবন্ধ ১০০ নম্বর, ইংরেজি ২০০ নম্বর আর সাধারণ জ্ঞান ২০০ নম্বর। ঐচ্ছিক বিষয়গুলো প্রার্থীরা বহুবিধ বিষয়ের মধ্য থেকে বাছাই করতে পারতেন। ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা, অর্থনীতি, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক—ঐচ্ছিক বিষয়গুলোর মধ্যে এগুলোই প্রার্থীদের পছন্দের তালিকার শীর্ষে ছিল। ১৪০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষার পাস নম্বর ছির ৫১৭। আর মৌখিক পরীক্ষার পাস নম্বর ৩০০-এর মধ্যে ১০০। তবে মৌখিক পরীক্ষায় কেউ ফেল করলে লিখিত পরীক্ষায় তাঁর ফল অনেক ভালো হলেও তাঁকে ফেল বলে ধরা হতো। মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার কোনো নম্বর ছিল না। তবে এই পরীক্ষায় পাস করার পর স্বাস্থ্য পরীক্ষায় টিকে গেলেই নিয়োগের প্রশ্ন বিবেচনা করা হতো।

১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যে সব লিখিত পরীক্ষা শেষ হলো। লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্যদের ১৯৬৬ সালের মার্চে মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হলো। ধানমন্ডির ৬ নম্বর রোডের একটি দোতলা বাড়িতে কেন্দ্রীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ঢাকা অফিস মূলত করাচির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য স্থাপন করা হয়েছিল। এখানেই নিচতলার হলরুমে আমাদের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমাদের পরীক্ষাকালীন কেন্দ্রীয় কমিশনের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন সাবেক আইসিএস নাজির আহমদ। তবে ঢাকার জন্য গঠিত মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডের সভাপতিত্ব করার দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল কমিশনের জ্যেষ্ঠতম সদস্য সিন্ধু প্রদেশের জমিদার ও পশ্চিম পাকিস্তান ওয়াপদার সাবেক সদস্য এ এম সিয়ালের ওপর। ওই বোর্ডের অন্য সদস্যরা ছিলেন সাবেক আইসিএস এস এম এইচ কোরায়শি, ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসের সাবেক সদস্য এ এম সাদউল্লাহ এবং পাকিস্তান ফরেন অফিসের প্রতিনিধিত্বকারী ওই দপ্তরের মহাপরিচালক খাজা মোহাম্মদ কায়সার।

লিখিত পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কমিশন কর্তৃক পাঠ্যসূচি নির্ধারিত ছিল। পরীক্ষার্থীরা প্রতিটি বিষয়ের পরিধি ও গভীরতা আন্দাজ করে প্রস্তুতির জন্য নিজেদের অনুশীলনের ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারতেন। কিন্তু মৌখিক পরীক্ষায় কী বিষয় আলোচিত হবে, তার কোনো নির্দেশনা কখনো থাকে না। আর থাকে না বলেই বিষয়টি অনিশ্চিত আর নানা কল্পকাহিনিতে আচ্ছন্ন। মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে সব বছরেই পরীক্ষার্থীদের মুখে মুখে নানা ধরনের জনশ্রুতি প্রচারিত হতে দেখা গেছে। এর মধ্যে একধরনের জনশ্রুতি অনেকেরই কিছুটা মৌন আতঙ্কের কারণ ছিল এ জন্য যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু উজ্জ্বল নক্ষত্র লিখিত পরীক্ষায় অনেক ভালো করেও বোর্ডের সামনে কেন যেন নিষ্প্রভ হয়ে ঝরে পড়েছেন। উল্লেখ্য, লিখিত পরীক্ষার নম্বর দেখে বোর্ডের সদস্যরা যেন প্রভাবিত না হন, সে জন্য তাঁদের সামনে লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের কোনো রেকর্ড পেশ করা হতো না।

অবশেষে সব আশঙ্কা-উদ্বেগের অবসান ঘটিয়ে ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসে সিএসএস পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশিত হলো। প্রতি গুচ্ছে প্রাপ্ত শূন্যপদের বিপরীতে শতকরা ২০ ভাগ পদে মেধার ভিত্তিতে এবং ৮০ ভাগ পদে আধাআধি দুই প্রদেশের প্রার্থীদের মধ্যে মেধার ক্রমানুসারে নিয়োগের বিধান ছিল। প্রথম গুচ্ছের আওতাভুক্ত সিএসপি এবং পিএফএসের অনুকূলে যথাক্রমে ৩০ ও ১২টি পদ শূন্য ঘোষণা করা হয়েছিল। সব পর্যায়ে আমার দীর্ঘদিনের সহপাঠী ও একই উপজেলার বাসিন্দা জালাল ও আমি এবং পিএফএস-এ আমার অপর বন্ধু কাজী আনোয়ারুল মাসুদ মেধা কোটায় নিয়োগ লাভ করে তিনটি উন্মুক্ত পদে আমাদের অধিকার সংরক্ষণ করলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেধায় আমরা কেউ আসতে না পারলে ওই সব পদ পশ্চিম পাকিস্তানিদের দখলে চলে যেত।

পূর্ব পাকিস্তানের অনেক জেলার তুলনায় অনগ্রসর ফরিদপুর জেলার একই উপজেলার বাসিন্দা এবং ওই জেলা শহরের স্কুল ও কলেজে শিক্ষাগ্রহণকারী আমরা দুজন সিএসএস পরীক্ষায় ভালো ফল করায় আমাদের শিক্ষকেরা এবং শহরের মুরব্বিরা খুব খুশি হলেন। রাজেন্দ্র কলেজে অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী আমাদের মঙ্গল কামনায় একটা অভ্যর্থনার আয়োজন করে। শহরের বিভিন্ন স্কুল-কলেজের অসংখ্য ছাত্র, শিক্ষক ও শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অনেক বছর পর ওই ঘটনার দিকে যখন ফিরে তাকাই, তখন মনে হয় যে রাজনীতিবিদ ও অন্যান্য সার্ভিসের কর্মকর্তারা সিএসপি অফিসারদের অনেক ধরনের সমালোচনা করলেও ওই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সংশ্লিষ্ট মহল এই সার্ভিসে নিয়োগের ঘটনাকে একজনের জীবনে একটা বিশেষ অর্জন হিসেবেই দেখেছেন।

সেপ্টেম্বর মাসে আমাদেরই এক কৃতী সিএসপি অফিসার পাকিস্তান সরকারের সংস্থাপন বিভাগের তদানীন্তন উপসচিব এম মাহবুব-উজ-জামান, যিনি পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকারের একাধিক মন্ত্রণালয়ের সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও মন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেছেন, তাঁর স্বাক্ষরিত নিয়োগপত্রটি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে আমার হাতে পৌঁছাল। অক্টোবরের ৯ তারিখের পূর্বাহ্নে লাহোর সিভিল সার্ভিস একাডেমিতে প্রশিক্ষণের জন্য ওই একাডেমির পরিচালকের কাছে রিপোর্ট করার নির্দেশ ছিল ওই পত্রে। নির্দেশমতো আমরা ১৪ জন বাঙালি সিএসপি এবং ৬ জন পিএফএস অফিসার লাহোর সিভিল সার্ভিস একাডেমিতে আমাদের নতুন চাকরিতে যোগদান করলাম। এভাবেই নিঃশব্দে আমার কর্মজীবনের একপর্যায় শেষ করে আমি সম্পূর্ণ নতুন ও অচেনা আরেক জীবনের মুখোমুখি হলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাকরিজীবনের প্রস্তুতিপর্ব : শিক্ষানবিশকাল

ভারত বিভাগের পরপরই ১৯৪৮ সালে নবনিযুক্ত সিএসপি অফিসারদের শিক্ষানবিশকালীন প্রশিক্ষণের জন্য লাহোরের মল রোডে অবস্থিত পুরোনো রেসিডেন্সি এস্টেটে সিভিল সার্ভিস একাডেমি স্থাপিত হয়। এর প্রথম পরিচালক নিযুক্ত হন সিএসপি ক্যাডারে আত্তীকৃত আইসিএস জি মঈনউদ্দীন। তবে চাকরিতে তাঁর জ্যেষ্ঠতার নিরিখে পরিচালকের পদটি অপেক্ষাকৃত নিচু মানের হওয়ায় তিনি মনঃক্ষুণ্ন ছিলেন এবং একাডেমির কার্যক্রম সংগঠনে খুব একটা তৎপর ছিলেন না। সৌভাগ্যক্রমে একাডেমিতে তাঁর অবস্থান ছিল স্বল্পকালীন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই তিনি একাডেমির ক্যাম্পাস রেসকোর্স রোডের একটি পুরোনো ভবন থেকে মল রোডের সুরম্য রেসিডেন্সি এস্টেটে স্থানান্তরের কাজটি সম্পন্ন করেন।

সিভিল সার্ভিস একাডেমি গড়ার আসল কারিগর ছিলেন ভারত ও ভারতীয় প্রশাসন সম্পর্কে অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ আইসিএস অফিসার জিওফ্রে বার্জেস। অবসর নেওয়ার পর তাঁকে পাকিস্তান সরকার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়। ভারতের মাঠপর্যায়ে এবং ভারত ও পাকিস্তানে সচিবালয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি একাডেমির জন্য একটি বাস্তবমুখী ও প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি উদ্ভাবনের কাজ হাতে নেন। তাঁর এই উদ্যোগে আরও কতিপয় আত্তীকৃত আইসিএস অফিসার সহায়তা করেন। প্রতি ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষে নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং মাঠপর্যায়ের তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তা ও শিক্ষানবিশ অফিসারদের কাছ থেকে পাওয়া মতামত পর্যালোচনা করে কর্মসূচিতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করা হতো। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত একাডেমির পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত সময়ের মধ্যে বার্জেস এমন একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্মসূচি তাঁর উত্তরসূরিদের জন্য রেখে যান, যেটি ১৯৭০ সাল পর্যন্ত কোনো ব্যাপক পরিবর্তন ছাড়াই অনুসরণ করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যসূচি প্রণয়নকালে বার্জেস টিম মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থার অসংগতি ও দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে এবং ওই সব বাধা উত্তরণের জন্য বেশ কিছু কলাকৌশলেরও উদ্ভাবন করে। প্রথমেই বিবেচনায় আসে কর্মজীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্ন। আমরা সবাই জানি যে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের জন্য আয়োজিত বিশেষায়িত পাঠক্রম ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদ, বিশেষ করে কলা অনুষদের পাঠক্রম নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের কাজ শুরু করার জন্য আদৌ যথেষ্ট নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা একজন শিক্ষার্থীকে তাঁর জীবন, জগৎ ও পরিপার্শ্ব সম্পর্কে সচেতন করে: কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোনো কাজের কোনো কলাকৌশল শেখায় না। উন্নয়নশীল দেশে প্রশাসনের কাজ অত্যন্ত জটিল এবং নানা সমস্যায় জর্জরিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞানের পরিপূরক হিসেবে তাই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রায়োগিক জ্ঞান ও কলাকৌশল রপ্ত করা অপরিহার্য।

প্রশাসনের কাজ সফলতার সঙ্গে সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন দপ্তর ও মাঠপর্যায়ের বাস্তব অবস্থা অনুধাবন করে দেশের জনগণ প্রতিনিয়ত যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন, সেগুলোর তত্ত্বতালাশ যেমন জরুরি, তেমনি প্রশাসনিক কর্মকর্তারা এগুলো সমাধানের জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং সামগ্রিক প্রশাসন-প্রক্রিয়াটি কী, তা-ও সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করা এই প্রায়োগিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

আর এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সবচেয়ে কঠিন কাজটি হলো উন্মুক্ত বিহঙ্গের মতো বিচরণকারী এক ঝাঁক নবীন কর্মকর্তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থেকে প্রজাতন্ত্রের দায়িত্ববান অফিসার হিসেবে রূপান্তরের জন্য তাঁদের সর্বতোভাবে প্রস্তুত করা। আমাদের ব্যাচের প্রশিক্ষণের জন্য যে রূপরেখা অনুমোদন করা হয়, তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল এ রকম:

ক) শিক্ষানবিশকালের ব্যাপ্তি হবে দুই বছর। প্রথম বছর লাহোর সিভিল সার্ভিস একাডেমিতে এবং পরের বছর অফিসারদের নিজ প্রদেশের কোনো জেলায় নবিশি করতে হবে;

খ) শিক্ষানবিশকালে নির্ধারিত সব পরীক্ষায় কৃতকার্য না হলে কাউকে নিয়মিত পোস্টিং দেওয়া হবে না। তাঁকে অকৃতকার্য বিষয়ে আবার পরীক্ষা দিয়ে পাস করতে হবে;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ) শিক্ষানবিশ অফিসারদের মাঠপর্যায়ে ও সচিবালয়ে কার্য সম্পাদনের জন্য যেসব আইন, বিধিবিধান, সরকারি নির্দেশ ইত্যাদি প্রতিনিয়ত পর্যালোচনা করতে হয়, সেসব বিষয়ের ওপর একাডেমিতে নিয়মিত ক্লাসের ব্যবস্থা থাকবে;

ঘ) আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, ভূমি ব্যবস্থাপনা ও রাজস্ব আদায় নিয়ে ব্রিটিশ প্রশাসনের যে বৃত্ত রচিত হয়েছিল, স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিকদের উন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে তা বহু ধারায় সম্প্রসারিত হয়ে একটা গতিময় উন্নয়ন প্রশাসনের সৃষ্টি করেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য অর্থনীতি ও উন্নয়ন প্রশাসন সম্পর্কেও শিক্ষানবিশ কর্মকর্তাদের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান দানের জন্য একাডেমির প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হবে;

ঙ) নবনিযুক্ত অফিসারদের অনেকেই এত দিন তাঁদের পরিবারের অভিভাবকদের আশ্রয়ে সংসারের কোনো দায়িত্বভার গ্রহণ না করে দিন যাপন করেছেন। প্রশিক্ষণ শেষে চাকরির শুরুতেই তাঁদের বিরাট এক জনগোষ্ঠীর ভালোমন্দের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এই কঠিন দায়িত্ব কী এবং কীভাবে তা পালনের চেষ্টা করা যেতে পারে, সে জন্য তাঁদের শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে। পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উদার পরিবেশে মুক্ত ও বাঁধনহারা জীবনে অভ্যস্ত নবীন কর্মকর্তাদের একটা শৃঙ্খলাময় কিন্তু তৃপ্তিদায়ক কর্মজীবনের প্রতি আগ্রহ ও অনুরাগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি দিনক্ষণ নির্ধারিত রুটিন প্রবর্তন করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রশিক্ষণের এই কর্মসূচিটি এমনভাবে বিন্যস্ত হবে যে শিক্ষানবিশ অফিসাররা একটা সহজাত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাঁদের কর্মজীবনের উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণাপ্রাপ্ত হবেন। কর্মজীবনে তাঁদের মিশন কী—একাডেমি ত্যাগের আগে এ সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা নিয়েই তাঁরা বিদায় হবেন;

চ) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কার্যরত দপ্তর ও চালু উন্নয়ন প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং তা একাডেমি ও জেলায় সমান গুরুত্বের সঙ্গে বাস্তবায়ন করা হবে;

ছ) শিক্ষানবিশ কর্মকর্তাদের সক্ষমতা সর্বাত্মক বৃদ্ধির লক্ষ্যে একাডেমি টাইপ রাইটিং, ড্রাইভিং, রাইডিং, বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা এবং নিয়মিত পিটির ব্যবস্থা করবে;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ) জেলা পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপের প্রশিক্ষণে হাতে-কলমে শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হবে। জেলা প্রশাসকের দপ্তরের প্রতিটি শাখার ভারপ্রাপ্ত প্রধান করণিকের সঙ্গে বসে প্রতিটি শাখার নির্ধারিত কাজ সম্পাদন পদ্ধতি ও বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষানবিশ অফিসারকে সম্যক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। বিচারিক কাজ পরিচালনার খুঁটিনাটি আয়ত্ত করার জন্য একজন শিক্ষানবিশকে জেলার কার্যরত একজন জজের অধীনে ছয়টি ফৌজদারি মামলার কেস রেকর্ড তৈরি করে সেগুলোর যথার্থতা পরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য জেলা ও দায়রা জজের কাছে তা পেশ করতে হবে। আর প্রাত্যহিক রুটিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হবে জেলা প্রশাসকের দপ্তরে বসে তাঁর কর্মপদ্ধতি ও জনগণের সঙ্গে তাঁর আচার-আচরণ পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ;

ঝ) জেলায় শিক্ষানবিশকালে তিন মাস ও এক মাসব্যাপী আরও দুটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। এর একটি ভূমি জরিপ ও বন্দোবস্তসংক্রান্ত এবং অপরটি সেনাবাহিনীর শীতকালীন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ;

ঞ) এ ছাড়া জেলায় শিক্ষানবিশকালেই একজন কর্মকর্তাকে সব বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ করে তাতে কৃতকার্য হতে হবে, অন্যথায় তাঁকে নিয়মিত পোস্টিংয়ের জন্য বিবেচনা করা হবে না।

প্রশিক্ষণের কোনো কর্মসূচিকেই অবজ্ঞা করা কিংবা ফাঁকি দেওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। অফিসারদের চূড়ান্ত জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণকালে পিএসসি কর্তৃক গৃহীত উন্মুক্ত পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে ফাইনাল পাসিং আউট পরীক্ষার ফলাফল একটি নির্দিষ্ট হারে যোগ করার বিধান করা হয়েছিল।

একাডেমির প্রশাসন ও কর্মসূচি পরিচালনায় পরিচালককে সহায়তা করার জন্য চারজন উপপরিচালক নিয়োজিত ছিলেন। পরিচালকের পদটি বেশ কিছু আগে কেন্দ্রীয় সরকারের সচিব পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছিল। আমাদের সময় সিএসপিতে আত্তীকৃত আইসিএস আবদুল মজিদ পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। চারজন উপপরিচালকের মধ্যে তিনজন ছিলেন উপসচিব পদমর্যাদার সিএসপি অফিসার এবং অপরজন পাকিস্তান ফরেন সার্ভিস ক্যাডারের কর্মকর্তা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিচালক। ১৯৬৩ সাল থেকে পাকিস্তান ফরেন সার্ভিস ক্যাডারের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণও সিভিল সার্ভিস একাডেমিতে স্থানান্তর করা হয়। এর আগে এরা যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন শহরের ফ্লেচার স্কুল অব ডিপ্লোম্যাসিতে এক বছর মেয়াদি এক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একাডেমির প্রশিক্ষণ তিনটি টার্মে বিভক্ত ছিল। প্রতি টার্মে মেধা তালিকায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী পর্যায়ক্রমে মেস কমিটির প্রেসিডেন্ট মনোনীত হতেন। প্রতি সপ্তাহে একটি করে মেস নাইট ও মাসে এক বা একাধিক গেস্ট নাইটের আয়োজন করা হতো। এসব অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন সস্ত্রীক মন্ত্রী, সচিব, রাষ্ট্রদূত কিংবা সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা। এসব অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যই ছিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারি অনুষ্ঠানে অনুসৃত শিষ্টাচার পর্যবেক্ষণ করে এ ধরনের আচরণে অভ্যস্ত হওয়া। বলা প্রয়োজন যে এসব অনুষ্ঠানে কোন অফিসার কীভাবে পুরো সময়টা পার করেন, তাঁর ওপর পরিচালক ও তাঁর সহকারীরা তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরে আমাদের ফিডব্যাক দিতেন।

উন্নয়ন অর্থনীতি, লোকপ্রশাসন আর রাজস্ব আইনগুলোর ওপর আমাদের উপপরিচালক নিজেরাই ক্লাস নিতেন। তাঁদের মধ্যে ড. তারিক সিদ্দিকী আবার লোকপ্রশাসনে যুক্তরাষ্ট্রের সিরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমপিএ এবং পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। পরে তিনি ইসলামাবাদ কায়েদে আজম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও নিযুক্ত হয়েছিলেন। তবে সিভিল ও ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড, এভিডেন্স অ্যাক্ট আর ইসলামিয়াত পড়ার জন্য বাইরে থেকে খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে আমার যে দুজনের কথা এখনো খুব মনে আছে, তাঁদের একজন হলেন লাহোর বারের প্রখ্যাত আইনজীবী ব্যারিস্টার দাউদ ইলিয়াস আর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের শিক্ষক ইমতিয়াজ আহমদ। তাঁরা উভয়েই তখনকার দিনে নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথেষ্ট খ্যাতিমান ছিলেন।

নিয়মিত ক্লাসের পরিপূরক হিসেবে আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষানবিশ অফিসারদের সামনে তুলে ধরার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ কিংবা করপোরেশনের প্রধানদের অতিথি বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ করা হতো। প্রকাশ্যে বলা সমীচীন নয় এমন অনেক বিষয় ও তথ্য তাঁরা বক্তৃতাকালে আমাদের জানাতেন। এসব পদস্থ কর্মকর্তার সান্নিধ্যে এসে আমরা প্রশাসনের সার্বিক বিষয় সম্পর্কে যেমন অনেক কিছু জানতে পেরেছি, তেমনি জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে সংযোগের শঙ্কা ও জড়তা অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছি।

একাডেমির সার্বিক পরিস্থিতি ছিল খুবই আনন্দময় কিন্তু গতিশীল। প্রশিক্ষণের রুটিন দেখলে এটিকে গতানুগতিক মনে হবে; তবে প্রায়ই আমরা কোনো-না-কোনো নতুন বিষয়ের সম্মুখীন হতাম, যেগুলো তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের নিষ্পত্তি করতে হতো। লাহোরের আবহাওয়া কিছুটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চরমভাবাপন্ন—গরমকালে প্রচণ্ড গরম আর শীতকালে তীব্র শীত। সপ্তাহের পাঁচ দিন ফজরের নামাজের পরই শীত-গ্রীষ্মনির্বিশেষে সঠিক সময়ে রাইডিংয়ের জন্য মাঠে হাজির হওয়া এবং ন্যূনপক্ষে আধঘণ্টা ঘোড়া চালানোর কসরত অনেক বঙ্গসন্তানের জন্যই কঠিন ছিল। অনুপস্থিত থাকার কোনো উপায় ছিল না—উপপরিচালকের (প্রশাসন) কাছ থেকে কারণ দর্শানোর ছোট্ট স্লিপটি ক্লাসরুমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই ডেস্কে দেখতে পাওয়া যেত। আমাদের উপপরিচালক (প্রশাসন) শোয়েব সুলতান খান ছিলেন একাডেমিতে নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষার মূর্তিমান প্রতীক। কাকডাকা ভোরে প্রায়ই দেখতাম ঘোড়ার পিঠে চড়ে তিনি আমাদের রাইডিং প্রশিক্ষণের অনুশীলন পর্যবেক্ষণ করছেন। শুধু রাইডিংয়ে নয়, দিবারাত্রির সব প্রোগ্রামে তাঁর নিঃশব্দ ও সতর্ক গোয়েন্দাগিরি আমাদের তটস্থ করে রেখেছে। তাঁর এই নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতা দেখে আমার মনে হতো, একাডেমির উপপরিচালক (প্রশাসন) পদে নিয়োগের জন্য তাঁর চেয়ে ভালো বোধ হয় আর কাউকে সিভিল সার্ভিসে পাওয়া যাবে না। শোয়েব সুলতান খান পরবর্তী সময়ে আগা খান ফাউন্ডেশনের অধীনে পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশে পল্লি উন্নয়নের কাজ করে ম্যাগসাইসাই পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেন।

তিন টার্মে নির্ধারিত চারটি শিক্ষাসফর আমাদের অনেকের জন্যই প্রথমবারের মতো পাকিস্তানের অর্থনীতি ও উন্নয়ন প্রশাসনের গতি-প্রকৃতি জানার সুযোগ এনে দেয়। প্রথম সফরটির উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের লায়ালপুরের কৃষি কলেজের কৃষি উন্নয়নের জন্য গৃহীত বিভিন্ন গবেষণা ও সম্প্রসারণমূলক কাজের পর্যবেক্ষণ। ১৯৬০-এর দশকে লায়ালপুর থেকেই কৃষিতে 'সবুজ বিপ্লব' (green revolution)-এর সূচনা হয়েছিল। এই বিপ্লবের সূতিকাগারে আমাদের সফর সত্যিকার অর্থে যথার্থ ছিল। দ্বিতীয় সফরটি ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ঘিরে। এখানে শিক্ষণীয় বিষয় ছিল পাকিস্তানের নিয়মিত প্রশাসনের বাইরে বিভিন্ন উপজাতীয়দের জন্য অনুসৃত প্রশাসনব্যবস্থা অবলোকন। নিয়মিত জেলার সমতুল্য এ অঞ্চলগুলোকে এজেন্সি বলা হতো : এসব এজেন্সির প্রশাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন একজন পলিটিক্যাল এজেন্ট। ডিসির সমতুল্য পদমর্যাদার সিএসপি অফিসারদের মধ্য থেকে বাছাই করে এদের নিয়োগ দেওয়া হতো। উপজাতীয়দের প্রশাসন অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও সাহসিকতার কাজ ছিল। ১৯৬০ সাল থেকে এসব পদে নিয়োগের জন্য সেনাবাহিনী থেকে উপযুক্ত কর্মকর্তাদের সিএসপিতে আত্তীকরণের বিধান করা হয়। তৃতীয় সফরটি ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূলত সিন্ধু প্রদেশের অর্থনীতি ও প্রশাসন সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক ধারণা গ্রহণের জন্য। তবে এর সঙ্গে পাঞ্জাবের মুলতান ও বাহওয়ালপুর হয়ে এই সফরটি করাচি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

দ্বিতীয় টার্মে আরেকটি স্মরণীয় সফর ছিল কুমিল্লা একাডেমি পরিদর্শন। ১০ দিন কুমিল্লায় অবস্থানকালে এই প্রথমবারের মতো আমরা সবাই কুমিল্লা কোতোয়ালি থানার বিভিন্ন ইউনিয়নে একাডেমি কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করে প্রত্যেকে একটি করে রিপোর্ট তৈরি করে একাডেমিতে পেশ করি। একাডেমির পরিচালক স্বনামধন্য আখতার হামিদ খান পুরোটা সময় আমাদের কাজে উৎসাহ জুগিয়েছেন এবং আমাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। সারা পশ্চিম পাকিস্তান ঘুরে আমরা এই ধরনের কোনো উদ্যোগ দেখতে পাইনি। কুমিল্লা একাডেমি সত্যি আমাদের গর্ব করার মতো একটি প্রতিষ্ঠান।

লাহোর একাডেমিতে আমাদের প্রশিক্ষণের সর্বশেষ আইটেম পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলায় এক মাসের সংযুক্তি। তার পরই আমাদের ফাইনাল পাসিং আউট পরীক্ষা এবং যার যার নিজ প্রদেশে ফিরে গিয়ে কোনো জেলায় এক বছর মেয়াদে প্রশিক্ষণের জন্য কাজে যোগদান। পশ্চিম পাকিস্তানে জেলা সংযুক্তির জন্য অন্য তিনজন বাঙালির সঙ্গে আমার পোস্টিং হয় বেলুচিস্তানের কোয়েটা জেলায়। তখন গ্রীষ্মকাল। কোয়েটা অবস্থানের জন্য এর চেয়ে আর ভালো সময় হয় না। ওই সময় কোয়েটায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ক্যাপ্টেন জামশেদ বারকি, যিনি তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে সিএসপি ক্যাডারে আত্তীকৃত। ক্যাপ্টেন বারকির বাবা জেনারেল ওয়াজেদ আলী বারকি আইয়ুব খানের মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। তাঁর অপর ভাই জাভেদ বারকিও একাধারে সিএসপি ও পাকিস্তান ক্রিকেট টিমের স্বনামধন্য ক্রিকেটার ছিলেন। তাঁদের আরেক চাচাতো ভাই শাহেদ জাভেদ বারকিও সিএসপি অফিসার ছিলেন এবং পরে ডেপুটেশনে বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হন।

আমরা চার বাঙালি অফিসার একসঙ্গে কোয়েটায় ক্যাপ্টেন জামশেদ বারকির দপ্তরে রিপোর্ট করলাম। বুদ্ধিদীপ্ত, গম্ভীর কিন্তু সদালাপী বারকির সঙ্গে খুব সহজেই আমাদের একটা সুন্দর সম্পর্ক স্থাপিত হলো। তাঁর সরাসরি হস্তক্ষেপে কোয়েটার মিউনিসিপ্যাল রেস্ট-হাউসে সাশ্রয়ী ভাড়ায় আমাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা হলো। আমাদের এক ব্যাচ সিনিয়র সৈয়দ রওশন জামির তখন কোয়েটার সহকারী কমিশনার। মূলত আমরা চারজনই তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওপর চড়াও হয়ে আমাদের কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর কাছ থেকে ছোটখাটো প্রয়োজন মিটিয়ে নিতাম।

কোয়েটা বিভাগীয় শহরও বটে। সেখানে অপর সিএসপি অফিসার আফজাল আগা তখন কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত। প্রথামতো তাঁর সঙ্গে আমাদের সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে হয়। ক্যাপ্টেন বারকিই আমাদের সাক্ষাৎকারের আয়োজন করে দিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতার একপর্যায়ে তিনি হঠাৎ বলে বসলেন যে আমরা পুরো সময়টা কোয়েটাতে না কাটিয়ে কিছু সময় কাবুলে বেড়িয়ে আসি না কেন? শোয়েব সুলতান খানের কঠোর শৃঙ্খলার বৃত্তে অভ্যস্ত আমরা হঠাৎ এ ধরনের বিচ্যুতি শুনে ক্ষণিক স্তম্ভিত হয়ে রইলাম। তিনি আমাদের চুপ থাকতে দেখে নিজেই বললেন, তোমাদের যদি পয়সাকড়ির অসুবিধা থেকে থাকে আমার সহকারী ব্যাংককে ফোন করে তোমাদের চাহিদামতো ওভারড্রাফট দেওয়ার জন্য বলে দেবে। তোমরা যারা যেতে চাও, তার সঙ্গে যোগাযোগ করো। আমি ওকে সব বলে দিচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ইন্টারকমে তাঁর সহকারীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন।

কোয়েটায় সংযুক্তি শেষে লাহোরে ফিরেই আমাদের ফাইনাল পাসিং আউট পরীক্ষা। নিজেদের জ্যেষ্ঠতা বজায় রাখার জন্য পরীক্ষায় অবশ্যই ভালো করতে হবে। তবে আফগানিস্তানে ভ্রমণের এমন একটা সুযোগ আবার কবে আসবে কিংবা আদৌ আসবে কি না, এ নিয়ে আমরা দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়লাম। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর আমি ও আমার বন্ধু রফিউল করিম কমিশনারের এই অপ্রত্যাশিত সমধুর আমন্ত্রণটি গ্রহণ করে আফগানিস্তান যাওয়ার সব বন্দোবস্ত পাকা করে ফেললাম।

আফগানিস্তান দেশটি সব সময়ই আমার জন্য গভীর আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসার বিষয়। ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে ভারতের ইতিহাসের সব যুগেই বিভিন্ন সূত্রে আফগানিস্তানের উল্লেখ দেখতে পেয়েছি। তা ছাড়া বাংলা সাহিত্যের কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও বিভিন্ন লেখায় আফগানিস্তানের ভূপ্রকৃতি, পাহাড়, পর্বত, নদী এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী উপজাতি পশতুনদের বীরত্ব, চারিত্রিক দৃঢ়তা, সততা ও বন্ধুবাৎসল্য অনেক কিংবদন্তির জন্ম দিয়েছে। কবিগুরুর অমর ছোটগল্প 'কাবুলিওয়ালা'তে সকল পিতার অন্তরে সংগোপনে লালিত সন্তানের প্রতি অপত্যস্নেহ ও মঙ্গলকামনার পরিচিত চিত্রটি উন্মোচিত হয়েছে। বাহ্যিক আবরণে রুক্ষ ও কঠোর একজন পাঠানের হৃদয়ও যে কোমল ও সহজাত মানবিক অনুভূতিতে উদ্বেল, এই আলেখ্য সবাইকে এই অমোঘ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। একইভাবে বিদ্রোহী কবির বহু কবিতা ও অন্যান্য লেখায় আফগানিস্তানের মানুষ আর নিসর্গের বর্ণনা ওই দেশ সম্পর্কে এক কল্পলোকের সৃষ্টি করে। আর আফগানিস্তানের ওপর সৈয়দ মুজতবা আলীর বইটি পাঠ করলে মনে হবে যেন আমরা লেখকের সঙ্গে সঙ্গে চিরচেনা এক লোকালয়ের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

সাহিত্যে আফগানিস্তান সম্পর্কে সৃষ্ট রোমান্টিকতা বিগত দুই শত বছরে বহুবার পরাক্রমশালী ব্রিটিশ রাজসহ অন্যান্য পরাশক্তির আগ্রাসন প্রতিহত করার সূত্র থেকে উৎসারিত—যেখানে আফগান জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে পশতুনদের বিক্রম ও সাহসিকতা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু এর আগের ও পরের ইতিহাস গোষ্ঠীগত যুদ্ধ, ধ্বংসযজ্ঞ আর বর্বরতার নির্মম ইতিহাস। মধ্য, পশ্চিম ও দক্ষিণ এশিয়ার সংযোগস্থলে আফগানিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থান যেমন এর ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে, তেমনি আফগানিস্তানও ভারতের ইতিহাসের বহুবিধ ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। যুগ যুগ ধরে একের পর এক অভিবাসনকারী কিংবা অভিযানকারী এই অঞ্চল পার হয়ে ইরান, মধ্য এশিয়া ও ভারতে যেমন শক্তিশালী সাম্রাজ্য ও জনপদ ধ্বংস করেছে, তেমনি নতুন নতুন সাম্রাজ্য ও জনপদের গোড়াপত্তনও করেছে। গজনির সুলতান মাহমুদ ভারতের সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য ১৭ বার ভারতে অভিযান চালিয়েছেন। একইভাবে তাঁর উত্তরসূরি পারস্য থেকে আসা নাদির শাহ আফগানিস্তানে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে সম্রাট শাহজাহানের অতি শখের ময়ূরসিংহাসন ও কোহিনূর হীরকখণ্ড ভারত থেকে পারস্যে নিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত ময়ূরসিংহাসনের কী হয়েছে, তার কোনো সঠিক বৃত্তান্ত নেই। তবে এটির অনুকরণে পারস্যে একটি ময়ূরসিংহাসন তৈরি করে পারস্যের শাহরা তা ব্যবহার করেছেন। বিগত শতাব্দীতে বিপ্লবের মাধ্যমে সিংহাসনচ্যুত রেজা শাহ পাহলভি ময়ূরসিংহাসনের সর্বশেষ অধিকারী ছিলেন। আর কোহিনূর হীরকখণ্ডটি অনেক হাত ঘুরে এখন ইংল্যান্ডের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের রাজমুকুটে শোভা পাচ্ছে।

লুণ্ঠন ও ধ্বংসের এসব ইতিহাসের পাশাপাশি আফগানিস্তান থেকে ভারতে অভিযানকারীদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি তাদের আগ্রহ, বিদ্যোৎসাহিতা ও উদারপন্থী দৃষ্টিভঙ্গির অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় ফেরদৌসি, আলবিরুনি ও খুশহাল খান খটকের মতো সাংস্কৃতিক ব্যক্তিরা তাঁদের অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। স্বাধীনচেতা বিভিন্ন উপজাতিকে একত্র করে ১৭৪৭ সালে আহমদ শাহ দুররানি একটি আফগান জাতীয় সত্তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিষ্ঠায় সফল হন এবং দেশে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন, যা ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত বহাল ছিল। আফগানিস্তানের সামাজিক সংগঠনে ও ধর্মীয় আচরণে বহু যুগ ধরে সঞ্চারিত যে ধরনের কট্টর রক্ষণশীলতা তাদের অনগ্রসরতার কারণ, তা দূরীভূত করার জন্য বেশ কয়েকজন বাদশাহ সুদূরপ্রসারী সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু গোঁড়া ধর্মীয় নেতাদের তীব্র বিরোধিতার মুখে তাঁদের হয় খুন কিংবা গদিচ্যুত করা হয়। আফগানিস্তানের সর্বশেষ বাদশাহ জহির শাহ ১৯৩৩ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৪০ বছর আফগানিস্তানের শাসনভার পরিচালনা করেন। কিন্তু তাঁর সংস্কারপন্থী কর্মসূচির কারণে এক রক্তবিহীন অভ্যুত্থানে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ইতালি পালিয়ে যান। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আফগানিস্তানে রাজতন্ত্রেরও অবসান ঘটে।

আফগানিস্তান সফরে আমাদের গন্তব্য ছিল কাবুল। তখনকার দিনে কোয়েটা থেকে কাবুল যাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল সড়কপথ, কোনো বিমান যোগাযোগ ছিল না। কোয়েটা থেকে পিসিন হয়ে আমরা পাকিস্তানের সীমান্ত শহর চমনে পৌঁছাই। সেখানে প্রথমে কান্দাহার, পরে গজনি হয়ে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে আমরা কাবুল পৌঁছাই। আমাদের দেখা তিনটি শহরই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের রাজধানী শহর ছিল। সেই সুবাদে প্রতিটি শহরই ইতিহাসসমৃদ্ধ এবং অনেক কীর্তিতে মহীয়ান। বর্তমানের আফগানিস্তান যে ধরনের সহিংসতা ও নৃশংসতার শিকার, জহির শাহর আমলে আমাদের সফরকালে সে রকম কোনো ঘটনা সংঘটিত হতে শোনা যায়নি। সেদিনের আফগানিস্তান অবশ্যই ছিল প্রচণ্ডভাবে রক্ষণশীল, রাস্তায় বোরকাবিহীন মহিলা আমাদের নজরে আসেনি; কিন্তু দেশটিতে ছিল অনাবিল শান্তি, বাদশাহর সুপ্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্ব, সামাজিক শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা। আমরা নির্ভয়ে ও স্বচ্ছন্দে আমাদের যেখানে খুশি ঘুরে বেড়িয়েছি, যা এখন আফগানিস্তানে মোতায়েন কোনো বিদেশি সেনাসদস্যও করতে সাহসী হবে না। এ ধরনের একটি সুন্দর ও উঠতি জনপদ আজ পরাশক্তিদের নোংরা স্নায়ুযুদ্ধের কবলে পড়ে বিপন্ন। যারা দেশটিতে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, কেবল তারাই এটিকে এর আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে পারে।

কোয়েটায় সংযুক্তি শেষে আমরা সবাই একাডেমিতে ফিরে যাই এবং যথারীতি পাসিং আউট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি। তবে এরই এক ফাঁকে আমরা শুনতে পেলাম, আমাদের কাবুলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার কারণে কমিশনারকে কেন্দ্রীয় সরকারের শক্ত কথা শুনতে হয়েছে। আসলে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বিদেশ যাওয়ার অনুমতি প্রদানের ক্ষমতা সংস্থাপন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভাগের, কমিশনার তা পারেন না। তবে পদ্ধতিগতভাবে শুদ্ধ না হলেও এই সফরে যে আমরা অনেক লাভবান হয়েছি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বরে লাহোর একাডেমির বছরব্যাপী প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হলো। লাহোরে বসেই আমরা পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের পরবর্তী পর্যায়ের ট্রেনিংয়ে কার কোথায় পোস্টিং, জানতে পারলাম। আমাকে সিলেটে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। সেখানে কাজে যোগদান করার প্রাক্কালে প্রথমে নিজ বাড়িতে কিছু সময় কাটিয়ে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে সিলেটের পথে পাড়ি জমালাম।

হজরত শাহজালাল (রহ.)-এর আশীর্বাদপুষ্ট সিলেটের পুণ্যভূমিতে আমার দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণের জন্য ১৯৬৭ সালের অক্টোবরে রেলপথে সিলেট পৌঁছালাম। আমি তখন সদ্যবিবাহিত; সস্ত্রীক সিলেটে এসেছি। স্টেশনে সিলেটের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এবং সিএসপিতে আমার অগ্রজ সৈয়দ আহমদ আমাদের তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন। সেখানে কুশলাদি বিনিময়ের পর তিনি জানালেন যে সিলেটে সরকারি আবাসনের তীব্র সংকট। তাই আপাতত আমাকে সার্কিট হাউসে রুম বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। তবে তিনি এ-ও জানালেন যে সিলেটে সব সময়ই সফরকারী পদস্থ ব্যক্তিদের চাহিদার চাপ থাকে। তাই কখনো কখনো সার্কিট হাউস ছেড়ে অন্য কোনো রেস্ট-হাউসে যেতে হতে পারে।

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত আসামের নিচে সিলেটের অবস্থান। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অঞ্চলগুলোর মধ্যে এখানেই বৃষ্টিপাতের মাত্রা সর্বাধিক। ব্রিটিশ আমলের সব সরকারি সংস্থা এবং অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের বাড়িঘরও দোতলা টিনের চালের নিচে হালকা কাঠ কিংবা কাঠের বিকল্প প্লাইউডের দেয়ালের ওপর বাংলো প্যাটার্নে নির্মিত। ইট-সুরকির দালানের পরিবর্তে দোতলা টিনের বাংলোই এখানকার আবহাওয়া মোকাবিলার জন্য অধিকতর উপযোগী বিবেচনা করেই সমগ্র সিলেট জেলায় এ ধরনের বাড়িঘরের প্রাধান্য দেখতে পেয়েছি। তবে ইদানীং সিলেট তার পুরোনো ঐতিহ্য বিসর্জন দিয়ে বহুতল ভবন নির্মাণের দিকে ঝুঁকে পড়েছে এবং এই প্রক্রিয়াতে পুরোনো দৃষ্টিনন্দন অনেক বাংলো-টাইপ বাড়ি ভেঙে বহুতল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। সিলেটে সার্কিট হাউসের জন্য নতুন দুটি ইমারত তৈরি করা হয়েছে, তবে সৌভাগ্যক্রমে পুরোনো বাংলোটাইপ সার্কিট হাউসটি অক্ষত রেখে একে আরও উন্নত করে এর সৌন্দর্য অনেক বাড়ানো হয়েছে।

পরদিন আনুষ্ঠানিকভাবে জেলা প্রশাসকের দপ্তরে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। আমাদেরই জ্যেষ্ঠ সহকর্মী শামসুল হক চিশতি তখন সিলেটের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডিসি। তিনি আমাকে সানন্দে অভ্যর্থনা জানিয়ে আমার জন্য নির্ধারিত আগামী এক মাসের একটি প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম আমার হাতে তুলে দিলেন। এটি ছিল মূলত তিনজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের (এডিসি) কাছ থেকে রাজস্ব প্রশাসন, সাধারণ প্রশাসন ও উন্নয়ন প্রশাসন সম্পর্কে ব্রিফিং গ্রহণ এবং তাদের সঙ্গে সরেজমিনে মাঠপর্যায়ে সফর ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিদর্শন। তিনজন এডিসির সঙ্গেই আমার কথা ছিল যে তাঁরা যখন মাঠ সফরে যাবেন, আমাকে খবর দিলে আমি তাঁদের সফরসঙ্গী হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করব। এ রকম একটা সমঝোতার ফলে আমি সিলেটের চারটি মহকুমারই অনেক অঞ্চল ঘুরে দেখার সুযোগ পাই। এই কর্মসূচির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল ডিসি অফিসের প্রতিটি সেকশনে করণিকদের সঙ্গে এক টেবিলে তাঁদের কাজকর্ম পরিদর্শন এবং হাতে-কলমে প্রশাসন সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান ও ধারণা অর্জন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার আগ পর্যন্ত মাঠ প্রশাসনে সিএসপি অফিসারদেরই প্রাধান্য ছিল। একটি জেলা শহরে তিন থেকে ছয়জন সিএসপি অফিসারকে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত দেখা যেত। তবে মজার ব্যাপার, সিলেট ডিসি অফিসের সব কর্মচারী ও জুনিয়র কর্মকর্তারা শিক্ষানবিশ সহকারী কমিশনারকে 'সিএসপি সাব' হিসেবে সম্বোধন করতেন, যেন তিনিই এই শহরের এক এবং কেবল একজনই কর্মরত সিএসপি অফিসার। আমি অবশ্য এই সম্বোধনকে এক নবীন কর্মকর্তার প্রতি তাঁদের শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে দেখতাম এবং সেভাবেই একজন অফিসারের সঙ্গে কর্মচারীদের কিংবা জুনিয়র অফিসারদের দূরত্ব কমিয়ে আনার চেষ্টা করতাম।

চাকরিতে আমার অভিষেকপর্বটি ছিল একাধারে আনন্দ ও বিষাদের। আমার কাজ সম্পাদনের জন্য আমাকে একটা এজলাস ও তৎসংলগ্ন একটি কক্ষ বরাদ্দ দেওয়া হলো। বিচারকাজ পরিচালনার জন্য একটি উঁচু প্ল্যাটফর্মের তিন দিকে কাঠের রেলিং ও পেছনে দেয়াল রেখে মোটামুটি বর্গাকৃতি একটু জায়গা বের করে চৌকি বিছিয়ে প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। কাঠের রেলিং আবার লাল সালুতে ঘেরা, যা দীর্ঘদিনের অযত্ন আর ধুলোবালির আধিক্যে মলিন ও বিবর্ণ। এই প্ল্যাটফর্মের ওপর ছোট একটি চেয়ার ও সামনে একটি ছোট টেবিল। এই এজলাসে বসে আমাকে বিভিন্ন কেসের শুনানি গ্রহণ করতে হবে। উল্লিখিত প্ল্যাটফর্মের পাশেই দেয়াল ঘেঁষে ছোট্ট একটি দরজা, যেটা দিয়ে সংলগ্ন অফিসঘরে প্রবেশ করতে হয়। প্ল্যাটফর্মের ঠিক নিচে এক কোণায় বেঞ্চ ক্লার্কের বসার ব্যবস্থা। আমার এজলাসটি একটি লম্বা একতলা দালানের মাঝামাঝি জায়গায়। এখানে আরও কয়েকটি এজলাস আছে। তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দীর্ঘদিন এই দালানের কোনো মেরামত আর রঙের কাজ না হওয়ায় এটি জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে এবং আমার সিলেটে অবস্থানকাল পর্যন্ত এটি সংস্কারের কোনো উদ্যোগ দেখিনি। তবু আমার নিজস্ব একটা দপ্তর হলো, এ জন্য আমি যথেষ্ট আনন্দিত ছিলাম।

লাহোর একাডেমিতে ম্যানুয়েল টাইপরাইটিং শিখেছি। আমি স্থির করলাম যে দাপ্তরিক চিঠিপত্র এবং বিচারের রায় হাতে না লিখে আমি নিজেই টাইপ করব। টাইপিং যতটুকু রপ্ত করেছি, সেটুকু যেন ভুলে না যাই, সে জন্যই এই ইচ্ছা। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা যে ডিসি অফিসের নেজারতে রিকুইজিশন দিয়ে একটি পুরোনো ও অকেজো মেশিন পেলাম, যেটির ব্যবহারে আমার কোনো আনন্দ ছিল না। চাকরিজীবনের শুরুতে এই প্রথম প্রত্যাশার সঙ্গে বাস্তবতার অমিল দেখে হোঁচট খেলাম। দ্রুততা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে গেলে যেমন দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন, তেমনি ভালো লজিস্টিক সাপোর্টের দরকার। কিন্তু এর অভাব চাকরিজীবনের প্রথম থেকে যেমন দেখেছি, তেমন কিছু দেখেই বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন থেকে বিদায় নিয়েছি।

ডিসি অফিসের প্রতিটি সেকশনে সংশ্লিষ্ট করণিকদের সঙ্গে বসে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণকালে খুঁটিনাটি ও রুটিন সিদ্ধান্ত গ্রহণে করণিকদের ক্ষমতা ও শক্তির উৎস সম্পর্কে আমার একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা হলো। ডিসি অফিসের বিভিন্ন সেকশনে যে সমস্ত আইন, বিধিবিধান, সরকারি নির্দেশাবলি, সর্বোপরি ডিসির নির্বাহী আদেশ অনুযায়ী যেভাবে বিভিন্ন কেস নিষ্পত্তি হয়, সেগুলো সম্পর্কে অবহিত হওয়াই ছিল এই অংশের প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য। তবে করণিকদের ক্ষমতা ও শক্তি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন ছিল আমার একটি বাড়তি অর্জন। এটি কোনো নতুন আবিষ্কার নয়। তবে বিষয়টি আমার জানা ছিল না এবং বিষয়টি সম্পর্কে আগে কখনো ভেবে দেখিনি। অফিসাররা আসেন-যান, তাঁদের পদ বদলিযোগ্য; কিন্তু করণিকেরা তাঁদের পুরো চাকরিজীবন একই অফিসে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই সেকশনে অতিবাহিত করেন। কোন ফাইলটি কোথায় কী অবস্থায় আছে—এর আদ্যোপান্ত তাঁদের নখদর্পণে। তাঁরা সদয় হয়ে ফাইল ওপরে ওঠালে নাগরিক তাঁর উত্থাপিত কেসের ওপর সিদ্ধান্ত পান; ফাইল ওপরে না গেলে কেসের কোনো নিষ্পত্তি নেই। এ ছাড়া ফাইলে এবং সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান তাঁরা কীভাবে উত্থাপন করেন, তার ওপরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ নির্ভর করে। কোনো ধরনের যান্ত্রিক সাহায্য ছাড়া হাতে হাতে নথি ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিই এঁদের ক্ষমতার আধার। এই ক্ষমতা খর্ব করার একমাত্র উপায় প্রশাসনের প্রতিটি পর্যায়ে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির প্রচলন ও ব্যাপক ব্যবহার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিলেটে তিন মাসের প্রশিক্ষণকালে অন্তত ১০ বার আমাকে সার্কিট হাউস ছেড়ে অন্যত্র যেতে হয়েছে। এ ব্যাপারে ডিসি নিজেও বেশ বিব্রত ছিলেন এবং অন্য কোনো ব্যবস্থা না করতে পেরে তিনি আমার মহকুমা সংযুক্তির প্রোগ্রামটি এগিয়ে এনে আমাকে মৌলভীবাজার মহকুমায় এক মাসের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে আমাদের সহকর্মী কাজী মনজুরে মওলা সাবডিভিশনাল অফিসার হিসেবে তখন কর্মরত। আমি সস্ত্রীক সেখানে গিয়ে মৌলভীবাজার সার্কিট হাউসে আমার থাকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করলাম। এখানে সিলেটের মতো সফরকারী অফিসারদের ভিড় ছিল না। আমি নির্বিঘ্নে এখানে আমার নির্ধারিত প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করতে পারলাম।

সিলেটে ফিরে আসার কয়েক দিনের মাথায় শামসুল হক চিশতী বদলি হলে মোকাম্মেল হক তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। বয়সে অপেক্ষাকৃত নবীন, অফুরন্ত প্রাণশক্তি আর প্রশাসনের বহুবিধ সমস্যার চ্যালেঞ্জ গ্রহণে উজ্জীবিত মোকাম্মেল হক সিলেটের প্রশাসনে এক নতুন গতিবেগের সঞ্চার করলেন। তার কিছু ঝাপটা আমার কর্মসূচির মধ্যেও সঞ্চারিত হলো। কোর্টকাচারি এবং রুটিনকাজের বাইরে অন্য সময়ের জন্য তিনি আমাকে নিঃশব্দে তাঁর সব প্রোগ্রামে তাঁকে অনুগমন করার নির্দেশ দিলেন। এই অনুগমনের কোনো সীমা ছিল না—ডিসির অফিস তো বটেই, তাঁর কনফিডেনশিয়াল সেকশনে এবং বাসায় আমার ছিল অবারিত প্রবেশাধিকার। ব্রিটিশ আমলে একটা অলিখিত বিধান ছিল যে আইসিএস শিক্ষানবিশ অফিসারের নিজস্ব কোনো সংসার পাতার পাট ছিল না—তিনি এককভাবে কিংবা বিবাহিত হলে, সস্ত্রীক ডিসির সংসারের অংশ। মোকাম্মেল হকের সঙ্গে আমার প্রায় নয় মাসের শিক্ষানবিশকাল সেই ব্রিটিশ ঐতিহ্যে যাপনের সুযোগ হয়েছে।

নতুন ডিসি তাঁর অনুজের প্রতি যেমন অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ ছিলেন, তেমনি আমার ওপর অর্পিত কাজ সঠিক মানে এবং নির্ধারিত সময়ে আমি সম্পন্ন করতে পারি কি না, সেটারও তিনি কঠোর খবরদারি করতেন। কাজের ব্যাপারে কোনো ছাড় দেওয়া কিংবা একই সার্ভিসের সদস্য এই সুযোগের অপব্যবহার করে কর্তব্যে অবহেলা কিংবা কোনো ধরনের অবিমৃষ্যকারিতা সহ্য করা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ছিল না। তাই তিনি আমার অত্যন্ত কাছের লোক হলেও আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে আমি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতাম।

ইতিমধ্যে আমি শহরের মীর্জা জাঙ্গাল নামক স্থানে সরকারি তত্ত্বাবধানে রক্ষিত একটি পরিত্যক্ত বাড়ি বরাদ্দ পেয়েছি। বাড়িটি অত্যন্ত পুরোনো ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জরাজীর্ণ। এটির মেরামতের জন্য ডিসি অফিসের রাজস্ব বিভাগে কোনো ফান্ডও ছিল না। তবু আমি সানন্দচিত্তে এখানে বসবাসে রাজি হলাম এই ভেবে যে এখানে আমি শান্তিতে থাকতে পারব। সফরকারী অফিসারদের জন্য বাসা ছেড়ে দিতে হবে না।

দিনে দিনে আমার কাজের পরিধি আর ব্যস্ততা উভয়ই বাড়তে থাকল। ডিসি আমাকে কিছু নতুন দায়িত্ব দিলেন। এসব কাজে আগে দেখেছি এডিসিরা ডিসিকে সহায়তা করতেন। এর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন ছিল ভিআইপিদের প্রটোকল। অপর একটি কঠিন কাজ ছিল রিলিফ কার্যক্রম পরিচালনা। খোয়াই, কুশিয়ারা, সুরমা ও মনু—এই পাহাড়ি নদীগুলো সিলেট জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। উজানে নদীপথ সাধারণত সংকীর্ণ থাকে, যা ভাটির দিকে গিয়ে ক্রমে ক্রমে প্রশস্ত হতে থাকে। বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ার আগে এবং শেষ হওয়ার প্রাক্কালে মে-জুন ও সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে উজানে অল্প সময়ে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হলে পাহাড়ি ঢলের তোড়ে সিলেট আগাম বন্যায় আক্রান্ত হয়। আবার মৌসুম শেষে প্রলম্বিত সময়ে দ্বিতীয় দফা বন্যা হয়। নদীপারের জনপদ ও জনগোষ্ঠীকে এ ধরনের বন্যার কবল থেকে রক্ষা করার জন্য সব কটি নদীতেই ওয়াপদা বাঁধ নির্মাণ করেছে। কিন্তু প্রায় বছরই পানির তোড় এত তীব্র হয় যে, বাঁধে আর শেষ রক্ষা হয় না। বহু জায়গায় বাঁধ ভেঙে দ্রুত বেগে পানি ঢুকে বিস্তীর্ণ এলাকা ডুবে যায় এবং শত শত লোক পানিবন্দী হয়ে পড়ে।

জুনের প্রথম দিক। একজন ভিআইপিকে বিদায় করে ডিসি অফিসে মৌলভীবাজারে আগাম বন্যা মোকাবিলায় রিলিফ কার্যক্রমের ওপর সভায় যোগ দিয়েছি। সভা শেষে মোকাম্মেল হক আমার দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বললেন, বাসায় গিয়ে স্যুটকোট ছেড়ে লেবাস পরিবর্তন করো। আমার সঙ্গে তোমাকে মৌলভীবাজারের কামারচক ইউনিয়নে যেতে হবে এবং রিলিফ কাজ তদারকির জন্য বেশ কয়েক দিন থাকতে হবে। লঞ্চে করে রিলিফ-সামগ্রী নিয়ে আমরা একটু পরই বেরিয়ে পড়ব। আমার স্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে তাঁর ছাত্রী ছিলেন। সে জন্য তিনি তাঁকে নাম ধরেই ডাকতেন। বললেন, নীলু যদি মীর্জা জাঙ্গালে একা থাকতে ভয় পায়, তাকে তোমার ভাবির সঙ্গে থাকতে বলো।

সন্ধ্যার একটু আগে কামারচক গিয়ে পৌঁছাই। সেখানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমাদের ক্যাম্প স্থাপন করি। এই ইউনিয়নের হাতেগোনা যে কটি স্থাপনা পানিতে ডুবে যায়নি, স্কুলটি তার মধ্যে একটি। ইউনিয়ন পরিষদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেয়ারম্যান একজন প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। পরে জেনেছি, বর্তমান মেয়াদ নিয়ে তিনি পরপর তিনবার চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর বাবা তাঁর মতো বেশ কয়েকবার এই ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের পদে নির্বাচিত হয়েছেন। ইউনিয়ন পরিষদ বা কাউন্সিল—যে নামেই এটি অভিহিত হোক না কেন, এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেটি শত শত বছর ধরে গ্রামাঞ্চলের জনগণকে কোনো-না-কোনো সেবা দিয়ে আসছে। সব চেয়ারম্যান একই মানের নয়। এদের মধ্যে অনেক দুষ্ট ও ভ্রষ্ট প্রকৃতির লোক আছে। তবে সামগ্রিকভাবে ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরোনো প্রতিষ্ঠান এবং এটি জনগণের কাছাকাছি থেকে সেবা দেওয়ার চেষ্টা করে। পরদিন ভোরে ডিসি আমাকে কামারচক রেখে সিলেটে ফিরে গেলেন। বন্যার ভয়াবহতা দেখে আরও কদিন পর লঞ্চে আরও কিছু রিলিফ-সামগ্রী পাঠানোর প্রতিশ্রুতি তিনি চেয়ারম্যানকে দিয়ে গেলেন।

আমি রিলিফ ম্যানুয়েলের নিয়ম অনুসরণ করে প্রতিটি ওয়ার্ডের বন্যাক্রান্ত লোকদের একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়নের উদ্যোগ নিলাম। ওয়ার্ড মেম্বার ও স্থানীয় অধিবাসীরা এ কাজে আমাকে সহযোগিতা করলেন। 'সিএসপি সাবে'র তত্ত্বাবধানে কাজটি হচ্ছে দেখে গ্রামবাসীও খুশি। আর আমিও মানুষের এত বিপদে কিছুটা সাহায্য করতে পারছি, এটা ভেবে অনেক কষ্টের মধ্যেও স্বস্তিবোধ করছি। কামারচকে এক সপ্তাহ অবস্থানকালে রিলিফ-কাজ পরিচালনা সম্পর্কে একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা হলো আর সিলেটের আগাম বন্যার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে একটা বাস্তব ধারণা পেলাম, যা পরবর্তীকালে পানি উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করার সময় আমার অনেক কাজে লেগেছে।

প্রটোকলের কাজটা আমি কঠিন বলেছি এই জন্য যে যাঁদের প্রটোকলের দায়িত্ব পালন করা হয়, তাঁরা সবাই এই দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তার চেয়ে পদমর্যাদায় অনেক ওপরে। তাঁদের একেকজনের ব্যক্তিত্বের যেমন ভিন্নতা আছে, তেমনি প্রশাসনের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থানরত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁদের আন্তযোগাযোগেরও কোনো নির্দিষ্ট মান নেই। যে কাজটি একজন হয়তো অপ্রয়োজনীয় মনে করেন, অপর বিশিষ্ট ব্যক্তি সে কাজটিকেই প্রত্যাশিত ও আকাঙ্ক্ষিত মনে করতে পারেন। প্রটোকলের কাজ করতে প্রায়ই এ ধরনের পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির মুখোমুখি হয়েছি এবং এই পরস্পরবিরোধিতার মধ্যে কিছু কিছু ভালো কাজ এগিয়ে নেওয়া যে কতটা দুরূহ, সেটা অনুধাবন করতে পেরেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবার ডিসি আমাকে জানালেন যে ওই দিন দুপুরেই তিনি হাওর এলাকার তিনটি থানা সফরে যাচ্ছেন। সেখানে হাওরের মাছ চাষের ইজারা নিয়ে মৎস্যজীবী আর প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছে গেছে এবং যেকোনো সময় তা রক্তাক্ত সংঘর্ষে পরিণত হতে পারে। তবে পরের দিন ভোরে সুরমা মেইলে প্রাদেশিক সরকারের শিল্পমন্ত্রী সফরে আসছেন। তার প্রটোকল আমাকে করতে হবে। আমি যেন ট্রেন আসার নির্ধারিত সময়ের আধা ঘণ্টা আগে স্টেশনে পৌঁছে সময়মতো তাঁকে রিসিভ করে সার্কিট হাউসে নিয়ে আসি এবং মন্ত্রীর সঙ্গে সার্বক্ষণিক তাঁর প্রটোকলের দায়িত্ব পালন করি।

সে সময় সিলেট সদর থেকে একজন করে দুজন সংসদ সদস্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন—কেন্দ্রে আজমল আলী চৌধুরী আর প্রদেশে দেওয়ান আবদুল বাসিত। তখন সিলেটে আসার জন্য মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তারা ঢাকা কিংবা চট্টগ্রাম উভয় প্রান্ত থেকে রাত ১০টার দিকে তাঁদের জন্য উভয় দিকের মেইল ট্রেনে সংযুক্ত স্যালনে করে আখাউড়া পর্যন্ত আসতেন। চট্টগ্রাম থেকে সিলেটগামী বগিগুলোকে ঢাকা থেকে আসা সুরমা মেইলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হতো। সেটিই খুব ভোরে দুই দিকের যাত্রী নিয়ে সিলেট পৌঁছে যেত। ভ্রমণটা খুব সুবিধাজনক ও আরামপ্রদ ছিল—স্যালন কিংবা উচ্চ শ্রেণীর কক্ষে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে গন্তব্যে পৌঁছানো যেত। আর সে সময় ইস্টার্ন রেলওয়ের সার্ভিসও অত্যন্ত উন্নতমানের ছিল।

দেওয়ান আবদুল বাসিত সিলেটের এক সম্ভ্রান্ত ও খানদানি পরিবারের সদস্য। হরিদ্রাভ গায়ের রঙের ওপর বকের পাখার রঙের মতো সাদা চুল ও দাড়ি এবং ততোধিক সাদা ধোপদুরস্ত কিস্তি টুপি, পাজামা-পাঞ্জাবি আর পায়ে ঝকঝকে একজোড়া দামি মোকাসিন নিজস্ব ধারার আভিজাত্যে তাঁকে একধরনের স্বকীয়তায় অভিষিক্ত করত। খুব একটা ব্যত্যয় না হলে তিনি প্রতি সপ্তাহেই সিলেট সফরে আসতেন। আমি যত দিন তাঁর সফরকালে সিলেট শহরে উপস্থিত ছিলাম, প্রতিবারই ডিসি কিংবা এডিসিদের সঙ্গে তাঁর প্রটোকল করেছি। এবার আমাকে একাই এই কাজটি করতে হবে। সে জন্য কিছুটা উদ্বেগের মধ্যেও ছিলাম।

পরদিন সকালে ট্রেন আসার বহু আগে ডিসি পুলের কালো মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়ি নিয়ে স্টেশনে হাজির হলাম। ট্রেন যথারীতি থেমে গেলে আমি স্যালনের দরজার সামনে মন্ত্রী মহোদয়ের অবতরণের অপেক্ষায় থাকলাম। কিছুক্ষণ পর ট্রেনের কক্ষ থেকে নেমে স্টেশনে ডিসি কিংবা এডিসি কাউকে না দেখে তিনি উচ্চকণ্ঠে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ডিসি আসেন নাই? তিনি কোথায়? আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিনীতভাবে বললাম, স্যার, সুনামগঞ্জের হাওরে জলাভূমির ইজারা নিয়ে বেশ সমস্যা হয়েছে। সে জন্য জরুরি ভিত্তিতে তিনি সেখানে গেছেন।

আমার এই উত্তর শুনে মন্ত্রী ক্রোধে ফেটে পড়লেন, আমি তিন দিন আগে তাঁকে টেলেক্স করে আমার প্রোগ্রাম জানিয়েছি। আমার পিএসও তাঁর সঙ্গে কথা বলেছে। তার পরও তিনি কেন গেলেন?

এর কোনো যথাযথ উত্তর খুঁজে না পেয়ে আমি চুপ করে থাকলাম। ডিসি অফিসে গত সাত মাস ঘোরাঘুরি করে শিখেছি যে এ রকম পরিস্থিতিতে নীরব থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ।

ইতিমধ্যে মন্ত্রী শহরের দিকে যাওয়ার জন্য হাঁটতে শুরু করেছেন। আমি আস্তে করে তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, স্যার, মার্সিডিজ গাড়িটি নিয়ে এসেছি। সেটি ভিআইপি গেটে অপেক্ষায় আছে।

—আরে রাখেন আপনার মার্সিডিজ। আমি বিসিকের ম্যানেজারের গাড়িতে যাব। বলে তিনি বিসিকের ম্যানেজারকে গাড়ি ভিআইপি গেটে আনার নির্দেশ দিলেন। আমি মার্সিডিজ নিয়ে মন্ত্রীর গাড়ির বহরে যোগ দিয়ে সার্কিট হাউসের লবিতে বসে রইলাম। সকালে ব্রেকফাস্টের পর বোধ হয় মন্ত্রীর মেজাজ ঠিক হলো। তিনি আমাকে তাঁর কক্ষে ডেকে নিয়ে বললেন, যা ঘটেছে, তাতে আপনার কিছু করার নেই। তবে ডিসির এ ধরনের আচরণে আমি বিরক্ত। আপনি যখন ডিসি হবেন, তখন অনেক ভেবেচিন্তে কাজ করবেন।

আমার দীর্ঘ চাকরিজীবনে আমি মন্ত্রীদের প্রটোকল বনাম ডিসির অন্যান্য দায়িত্ব পালনের মধ্যে সব সময় একধরনের সংঘাত সৃষ্টি হতে দেখেছি। মন্ত্রী যদি ওই এলাকার হন, তবে প্রতিনিয়তই তিনি এলাকা সফরে আসেন এবং প্রত্যাশা করেন যে ডিসি সার্বক্ষণিক তাঁর পাশে থাকবেন। একবারও এটা ভেবে দেখেন না যে জেলায় ডিসির বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় এবং কোনো কোনো বিষয় তাঁকে সরেজমিনেও দেখতে হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রীদের প্রটোকলে ডিসিদের সংশ্লিষ্টতার মাত্রা সম্পর্কে উভয় পক্ষেরই আরও যুক্তিবাদী হওয়া প্রয়োজন।

এই ঘটনার বিপরীতে অপর দুই মন্ত্রীর সঙ্গে আমার প্রটোকলের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজমল আলী চৌধুরীর প্রথম সিলেট সফরকালে রেলস্টেশনে অভ্যর্থনা থেকে বিদায় পর্যন্ত এবং সফরকালে আমি সার্বক্ষণিক তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তিনি অত্যন্ত খোশমেজাজে আমাকে গ্রহণ করেছিলেন। বিভিন্ন জায়গায় তিনি যখনই আমার খোঁজ করছেন, উচ্চস্বরে 'কমিশনার সাহেব কোথায়, তাঁকে ডেকে পাঠাও' বলে আমার পরিচিতি ফলাও করেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাফলংয়ের এক চা-বাগানে মধ্যাহ্নভোজের সময় আমি মন্ত্রীকে বিনীতভাবে বললাম, স্যার, আপনি আমাকে বারবার কমিশনার সাহেব বলে সম্বোধন করছেন, আমি তো অত্যন্ত জুনিয়র একজন সহকারী কমিশনার। মন্ত্রী মুচকি হেসে বললেন, আরে, আমি কি তা জানি না। তবে কমিশনার বললে আপনার তো কোনো ক্ষতি নেই। তাই বললে ক্ষতিটা কী?

আরেক প্রাদেশিক মন্ত্রী মোখলেসুর রহমানের প্রটোকল করতে গিয়ে সরকারি খরচ ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার জন্য তাঁর উৎকণ্ঠা আমাকে অভিভূত করেছে। তিনি সড়কপথে মৌলভীবাজার মহকুমা পরিদর্শনে যাবেন। আমি তাঁর সঙ্গে মৌলভীবাজার পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসার প্রোগ্রাম করেছি। আমার প্রোগ্রাম শুনে তিনি বললেন, দেখুন, আমরা গরিব দেশের মানুষ। অহেতুক খরচ যত পরিহার করা যায়, দেশের জন্য সেটা ততই মঙ্গলজনক। মৌলভীবাজারের এসডিও আমাকে শেরপুর প্রান্ত থেকে রিসিভ করে নিয়ে যাবেন। আপনি সদর মহকুমার সীমান্ত নদীর এপার পর্যন্ত আসতে পারেন। তারপর আপনি সিলেট ফিরে গিয়ে নিজের কাজে মনোনিবেশ করুন।

সিলেটে দীর্ঘদিন অবস্থানের পর আমার স্ত্রী নিজবাড়ি চট্টগ্রাম যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন। সুযোগ বুঝে আমি ডিসির কাছে এক সপ্তাহের ছুটি চাইলাম। তিনি কী ভেবে আমাকে বললেন, তোমার ছুটি নেওয়ার দরকার নেই। চট্টগ্রাম কমিশনারের দপ্তরে আমাদের বেশ কিছু কেস দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে আছে। তুমি কমিশনারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে তাঁকে তোমার সেখানে যাওয়ার কারণ গুছিয়ে বলবে এবং তিনি অনুমতি দিলে তাঁর অফিসে বিভিন্ন ডেস্ক অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় আদেশ বের করে নিয়ে আসবে। তিনি আরও বললেন, শ্রীমঙ্গলের সার্কেল অফিসারকে (উন্নয়ন) বলবে, কমিশনারকে দেওয়ার জন্য ভালো দেখে আনারস নিয়ে যেন তোমাকে ট্রেনে পৌঁছে দেয়।

আমি নির্দেশমতো পরের দিন সুরমা মেইলে সস্ত্রীক চট্টগ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। পথে শ্রীমঙ্গল সার্কেল অফিসার আনারস পৌঁছে দিলেন। খুব ভোরে চট্টগ্রাম পৌঁছে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে কমিশনারের বাসভবনের উদ্দেশে রওনা হলাম।

কমিশনার এম আলাউদ্দিন বাংলাদেশে বসবাসকারী বিহারি এবং চিরকুমার। তাঁর সঙ্গে যাঁরা কাজ করেছেন সবাই আলাপচারিতাকালে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য ও পর্যবেক্ষণ আর সূক্ষ্ম রসবোধের প্রশংসা করতেন। আমাকে দেখেই তাঁর প্রশ্ন, সিলেট ছে ইধার আয়া। ইহা কোয়ি রিস্তাদার হ্যায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্য কথার কোনো মার নেই। আমি নিঃসংকোচে বললাম, জি স্যার, হ্যায়। ইহা হামারা ফাদার ইন-ল কা ঘর হ্যায়।

—বহুত আচ্ছা বাত হায়। তো কিস চিজ কি বাহানা লে কর ইহা আয়া হো।

বললাম, স্যার, ডিসি অফিসের অনেকগুলো কেস কমিশনার দপ্তরে অনেক দিন ধরে অনিষ্পন্ন অবস্থায় আছে, সেগুলো একটু খোঁজখবর করে বের করে আনার উদ্দেশ্যে এসেছি।

—বহুত আচ্ছা, কেয়া কেয়া কেস হায়, বাতাও।

আমি এক এক করে বললাম, স্যার, ডিসি অফিসের পুলের লাখ লাখ টাকার পেট্রল বিল পরিশোধের অপেক্ষায় আছে। টাকার বরাদ্দ না দিলে পাম্পওয়ালা আর তেল দেবে না বলেছে। সুনামগঞ্জ মহকুমা অফিসে অনেকগুলো পদ খালি পড়ে আছে। নিয়োগের ছাড়পত্র না দিলে লোক নিয়োগ করা যাচ্ছে না। তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পদোন্নতির অনেক কটা কেস বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটিতে নিষ্পন্ন করার জন্য কমিটির সভা ছয় মাসেও ডাকা হয়নি। আর এদের আন্তজ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের কাজটিও দীর্ঘ দিন ধরে সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে। আরও দুটি আইটেম আমার তালিকায় ছিল। আমাকে আর কথা বলতে না দিয়ে কমিশনার অত্যন্ত শান্ত গলায় শিক্ষক যেমন ছাত্রকে সবক দান করেন, সেভাবে বললেন, বরখরদার, মেরা বাত গওর সে শুনো। In administration, at whatever level, there are three kinds of problem: the first kind defies all kinds of solution. No human soul can solve this type of problem. It is, therefore, wise not to make any attempt to solve them. There is then the second type of problems that wait for an opportune time for their resolution. In this category also it is futile to attempt to resolve them. And finally, there is the third type of problems that need urgent attention of the decision-makers for their resolution. তুমারা যো পেট্রলওয়ালা বাত হ্যায় না ইয়ে not amenable to any solution. Shortage of fund, non-payment for long—ইয়ে চলতা রাহেগা...তুম আওর ম্যায় ইসকো সিধা নাহি কর সাকতা। Since the British days, budgetory allocations to field offices have always fallen below the requirement. I have given up thinking about these problems. দুসরা ইয়ে inter-*se*niority ভি হাম নেহি fix কার সাকতে। These fellows are fighting amongst themselves, half a dozen cases have been filed and injunctions obtained. ইন মে সে কয়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদমি মর জায়েগা, কয়ি আদমি ইয়ে ডিপার্টমেন্ট সে ভাগ জায়েগা আওর বাকি চুপচাপ বায়ঠা রাহেগা। Law of attrition will take away the disputants to eternity that will set the stage for natural solution. Issuing clearance for appointment আওর বাকি কাম হাম সলভ কর সাকতে। তুম ইয়ে কাগজাত মেরা পিএস কে পাস লে যাও। He will do the needful. You don't have to waste your time loitering the corridors of my office. তুম ওয়াপাস রেস্তেদারো কে পাস যাও and enjoy your stay at Chittagong.

আমি কমিশনারকে সালাম দিয়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। কমিশনারের সঙ্গে স্বল্প সময়ের আলাপচারিতায় problem solution-এর ওপর যে বিশ্লেষণ তিনি দিলেন, তা আমি সব সময় মনে রেখেছি এবং উপযুক্ত সময়ে আমি তা প্রয়োগ করেছি।

সিলেট ফিরে যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যে মোকাম্মেল হক ময়মনসিংহের ডিসি পদে বদলি হলেন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন আরেক সিএসপি অফিসার সফিউল আলম। তবে তাঁর সঙ্গে আমাকে খুব বেশি দিন থাকতে হয়নি। আমি ১৯ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্টের সঙ্গে আমার আর্মি অ্যাটাচমেন্ট সম্পন্ন করার জন্য গাজীপুরের কালিয়াকৈরে গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যোগ দিলাম। সেই কর্মসূচি শেষ করার কয়েক দিনের মাথায় আমার দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ শেষ হলো এবং খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমায় এসডিও হিসেবে আমার প্রথম নিয়মিত পোস্টিং হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্মজীবন : মাঠপর্যায়

১৯৬৮ সালের বাগেরহাট তখনকার দিনের জেলা শহরের বাইরের ৩৫টি মহকুমার মধ্যে বেশ কয়েকটি বিষয়ের বিচারে অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র ছিল। একমাত্র ভোলা মহকুমা ছাড়া আর কোনো মহকুমাই সদর থেকে সরাসরি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল না; বাগেরহাট থেকে খুলনা সদরে যেতে হলে নৌকায় পশুর নদ পাড়ি দিয়ে যেতে হতো। এটাই একমাত্র মহকুমা, যেখানে রূপসা ঘাট থেকে বাগেরহাট মহকুমা সদর পর্যন্ত যাওয়ার জন্য সারা দেশের একমাত্র ন্যারো গেজ রেললাইনটি বহাল তবিয়তে চালু ছিল। আর এটির গদাইলশকরি গতি এতই বিখ্যাত ছিল যে দূর থেকে আসা আরোহীরা বাগেরহাটের আগের স্টেশনে নেমে হেঁটে কোর্ট-কাছারি ধরতেন। পার্শ্ববর্তী অন্য মহকুমা সাতক্ষীরার মতো এই মহকুমার এক-তৃতীয়াংশজুড়ে সুন্দরবন, যেখানে দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনা অত্যন্ত কঠিন ছিল। ছয়টি থানা নিয়ে গঠিত এই মহকুমার ফকিরহাট থানা ছাড়া আর কোথাও সড়কপথে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

এসব বৈশিষ্ট্যের কারণেই হয়তো সরকারের কাছে বাগেরহাট মহকুমার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। ব্রিটিশ আমলে এটি একটি প্রতিষ্ঠিত আইসিএস স্টেশন ছিল। আর পাকিস্তান আমলে অধিকাংশ সময়ই সিএসপি অফিসারই এখানে পোস্টেড হতেন। আমার পূর্বসূরিদের মধ্যে আবুল মাল আবদুল মুহিত, মোকাম্মেল হক আর সৈয়দ শামীম আহসান অন্যতম ছিলেন।

মহকুমায় কর্মরত সব অফিসারই সপরিবারে বাস করতেন। বাগেরহাট সরকারি হাইস্কুল, গার্লস স্কুল আর বাগেরহাট পিসি কলেজ এই অঞ্চলের নামী প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম ছিল। আর সে সময় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নির্ধারিত বেতন স্কেল তাঁদের ভরণপোষণের জন্য পর্যাপ্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল। পূর্ণ দুই বছর চাকরি পূর্তির পর আমি বাগেরহাটে বদলি হই। দুটি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির ফলে আমার মূল বেতন দাঁড়ায় মাসিক ৬০০ টাকায়। আর এনিমি প্রপার্টির সহকারী কাস্টডিয়ান হিসেবে মাসিক ভাতা আরও ৬৫ টাকা। বাগেরহাট সাব-জেলের তত্ত্বাবধানকারী হিসেবে এসডিওর বাংলোটি ব্যবহারের জন্য কোনো ভাড়া ধার্য ছিল না। সর্বোপরি, এসডিওর কাজের ধরন এমন যে সরকারি জিপটি ব্যবহারে কোনো সরকারি-ব্যক্তিগত বিভাজন অসম্ভব ছিল। পাঁচ টাকা দিয়ে বাজারে পাঠালে মাছ কিংবা মাংস আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনার পরও কিছু টাকা ফেরত পাওয়া যেত। আজকাল মোল্লাহাট উপজেলা থেকে বাগেরহাটে এক ঘণ্টারও কম সময়ে পৌঁছানো যায়। ষাটের দশকে নৌকা কিংবা হাঁটাপথ যোগাযোগের একমাত্র উপায় ছিল, যে জন্য কৃষিজাত পণ্যের ভালো বাজার ধরা কঠিন ছিল। প্রতি মাসে থানা কাউন্সিলের সভা করার জন্য আমাকে অন্তত একবার প্রতিটি থানায় যেতে হতো। আমার মনে আছে, মোল্লাহাটে চার আনায় এক হালি ডিম পাওয়া যেত।

এতসব সীমাবদ্ধতার মধ্যেও দেশে মোটামুটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় ছিল এবং বর্তমান সময়ের তুলনায় খুন-রাহাজানিসহ মারাত্মক ধরনের অপরাধ সরকারের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ছিল। রাজনৈতিক সন্ত্রাস তো দূরের কথা, দুর্বৃত্তদের মধ্যেও বর্তমান স্টাইলের সন্ত্রাস আমাদের কাছে অজানা ছিল। দেশে দারিদ্র্য অসহনীয় পর্যায়ে ছিল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ মহকুমা আর থানা সদরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এত কষ্টের মধ্যেও মানুষের মনে তাদের নিরাপত্তা নিয়ে কোনো উৎকণ্ঠা ছিল না; ছিল না মাঠেঘাটে সর্বত্র পাল্লা দিয়ে দুর্বৃত্তায়ন আর অপশাসনের ঊর্ধ্বগতি।

তবে দেশের রাজনীতি তখন একটা ক্রান্তিলগ্নে উপনীত হয়েছিল এবং এই প্রক্রিয়াতে রাজনৈতিক অঙ্গনে যথেষ্ট উত্তাপ আর অস্থিরতার সঞ্চারণ হচ্ছিল। আমি রাজধানী থেকে বহুদূরে বাংলাদেশের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসেও সেই উত্তাপ অনুভব করছিলাম। ১৯৬৯ সালে গণরোষের মুখে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ভেস্তে যায় এবং তথাকথিত প্রধান আসামি বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানসহ সব অভিযুক্ত ব্যক্তিকেই জনগণ মুক্ত করে নিয়ে আসে। আইয়ুব সরকারের পতন হয় এবং ইয়াহিয়া খান নতুন করে আরেক দফা সামরিক শাসন জারি করেন। তবে তাঁর যথাশীঘ্র সম্ভব নির্বাচন অনুষ্ঠান করে দেশে দ্রুত বেসামরিক প্রশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারে রাজনীতির উত্তাপ কিছুটা প্রশমিত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাগেরহাটে আমার চাকরিকালে গভর্নর মোনেম খানের দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ, কনভেনশন ও কাউন্সিল মুসলিম লীগে বিভক্ত হওয়ায় রাজনৈতিক স্পর্শকাতরতার মাত্রা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিভিন্ন দল ও দলীয় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এবং মন্ত্রীদের প্রটোকলের দায়িত্ব পালনকালে আমরা আমাদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য অনেক সতর্কতা অবলম্বন করতাম। মন্ত্রীরা সফরে এলে তাঁদের দলীয় সংগঠন অবশ্যই জনসভাসহ বিভিন্ন সভার আয়োজন করত। জনসভাসংক্রান্ত খুঁটিনাটি সব কাজের দায়িত্ব ছিল সংগঠনের—আমাদের দায়িত্ব ছিল নিরাপত্তার দিকটি দেখা। মন্ত্রীর গাড়িতে সভাস্থল পর্যন্ত গিয়ে তাঁকে দলীয় লোকদের দায়িত্বে সোপর্দ করে আমরা আমাদের অফিসে ফিরে আসতাম। আবার মিটিং শেষ হলে মন্ত্রীকে নিয়ে তাঁর পরবর্তী গন্তব্যে যেতাম। এই ব্যবস্থার গুরুত্ব মন্ত্রীরা অনুধাবন করতেন এবং এ নিয়ে তাঁরা কখনো কোনো অনুযোগও করেননি। অবশ্য সরকারি কর্মসূচিতে আমরা মন্ত্রীর পাশে থাকতাম এবং যে বিভাগের কর্মসূচিতে মন্ত্রী অংশগ্রহণ করতেন, মহকুমা অফিসারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সব ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ওই বিভাগের ওপরই অর্পিত থাকত।

মুসলিম লীগের মধ্যকার বিভক্তি সামাল দিতে বাগেরহাটে আমার পূর্বসূরিরা একটি অলিখিত বিধানের প্রবর্তন করেছিলেন, যেটা আমিও সর্বতোভাবে পালন করেছি। আর তা হলো এই দুই গ্রুপের স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে এসডিওর আচরণের সমতা বজায় রাখা। কাউন্সিল মুসলিম লীগের হয়তো সত্যিকারেরই কোনো সমস্যা আছে, যেটা মহকুমা অফিসারের গোচরীভূত করা প্রয়োজন। তাঁরা সমস্যাটি নিয়ে আলোচনার জন্য এলেন এবং সাক্ষাৎকারও হলো। কিন্তু পরের দিন কনভেনশন লীগের কোনো আলোচ্য বিষয় নেই। তবু তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে হবে এবং একই রকমের সময় দিতে হবে। এ ধরনের আচরণ আর প্রত্যাশার কোনো যুক্তিগত ভিত্তি নেই, তবু প্রশাসনের নিরপেক্ষতার স্বার্থে এবং মহকুমা অফিসারের শান্তির জন্য এ ধরনের বাহুল্য কাজ প্রায়ই করতে হতো।

বাগেরহাটে প্রায় এক বছর নিরুদ্বেগ ও নির্বিঘ্ন সময় পার হওয়ার পর আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানে মাঠপর্যায়ে কাজ করার ডাক এল। পাকিস্তান সৃষ্টির পর বেশ কয়েক বছর উভয় প্রদেশের মাঠ প্রশাসনে এক প্রদেশনিবাসী সিএসপি অফিসারের সঙ্গে অন্য প্রদেশনিবাসী অফিসার বিনিময় হয়েছে। মাঝখানে তা দীর্ঘকাল বন্ধ থেকে ১৯৬৭ সালে পুনরায় চালু হয়। আমাদের দুই ব্যাচ আগের সিএসপি অফিসারদের দিয়ে এই প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং এই প্রক্রিয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারাবাহিকতায় পাঞ্জাব প্রদেশের লায়ালপুর জেলার টোবা টেক সিং মহকুমায় এসডিএম (সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট) হিসেবে আমার পোস্টিং হয়।

আমার পূর্বতন কর্মস্থল বাগেরহাট বসবাসযোগ্য স্থানের মানে যতটা পশ্চাৎপদ ছিল, টোবা টেক সিং ছিল তার বিপরীতে অপ্রত্যাশিতভাবে উন্নত। বাগেরহাটে কোনো পৌরসভা ছিল না। ছিল একটি টাউন কমিটি। আর টোবা টেক সিং মহকুমায় চারটি পৌরসভা বিদ্যমান ছিল এবং আরেকটি শহর পৌরসভায় উন্নীতকরণের প্রক্রিয়া চলছিল। পাকিস্তানের আর কোনো মহকুমায় এতসংখ্যক পৌরসভা সক্রিয় ছিল বলে আমার জানা নেই। পাঞ্জাবের বড় বড় নদ-নদীতে বাঁধ দিয়ে ব্রিটিশরাজ শত শত কিলোমিটার নালা নির্মাণ করে রবি ও খরিপ মৌসুমে সেচের পানি সরবরাহ নিশ্চিত করে। এত বছর পরও সেই সেচ অবকাঠামো কার্যকর অবস্থায় চালু ছিল এবং এই ব্যবস্থা পাকিস্তানের পাঞ্জাবে কৃষিতে সবুজ বিপ্লব সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। সমগ্র পাঞ্জাবই কৃষিতে উন্নত আর লায়ালপুর দেশের এই প্রাচুর্যের মধ্যমণি। নগরায়ণ আর্থিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সম্পৃক্ত বলেই এখানে এতগুলো শহর ও পৌরসভার সমাহার।

পাকিস্তানের দুই প্রদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মানদণ্ডে নগরায়ণ অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। তবে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের ভিন্নতা শুধু অর্থনীতির ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক ক্ষেত্রেও প্রকট এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য অনেকটাই পশ্চিম পাকিস্তানের সমাজকাঠামো থেকে উৎসারিত। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার আইন করে পূর্ব পাকিস্তানে জমিদারি প্রথার বিলোপ সাধন করে। ভূমিভিত্তিক অভিজাততন্ত্র যতটুকুই ছিল, তা ক্রমান্বয়ে ক্ষীণ হয়ে আসে এবং কালক্রমে তা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব খান ভূমি সংস্কারের কিছু উদ্যোগ নিলেও তা পূর্ব পাকিস্তানের মতো এত গভীর ও সর্বব্যাপী ছিল না। ওই উদ্যোগ সত্ত্বেও ভূমিভিত্তিক অভিজাততন্ত্র জোরেশোরেই বহাল থাকল। থাকল তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও। বিপুল বিত্তবৈভবের গরিমায় আপ্লুত ও হিতাহিতজ্ঞানশূন্য এক ক্ষুদ্র অভিজাতশ্রেণী আর নির্মম দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত ও নিষ্পেষিত আরেক বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিজেদের অবস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাণপণ সংগ্রামে লিপ্ত আরেক দল মধ্যবিত্ত মানুষ—১৯৬০-এর দশকে এই ছিল পাঞ্জাব প্রদেশের সার্বিক সামাজিক চিত্র।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালে এই চিত্রের পরিবর্তন আশা করা হলেও বড় আকারে সে রকম কিছু সংঘটিত হয়নি। ফলে, ব্রিটিশ আমলে আইসিএসকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘিরে সৃষ্ট প্রশাসনিক আচার-আচরণের কৃষ্টি পূর্ব পাকিস্তানে পরিবর্তনের মুখে পড়লেও পশ্চিম পাকিস্তানে তা অব্যাহত থাকল। আর পশ্চিম পাকিস্তানের সিংহভাগ সিএসপি অফিসার সামন্ত পরিবারের প্রতিভূ হওয়ায় এ ধরনের পরিবর্তনেরও কোনো উদ্যোগ দেখা গেল না। কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য যেসব সুযোগ-সুবিধা থাকা প্রয়োজন, তা অবশ্যই পেতে হবে। তবে পাকিস্তানে অফিসারদের চালচলনে আড়ম্বরের আতিশয্য লক্ষণীয় ছিল।

টোবা টেক সিংয়ে এসডিএমের বাংলোটি ছিল ছোট এবং সুপরিকল্পিত। বাংলোর সামনে বিরাট লন, যেখানে পৌরসভার এক বৃদ্ধ মালি ২৬ জাতের গোলাপ ফুলের এক অনিন্দ্যসুন্দর বাগান তৈরি করেছিল। বাড়ির পেছন দিকে মাটির দেয়ালে ঘেরা আরেকটি বাগান, যেখানে বেশ কয়েকটি কিনোগাছ বাড়িটির শোভা বাড়াচ্ছিল। গ্রীষ্মকালে ওখানে খাটিয়া পেতে উন্মুক্ত আকাশের নিচে শোয়ার ব্যবস্থা ছিল। বয়-বেয়ারা, বাবুর্চি—কোনো কিছুরই ঘাটতি ছিল না। এই আভিজাত্যের রাজত্বে আমার মতো এক মধ্যবিত্ত বঙ্গসন্তানের একটাই সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিল আর তা হলো, সফর করার জন্য সেখানে কোনো সরকারি গাড়ি নেই। অথচ এসডিএমকে অবশ্যই মাসে অন্তত সাত দিন সফরে যেতে হবে এবং হেডকোয়ার্টারের বাইরে রাত্রিযাপন করতে হবে। সফরে যাওয়ার আগে আমি আমার ব্যক্তিগত সহকারীকে বাসস্ট্যান্ডে পাঠিয়ে সামনের দিকে আমার জন্য সিট ধরে রাখতে পাঠাতাম। বাসওয়ালারা পুরো এক সারি সিট আমার জন্য ধরে রাখত।

পাঞ্জাব প্রদেশে এসডিএমের দায়িত্ব পূর্ব পাকিস্তানের এসডিওদের তুলনায় বেশ কিছুটা ভিন্ন। পাঞ্জাবে এসডিএম মূলত এক বা একাধিক থানাভিত্তিক এলাকা ম্যাজিস্ট্রেট আর পাঞ্জাব ভূমি ব্যবস্থাপনা আইনের অধীনে কালেক্টর। পাঞ্জাবের ডিসি আর এসডিএম উভয়েই কালেক্টর। তাঁদের আদেশের বিরুদ্ধে কমিশনার বরাবর আপিল হয়। যেহেতু ম্যাজিস্ট্রেসির কাজ এসডিএমসহ কয়েকজন ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে থানাওয়ারি ভাগাভাগি হতো, সেহেতু ভূমি ব্যবস্থাপনার কাজটাই এখানে মুখ্য। আর টোবা টেক সিংয়ের ভূমি অত্যন্ত উর্বর ও চাষযোগ্য হওয়ায় এবং বহু জমি সরকারের মালিকানাধীন থাকায় সরকারের অনুদানের জমি এখানেই সর্বাধিক পরিমাণে বরাদ্দ দেওয়া হতো। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধসহ বিভিন্ন যুদ্ধে যেসব পাকিস্তানি সেনা জীবন দান করেছেন, কিংবা তাঁদের পরাক্রম প্রদর্শন করে বিভিন্ন খেতাবে ভূষিত হয়েছেন, তাঁদের সরকার জমি বরাদ্দ দিত। সপ্তাহজুড়ে অনুদানপ্রাপ্ত অতি উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা কিংবা লিজপ্রাপ্ত জমিদারদের ভিড় লেগেই থাকত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন এক দিনে অন্যতম থানা ও পৌরসভা পীর মহলের খ্যাতনামা জমিদার ওয়াসেক আলী খান ভাট্টির একটা স্লিপ পেলাম। খুব জরুরি একটা বিষয়ে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। বেয়ারাকে তাঁকে দ্রুত খাসকামরায় নিয়ে আসতে বললাম। বিরাট পাগড়ি, চুড়িদার সালোয়ার আর ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি পরিহিত সৌম্যদর্শন মাঝবয়সী সামন্ত প্রভু চেয়ারে নড়েচড়ে বসে আমার সঙ্গে কুশলবিনিময় করে পাঞ্জাবি আর ভাঙা ভাঙা উর্দু মিলিয়ে যা বললেন, তার মর্মার্থটা এই রকমের :

সাহেব, আপনি এই টোবা টেক সিং তহশিলের (পাঞ্জাবে মহকুমা না বলে এসডিএমের আওতাভুক্ত অঞ্চলকে আমজনতা তহশিল বলে থাকে) সর্বময় অধিকর্তা। আপনার সম্মান, আমাদেরই সম্মান। আমাদের অধিকর্তা আম-আদমিদের সঙ্গে এক বাসে বসে সফর করেন, এর চেয়ে অসম্মানের কাজ আর কিছু হতে পারে না। বাইরে আপনার ব্যবহারের জন্য একটা গাড়ি আর ড্রাইভার নিয়ে এসেছি। আপনি এদের রেখে দেন। যখন এখান থেকে বদলি হয়ে যাবেন, আমার গাড়ি আর ড্রাইভার আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। আপনি আমার এই প্রস্তাব মেনে নিলে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হব এবং টোবা টেকবাসী তাদের এসডিএম যথাযথ মর্যাদায় চলাচল করতে পারছেন দেখলে তারাও খুশি হবে।

আমি সমূহ বিপদ দেখলাম। এর কদিন কয়েক আগে আরেক জমিদার আমি যেন খাঁটি দুধ খেতে পারি, সে জন্য রাখালসহ একটি মোষ নিয়ে আমার বাংলোর গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ আমার সঙ্গে তর্ক করে গেছেন। আমরা মোষের দুধ খেতে পারি না বলে বহু কষ্টে তাঁকে বিদায় করেছিলাম। কিন্তু এই বান্দাকে এত সহজে খারিজ করা যাবে না। এর কিছুদিন আগে টোবা টেক সিং নিবাসী এক পাকিস্তানি সিএসপি বাড়ি বেড়াতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কথায় কথায় তিনি আমাকে বলেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানের মতো পশ্চিম পাকিস্তানে অধিকাংশ মহকুমাতেই কোনো সরকারি গাড়ির বন্দোবস্ত থাকে না। অফিসাররা নিজেরাই গাড়ি কিনে সফর করেন এবং টিএ বিল থেকে এর রক্ষণাবেক্ষণের খরচসহ বিনিয়োগের কিছুটা অংশ উঠে আসে। হঠাৎ এই কথা মনে আসায় আমি ভাট্টি সাহেবকে বিনয়ের সঙ্গে বললাম, সাব, আমাকে নিয়ে তোমাদের চিন্তার জন্য অনেক শুকরিয়া। তবে তোমার গাড়ি আর ড্রাইভার নেওয়ার কোনো প্রয়োজন হবে না। আমার গাড়ি কেনা প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গেছে। দু-চার দিনের মধ্যেই আমার গাড়ি লাহোর থেকে এসে যাবে। তাঁর প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যই আমি একটা অজুহাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বের করেছি মাত্র। ভাট্টির চেহারা দেখে মনে হলো, তিনি এমনটিই হয়তো ভাবছেন। তবে আর কথা না বাড়িয়ে তিনি তখনকার মতো বিদায় হলেন।

ভাট্টি বিদায় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার ডিসি সফদার হোসেনকে ফোন করে এই ঘটনা বললাম। আমার ডিসি অত্যন্ত সৎ ও নিয়ম-কানুনের কঠোর অনুসারী ছিলেন। তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে আমাকে বললেন, গাড়ি কেনা ছাড়া তোমার কোনো গত্যন্তর নেই। লায়ালপুর জেলার সব জমিদারই অনাবশ্যক বিষয় নিয়ে বেশি মাথা ঘামান। তুমি কম দামে একটা পুরোনো গাড়ি কিনে ফেলো। আমি ইউনাইটেড ব্যাংক থেকে একটা ওডি নিয়ে ৩ হাজার টাকায় একটা পুরোনো টয়োটা গাড়ি কিনে ফেললাম।

টোবা টেক সিংয়ে দিন কাটানো খুব কঠিন হয়ে আসছিল। আমার স্ত্রী বাগেরহাট পিসি কলেজের লেকচারার। তার ছুটির আয়োজন সম্পন্ন করতে সময় লাগছিল। পুরো টোবায় বাংলাতে কথা বলার মতো আর দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি নেই; কোনো টেলিভিশন নেই; স্থানীয় সব পত্রিকা উর্দু ভাষায় প্রকাশিত—লাহোর থেকে *পাকিস্তান টাইমস* পত্রিকা পাই, কিন্তু সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের খবর খুব একটা থাকে না। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পাঞ্জাবি-বাঙালিনির্বিশেষে প্রশাসনের সঙ্গে যেভাবে সম্পৃক্ত হয়, এখানে সেরকম নেই বললেই চলে। যদিও সাধারণ লোক সিদ্ধান্ত প্রদানে আমাদের নিরপেক্ষতা আর সততা নিয়ে শতভাগ সন্তুষ্ট ছিল, বিদ্যমান রাজনীতির কারণে শিক্ষিত মহল আমাদের সন্দেহের চোখে দেখত। ১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসের একটি ঘটনা থেকে আমি তার কিছুটা আভাস পাই।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) রাজনৈতিক কার্যক্রম পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয় প্রদেশেই বিস্তৃত ছিল; যদিও পশ্চিম পাকিস্তানের অংশটি অধিকতর শক্তিশালী ছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে সারা দেশে তখন সীমিত আকারে নির্বাচনী প্রচারকাজ শুরু হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ন্যাপের অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতা মশিউর রহমান (যাদু মিয়া) পশ্চিম পাকিস্তান সফরের অংশ হিসেবে এক বিকেলে ন্যাপ আয়োজিত এক সভায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য টোবা টেক সিংয়ে আসেন। ওই জনসভায় ইয়াহিয়া খানকে গালমন্দ করার কথিত অভিযোগে যাদু মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে সামরিক আইনের অধীনে গ্রেপ্তার না করে পাকিস্তান দণ্ডবিধির অধীনে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। বিকেল পাঁচটার পরের ঘটনা। কোর্ট-কাচারি বন্ধ হওয়ায় আমি বাসায় বিশ্রাম করছি। এমন সময় কোর্ট সাব-ইন্সপেক্টর আমাকে জানালেন, একজন রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আমি এলাকা ম্যাজিস্ট্রেট বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার কোর্টে তাঁকে হাজির করতে হবে। এ জন্য আমাকে আবার কষ্ট করে কোর্টে যেতে হবে। আমি এসডিএমের খাসকামরা খুলে তাঁকে সেখানে বসানোর নির্দেশ দিলাম। আমি অফিসকক্ষে ঢুকে বিস্ফারিত চোখে দেখি, আমার টেবিলের সামনে বসে আছেন এক বঙ্গসন্তান। যাদু মিয়াকে আমি এর আগে কখনো চাক্ষুষ দেখিনি কিংবা তাঁর সঙ্গে আমার কোনো পূর্বপরিচয় ছিল না। তবে তিনি যে এখানে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে এসেছেন, সেটা আমি জানতাম। প্রায় তিন মাস বাংলায় কথা বলার লোকের অভাবে আমার প্রাণ আইঢাই করছিল। আমি বাংলায় তাঁকে বললাম, আপনি এভাবে গ্রেপ্তার হয়ে আসবেন, আমার ভালো লাগছে না। আপনাকে অন্যভাবে আমি এখানে পেলে আরও খুশি হতাম। যাদু মিয়া ধীর গলায় বললেন, এতে আপনার কিছু করার নেই। এটা রাজনীতির খেলা। আমার হাতে সিগারেটের প্যাকেট ছিল। তিনি একটা সিগারেট চাইলেন। দিতে দিতে আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি চা খাবেন কি না। তিনি 'হ্যাঁ' বললে আমি আমার পিয়নকে দ্রুত চা-নাশতা নিয়ে আসতে বললাম। সেগুলো আসতে আসতে তিনি আমার পরিচয় এবং অন্য খবরাখবর জানতে চাইলেন। একপর্যায়ে এ-ও মন্তব্য করলেন যে মাঠপর্যায়ে ভিন্ন ভাষাভাষীদের বদলি সঠিক নয়। জনগণের সঙ্গে জনগণের ভাষায় কথা বলতে না পারলে সেবা প্রদান কীভাবে সম্ভব?

চা-পর্ব শেষ হলে আমার দাপ্তরিক কাজ শেষে পুলিশ যাদু মিয়াকে নিয়ে লায়ালপুরের পথে রওনা হয়ে গেল।

পরদিন সকালে অফিসে পৌঁছানোর পরই মনে হলো এক টেলিফোনের ঝড়ের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হলাম। পাঞ্জাব সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব, সামরিক গোয়েন্দা দপ্তর, সারগোদার বিভাগীয় কমিশনার আর আমার ডিসির জরুরি ফোন পেলাম। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় আমার কোর্টে যাদু মিয়ার হাজিরাসংক্রান্ত খবর আমি পড়ে দেখেছি কি না, ডিসি জানতে চাইলেন। আমি বললাম, আমি উর্দু মোটেও পড়তে জানি না। সুতরাং, ওই সব কাগজে কী লেখা হয়েছে, আমার জানা নেই। আর ইংরেজি *পাকিস্তান টাইমস* আমার হাতে পৌঁছায়নি। ডিসির কাছ থেকে যা শুনলাম তা হচ্ছে, আমার খাসকামরায় গত বিকেলে যা ঘটেছে, তার একটা রসাল বর্ণনা। অভিযোগের সুরে বলা হয়েছে, আমি বাঙালি দেখেই অপর এক অপরাধী বাঙালিকে আসামির মতো ব্যবহার না করে মহামান্য অতিথির সম্মানে তাঁকে আপ্যায়ন করেছি। অথচ এই ব্যক্তি দেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে গালাগাল করেছে এবং তাঁকে 'গাদ্দার' বলেছে। আমি ডিসিকে বললাম, এই রিপোর্ট নিতান্তই পক্ষপাতদুষ্ট। কোর্টের সময় পার হয়ে গেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা খাসকামরাতেই এ ধরনের জরুরি বিষয় নিষ্পত্তি করে থাকি। কাজেই যাদু মিয়াকে খাসকামরাতে বসানোয় ব্যতিক্রমধর্মী কিছু করা হয়নি। দ্বিতীয়ত, অভিযুক্ত কোনো দাগি খুনি আসামি নন, তিনি দেশের একজন সুপরিচিত রাজনীতিবিদ। রাজনৈতিক কারণে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সর্বোপরি, বাঙালিবিহীন টোবায় অবস্থানকারী একমাত্র বাঙালি অপর এক বাঙালি দেখে যদি কিছুটা উল্লসিত হয়, তবে তাতে দোষের কী আছে? তবে এই বিষয়ে স্থানীয় সাংবাদিকদের একদেশদর্শিতা আমাকে অনেকটাই বিমর্ষ করেছিল।

ন্যাপ টোবাতে জনসভা অনুষ্ঠান করে যে প্রক্রিয়া শুরু করেছিল, ক্রমেই তা আরও নিবিড় ও দূরদূরান্তে সম্প্রসারিত হতে লাগল। Legal Framework Order-এর অধীনে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের সংগঠন গোছানোর কাজ শুরু করল। বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে পাকিস্তান নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগ দেওয়া হলো। কমিশন পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ ও প্রাদেশিক পরিষদের আসনের সীমানা নির্ধারণ করে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল। টোবা টেক সিংয়ের ভাগে এল জাতীয় সংসদের একটি ও প্রাদেশিক পরিষদের দুটি আসন। এই সব কটি আসনের জন্যই নির্বাচন কমিশন আমাকে রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ দিল। প্রধান নির্বাচন কমিশনার দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে নির্বাচনের প্রস্তুতি সরেজমিনে দেখলেন। একপর্যায়ে তিনি টোবাতেও এলেন। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার সঙ্গে নির্বাচন পরিচালনার জন্য তিনি আমাকে কিছু পরামর্শ দিলেন। একজন মেজরের কমান্ডে দুই প্লাটুন সেনাসদস্যও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে আমাকে সহযোগিতা করবে বলেও তিনি আমাকে সাহস জোগালেন।

১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বর তিনটি আসনেই সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে এবং কারও কোনো অভিযোগ ছাড়াই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের প্রতিশ্রুতি মতো দুই প্লাটুন সেনাসদস্য পিডিবি সাব-স্টেশনের মাঠে আমার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু এত সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন হয়েছিল যে তাদের সাহায্য নেওয়ার কোনো প্রয়োজন হয়নি।

নির্বাচনের কাজ শেষ হলে পাঞ্জাব সরকার আমাদের সিএসপি সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি দিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে এই পদোন্নতি হলে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এডিসি) হিসেবে কোনো জেলায় বদলি করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানে তখন প্রতিটি জেলায় তিনটি করে এডিসির পদ অনুমোদিত ছিল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে করাচি, লাহোর, রাওয়ালপিন্ডি, পেশোয়ার আর মুলতান ছাড়া অন্য কোনো জেলায় সিনিয়র স্কেলের কোনো এডিসির পদ ছিল না; এডিসি পদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেগুলো ছিল, সেগুলো সব জুনিয়র স্কেলে। যাহোক, আমাকে মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জোন সি-এর সচিব (বেসামরিক) হিসেবে লাহোরে আর আমার অপর ব্যাচমেট এ এম এম শওকত আলীকে বাহওয়ালপুরে খাদ্য বিভাগের উপপরিচালক হিসেবে বদলির প্রস্তাব করা হয়। গেজেট হওয়ার আগে আমি জানতে পেরে শওকত আলীর সঙ্গে আলাপ করি এবং নিজেদের বদলির স্থান পরিবর্তন করে বাহওয়ালপুরের পোস্টিং নিয়ে নিই। ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারি মাসে টোবা টেক সিংয়ের বহু ঘটনার স্মৃতি বহন করে কাজে যোগ দেওয়ার জন্য বাহওয়ালপুরে রওনা হই।

ফরিদপুর থেকে পোস্ট করা একটি চিঠি টোবা থেকে রিডাইরেক্টেড হয়ে আমার হাতে মার্চের মাঝামাঝি সময়ে পৌঁছায়। এই চিঠি আমার বাবা প্রায় দেড় মাস আগে আমাকে লিখেছেন। ওপরের পেনসিলের মার্ক দেখে মনে হলো, গোয়েন্দাদের ছাড় দেওয়ার পরই এটি পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে। চিঠিতে ব্যক্তিগত কুশলাদি ছাড়া আর কোনো খবর নেই। মূলত মধ্য-ফেব্রুয়ারি থেকেই আমরা আমাদের পরিবার থেকে সম্পূর্ণ যোগাযোগবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। মার্চের প্রথম সপ্তাহে আমার সহকর্মী সুলতানের এডিসি সরকারের অনুমতি নিয়ে মাত্র এক সপ্তাহের জন্য দেশে যায়। সে ফিরে এলে তার বাসায় বসে দেশের রাজনৈতিক সংকট ও অসীম বিরাট একটা দুর্যোগের আশঙ্কায় আমরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। পূর্ব পাকিস্তানে এত কিছু ঘটে যাচ্ছে, অথচ পশ্চিম পাকিস্তানের পত্রিকা ও টিভিতে এসব নিয়ে কোনো সংবাদ নেই। পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসন অত্যন্ত চাতুর্য ও সফলতার সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের কাছ থেকে ২৬ মার্চ ও তার পরবর্তী সময়ের সব ঘটনা আড়াল করে রাখতে সক্ষম হয়।

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে সফর থেকে ফিরে দেখি, আমার সরকারি বাসভবনটি এক প্লাটুন পুলিশ ঘিরে রেখেছে। আমার অনুপস্থিতিতে এহেন ঘটনা ঘটায় আমি নানা রকম চিন্তা করতে লাগলাম। বাড়ির গেট পেরোনোর পরই হাবিলদার আমার কাছে এসে বলল, বাহওয়ালপুরের ডিআইজি পুলিশ নির্দেশ দিয়েছেন যে আমি যেন জরুরি ভিত্তিতে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। ডিআইজি একজন বিহারি পিএসপি অফিসার এবং কিছুকাল পূর্ব পাকিস্তানে চাকরিও করেছেন। আমি তাঁর বাসায় পৌঁছাতেই তিনি বললেন, পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি খুব খারাপ। ২৬ মার্চ থেকে সেখানে মিলিটারি অপারেশন শুরু হয়েছে। কিছু বিদ্রোহী বিডিআর ও পুলিশ সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং সেখানে কর্মরত কয়েকজন পশ্চিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তাননিবাসী সিএসপি কর্মকর্তাকে নৃশংসভাবে সপরিবারে হত্যা করেছে। তাঁদের মরদেহ এখন পশ্চিম পাকিস্তানে এনে পরিজনদের কাছে হস্তান্তর করা হচ্ছে। এরই প্রতিক্রিয়ায় আপনাদের ওপর যেন কোনো আঘাত না আসে, সে জন্য আপনাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং আগামীকাল থেকে অফিসেও তা করা হবে। আমি তাঁকে বললাম, আমি বিভাগীয় অফিসারদের কলোনিতে বাস করি। আমার প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক আছে। তারা আমার ক্ষতি করবে বলে আমি মনে করি না। তবে পুলিশের সরব উপস্থিতি দুষ্কৃতিকারীদের উসকে দিতে পারে এবং সেটাই আমার উৎকণ্ঠার বিষয়। আপনি এই প্লাটুন প্রত্যাহার করে নিন। ডিআইজি নম্র সুরে বললেন, তিনি আমার এই অনুরোধ রাখতে অপারগ। ওপরের আদেশ তাঁকে পালন করতে হবে। তা ছাড়া বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। তবে বিভাগীয় কমিশনারের সঙ্গে তিনি আমাকে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করে দেখতে পরামর্শ দিলেন। তিনি হয়তো সমস্যাটির কোনো সুরাহা করতে পারেন।

পরে আমি কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে আমার পক্ষের যুক্তি তুলে ধরলে তিনি সরকারের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করেন। দুদিন পরই আমার বাসা থেকে পুলিশি প্রহরা তুলে নেওয়া হয়। এরপর অবশ্য আর বেশি দিন আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানে থাকতে হয়নি। পাঞ্জাব ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হয় এবং উভয় সরকারই তাদের নিজ নিজ প্রদেশের নিবাসী অফিসারদের দ্রুত ফেরত নিয়ে যেতে সম্মত হয়। পাঞ্জাব থেকে ফেরার পর আমাকে ময়মনসিংহের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসেবে বদলি করা হয়।

করাচি থেকে বিমানে শ্রীলঙ্কা হয়ে দুই ঘণ্টার ভ্রমণ প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টায় সম্পন্ন করে ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছালাম। ঢাকার রাস্তায় নেমেই পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনেকটাই আঁচ করতে পারলাম। একে একে সব আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করে তাদের কাছে মর্মন্তুদ সব ঘটনার বিবরণ বিস্তারিতভাবে শুনলাম। মনে কোনো সন্দেহ থাকল না যে অত্যন্ত সতর্কতা আর কৌশলের সঙ্গে সামনের কঠিন সময় পার করতে হবে।

আমাদের জ্যেষ্ঠ সহকর্মী মীর মোস্তাফিজুর রহমান তখন ময়মনসিংহের ডিসি। কিছু পরিবর্তনের পর দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত আমি, আমার ব্যাচমেট ফয়জুর রাজ্জাক আর প্রাদেশিক সার্ভিসের এস এ বারী—আমরা তিনজন এডিসি হিসেবে নিয়োজিত ছিলাম। সে সময় ময়মনসিংহে একজন পাঞ্জাবি এসপি পোস্টেড ছিলেন। এই অফিসার আর এডিসি বারী একযোগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ময়মনসিংহে কর্মরত সেনাব্রিগেডের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছিল। তাদের কারণে বহুবার আমাদের অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর কত বাংলাদেশি ভারতের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়েছে, তার কোনো সঠিক তথ্য নেই। তবে এ সংখ্যা ৭০ লাখ থেকে ১ কোটির মধ্যে হবে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৭ কোটি। অর্থাৎ, যেকোনো হিসাবে ৬ কোটি লোক নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দেশে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কিংবা থাকতে বাধ্য হয়। দেশে যুদ্ধকালীন অবস্থা বিরাজ করলেও জনগণকে তাদের প্রাত্যহিক কাজ সম্পাদন করতে হবে এবং তাদের রুটি-রোজগারের ব্যবস্থা যতটা সম্ভব অব্যাহত রাখতে হবে। দেশে অবস্থানরত এই বিরাট জনগোষ্ঠীর প্রশাসন দেখাটা আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। যুদ্ধ চলছে—এই অজুহাতে প্রশাসনিক কাজ বন্ধ থাকতে পারে না। এ ছাড়া সামরিক কর্তৃপক্ষ প্রায়ই বিভিন্ন লোকের বিরুদ্ধে পাকিস্তান-সমর্থক বিভিন্ন গোষ্ঠী থেকে, বিশেষ করে বিহারিদের কাছ থেকে পাওয়া অভিযোগ আমাদের দিয়ে তদন্ত করিয়ে রিপোর্ট দিতে বলত। আমাদের দায়িত্ব ছিল এসব অভিযোগ থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অব্যাহতি নিশ্চিত করে তাদের রক্ষা করা। যথেষ্ট সন্দেহ আর অবিশ্বাসের মধ্যেও অনেক ধৈর্য ও সাহস নিয়ে আমাদের এসব কাজ করতে হয়েছে এবং অনেক নিরপরাধ লোককে আমরা বাঁচাতে সক্ষম হয়েছি।

১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর দিবাগত রাতে ময়মনসিংহ জেলা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দখলমুক্ত হয়। মধ্যরাতের পর দীর্ঘক্ষণ আমরা বোমা বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ শুনতে পাই। পলায়নরত সেনাবাহিনী ময়মনসিংহের খাদ্যগুদাম এবং ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল রোডের অনেকগুলো ব্রিজ ধ্বংস করে ঢাকার পথে পাড়ি জমায়।

১৪ ডিসেম্বর জেলা জজের বাসভবনে ডিসিসহ আমরা দুই এডিসি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছি। এস এ বারী আমাদের না জানিয়ে বিহারি এসপিসহ সেনাবাহিনীর সঙ্গে ময়মনসিংহ ছেড়ে গেছেন। এক ব্রিগেড ভারতীয় সেনা প্রায় ৩০০ মুক্তিযোদ্ধাসহ ময়মনসিংহ শহরের দিকে আসছেন—এ খবর আমাদের পৌঁছানো হলো। ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে ভারতীয় জওয়ানদের জন্য তাঁবু খাটানোর ব্যবস্থা করা হলো। আর অফিসারদের জন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেস্ট-হাউস এবং কতকগুলো স্টাফ কোয়ার্টার বরাদ্দ করা হলো। সেখানেই ময়মনসিংহের ভারতীয় ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার স্থাপন করা হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতীয় সেনাবাহিনী সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে—সেই হিসেবে তারা অবমুক্ত পূর্ব পাকিস্তানের ভূখণ্ডে প্রবেশ করতেই পারে। এ বিষয়টা আমাদের ভালো না লাগলেও আমরা আপাতত মেনে নিলাম। কিন্তু যা আমাদের হতবাক করল, তা হলো পি কে ব্যানার্জি নামের এক ভারতীয় আইএএস অফিসারের উপস্থিতি। তিনি ময়মনসিংহ সার্কিট হাউসে পৌঁছেই আমাদের ডিসিকে দেখা করার জন্য সার্কিট হাউসে ডেকে পাঠালেন। প্রতিষ্ঠিত প্রটোকল অনুযায়ী, সফরকারী কর্মকর্তা সমান মর্যাদার কিংবা নিম্নপর্যায়ের হলে ডিসির অফিসে কিংবা তাঁর বাসভবনে, অথবা যেখানে ডিসি তাঁকে সময় দেবেন, সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা। শুধু ডিসির চেয়ে উচ্চ পদের কর্মকর্তারা ডিসিকে ডেকে পাঠাতে পারেন। এই আইএএস অফিসার ভিনদেশি। তাঁর ক্ষেত্রে পদমর্যাদানির্বিশেষে তাঁকে এসেই ডিসির সঙ্গে দেখা করতে হবে। তা ছাড়া ময়মনসিংহে আসা এই অফিসার কোনোক্রমেই আমাদের ডিসির চেয়ে সিনিয়র হবেন না, হলে তিনি ঢাকা সচিবালয়ে যেতেন। যাহোক, আমরা ডিসিকে পরামর্শ দিলাম যে আপনি আপনার অফিসে যান এবং সেখানে আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁকে খবর পাঠান। সৌভাগ্যক্রমে বিষয়টি আর বেশিদূর গড়াল না। ব্যানার্জি ডিসি অফিসে এসেই তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন।

১৬ ডিসেম্বর ঢাকা শত্রুমুক্ত হলে পরদিন থেকে সচিবালয়ের কাজ শুরু হলো। এক সপ্তাহের মধ্যে ডিসি ঢাকায় বদলি হয়ে গেলে স্বাধীনতাযুদ্ধের আগে কিশোরগঞ্জে মহকুমা অফিসার হিসেবে কর্মরত মুক্তিযোদ্ধা খসরুজ্জামান চৌধুরীকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হলো।

ইতিমধ্যে আমরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ক্রিয়াকাণ্ডের খবর পেতে লাগলাম। অভিযোগ পাওয়া গেল যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরির অনেক দামি সরঞ্জামাদি আর্মি-ট্রাকে করে বর্ডার পার করে ভারতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তবে আমরা যেটা চাক্ষুষ দেখতে পেলাম, তা হলো ভারতের বিদায়ী ব্রিগেডিয়ার কর্তৃক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট নতুন মার্সিডিজ গাড়িটি ভারতে পাচার করার ঘটনা। খসরুজ্জামান মুক্তিযোদ্ধা হওয়ায় আমাদের অনেক সুবিধা হয়েছিল। সে অত্যন্ত কঠিন ভাষায় এই পাচারের বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র পাঠায় এবং আনন্দের বিষয়, এ ধরনের শক্ত পদক্ষেপের ফলে গাড়িটি কয়েক সপ্তাহ পর অক্ষত অবস্থায় ফেরত পাওয়া যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খসরুজ্জামান চৌধুরী আমাদের জুনিয়র হওয়ার কারণে ময়মনসিংহে আমি আর ফয়জুর রাজ্জাকের বেশি দিন থাকা সম্ভব ছিল না। ডিসেম্বরের মধ্যেই ঢাকা সচিবালয়ে আমাদের বদলি করা হলো। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় আইএএস অফিসারও তাঁর মিশন শেষে ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাসে রিপোর্ট করার জন্য একই সময় ঢাকায় এলেন। এই অফিসার পশ্চিমবঙ্গের একজন বাঙালি এবং তাঁর সঙ্গে ইতিমধ্যে আমাদের একটা সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঢাকায় এক রেস্টুরেন্টে বিদায়ী নৈশভোজে তাঁকে দাওয়াত করে আলাপচারিতার একপর্যায়ে তাঁকে আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ভারত সরকার তাঁকে কেন ময়মনসিংহে পাঠিয়েছিল? সরাসরি উত্তর না দিয়ে ভূমিকা করে তিনি আমাদের বললেন, এত দিন তিনি যা আমাদের কাছে গোপন রেখেছেন, বিদায়ের প্রাক্কালে তা আমাদের বলে যেতে চান। তারপর তিনি অত্যন্ত নম্র সুরে এবং গুছিয়ে যা বললেন তা হলো, কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংয়ে পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্যমান ১৯টি জেলায় প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ১৯ জন আইএএস অফিসারকে মনোনীত করে বাংলাদেশের সম্ভাব্য পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্রিফ করা হয়। ওই সভায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সচিব ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন লেফটেন্যান্ট জেনারেল ব্রিফিং করেন। তাঁদের প্রাপ্ত তথ্যমতে, বিভিন্ন জেলায় কর্মরত অফিসারদের অধিকাংশই মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হবেন। প্রশাসনে সিনিয়র কর্মকর্তাদের বিরাট শূন্যতা দেখা দেবে। এমন সম্ভাব্য পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসেবে এই ভারতীয় অফিসারদেরই কিছুকাল প্রশাসন পরিচালনা করতে হতে পারে। পি কে ব্যানার্জি জানালেন যে ময়মনসিংহের বাস্তব অবস্থা দেখে তিনি খুব দ্রুত বুঝতে পেরেছিলেন, ভারতীয় এই পর্যবেক্ষণ কী পরিমাণ বাস্তবতা-বিবর্জিত ছিল। তিনি অক্ষত অবস্থায় প্রশাসনের কাজে নবোদ্যমে আমাদের সম্পৃক্ত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে সবার মঙ্গল কামনা করে বিদায় নিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্মজীবন : সচিবালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাস। সচিবালয় থেকে মাঠপর্যায় পর্যন্ত সর্বত্রই তখন প্রশাসন গুছিয়ে কাজকর্ম স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া চলছে। সংস্থাপন বিভাগের একজন উপসচিব ময়মনসিংহে আমাকে টেলিফোনে দ্রুত ঢাকায় এসে তদানীন্তন সংস্থাপনসচিব নূরুল কাদের খানের সঙ্গে দেখা করার বার্তা পৌঁছালেন। আমি তাঁকে বললাম, এটা যদি আমার বদলির আদেশ হয়, তবে এর একটা বিজ্ঞপ্তি আমার দরকার, যাতে নিয়মমাফিক আমি তখনকার দায়িত্বভার ত্যাগ করে ঢাকায় নতুন কাজে যোগদান করতে পারি। আমাকে বলা হলো, এসব নিয়ম পরে রীতিসিদ্ধ করা হবে। আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঢাকায় এসে সচিবের সঙ্গে দেখা করুন।

পরদিন সকালের ট্রেনে ঢাকা পৌঁছেই সচিবালয়ে যাই। সচিবের দপ্তরে গিয়ে জানতে পারলাম, জরুরি কাজে তিনি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে গেছেন। বিকেল চারটার পর তাঁর দেখা পাওয়া যাবে। বেশ কিছুটা সময় হাতে পেয়ে সচিবালয়ের বিভিন্ন দপ্তরে আমার পরিচিতদের মধ্যে কে কোথায় কীভাবে আছেন, দেখতে এক ভবন থেকে আরেক ভবনে ঘুরতে বেরিয়ে পড়লাম। সচিবালয়ের সব কটি ভবনের সব করিডরেই বিভিন্ন বয়সের দর্শনার্থীদের অসম্ভব ভিড়। তবে এঁদের মধ্যে নবীনদের সংখ্যাই বেশি। এঁদের অনেকেরই ঘাড়ে ঝোলানো এলএমজি দেখে অনুমান করলাম যে এঁরা মুক্তিযোদ্ধা। এই ভিড়ের মিছিলে অন্যান্য বয়সের লোকদের সংখ্যাও কম ছিল না। এঁদের হাতে সযত্নে ধারণকৃত স্ফীতাকার ফাইল ও কাগজপত্র দেখে মনে হলো, এঁরা বিভিন্ন দপ্তর, মন্ত্রণালয় কিংবা সংস্থার লোক কিংবা মুজিবনগর-প্রত্যাগত মুক্তিযোদ্ধা, যাঁরা সুবিধাজনক পোস্টিং, পদোন্নতি কিংবা নতুন চাকরির আশায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভিন্ন মহলে দেনদরবারে ব্যস্ত আছেন। আগে কখনো এমন পরিস্থিতি চোখে পড়েনি; কবে যে এখানকার পরিবেশ স্বাভাবিক হয়ে আসবে, এই চিন্তা কিছুটা হলেও মনে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করল।

অবশেষে বিকেল পাঁচটায় সংস্থাপনসচিব নূরুল কাদের খানের দেখা পেলাম। দু-এক কথার পর তিনি আমাকে জানালেন যে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর পিএস হিসেবে আমাকে প্রাথমিকভাবে মনোনীত করেছেন। আমার সঙ্গে কথা বলে কালই এ নিয়োগ চূড়ান্ত করা হবে। সচিব আগামীকাল সকালে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ দিলেন।

এ ধরনের একটা পরিস্থিতির জন্য আমি আদৌ মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম না। নানা কারণে পিএসের কাজ আমার আদৌ পছন্দের নয়। এই পদের অনেক বাহ্যিক সুবিধা আছে; কিন্তু এখানে নীতিনির্ধারণী কিংবা উন্নয়ন প্রশাসন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কাজের কিছুই শেখা যায় না। এর আগেও পাঞ্জাবে লেফটেন্যান্ট জেনারেল এম আতিকুর রহমানের সচিব হিসেবে আমাকে মনোনীত করা হয়েছিল। কিন্তু আমার ব্যাচের শওকত আলীর সঙ্গে বদলি বিনিময় করে আমি সে যাত্রা পার পেয়েছিলাম। কিন্তু এবারের পরিস্থিতি ভিন্ন। এখানে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত একজন জাতীয় নেতা, যিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রধান সংগঠক এবং বর্তমানে দেশের প্রধানমন্ত্রী, তাঁর পিএস নিয়োগের প্রশ্ন বলেই যত সমস্যা। তবে সচিবালয়ের বিভিন্ন করিডরে এলএমজিসহ মুক্তিযোদ্ধাদের সরব উপস্থিতি এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে দেশে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে একজন রাজনৈতিক ব্যক্তির একান্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে আমি কতটা সফল হতে পারব, সেটাও গভীর চিন্তার বিষয়। এই দিকটাই তুলে ধরে আমি বিনীতভাবে সচিবকে বললাম, স্যার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হয়তো জানেন না যে মুক্তিযুদ্ধকালে আমি দেশেই ছিলাম। বর্তমান সময়ে সচিবালয়ে রাজনৈতিক নেতাদের কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের আনাগোনাই বেশি দেখতে পাচ্ছি। আমি একজন অমুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এঁদের কীভাবে এবং কতটা সামাল দিতে পারব, এটা আমার কাছে সমস্যা বলে মনে হচ্ছে। আমাকে এই ধরনের স্পর্শকাতর পদে নিয়োগের জন্য বিবেচনা না করলেই ভালো হয়। উত্তরে সচিব বললেন, আমরা মন্ত্রণালয় থেকে কারও নাম সুপারিশ করে পাঠাইনি। প্রধানমন্ত্রী তোমাদের ব্যাচ ও পরের ব্যাচের সিএসপি অফিসারদের তালিকা, এসিআর আর জীবনবৃত্তান্ত চেয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি তিনজনকে শর্টলিস্ট করেছেন। তোমার নাম সবার ওপরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে। তোমার অসুবিধার কথা আমি বুঝি। তুমি আমাকে যা বলেছ, প্রধানমন্ত্রীকেও তা-ই বলো। উনি হয়তো তোমার অসুবিধার কথা বিবেচনা করতে পারেন।

অনেক উৎকণ্ঠা নিয়ে পরদিন সকালে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে উপস্থিত হলাম। একজন পিএস না থাকায় তাঁর কাজের অসুবিধা হচ্ছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী দ্রুত আমাকে কাজে যোগদান করতে বললেন। আমি সাহসে ভর করে আমাকে এই পদে বিবেচনা না করার জন্য আমার যুক্তি গুছিয়ে তাঁর সামনে তুলে ধরলাম। তিনি সোজা আমার দিকে চোখ রেখে বললেন, না, আপনি যদি এই কাজে অসুবিধা বোধ করেন, তবে আমি জোর করব না। সঙ্গে সঙ্গে লাল টেলিফোন তুলে সংস্থাপনসচিবকে ফোন করে বললেন, এই অফিসারের এখানে কাজ করতে কিছু অসুবিধা আছে, যা আমি আগে ভেবে দেখিনি। তবে এই অফিসারটিকে আমার ভালো মনে হয়েছে। ওকে তুমি ভালো একটা পোস্টিং দাও। আমার আচরণে তাজউদ্দীন আহমদ বিরক্ত না হয়ে আমাকে একটা ভালো পোস্টিং দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে তিনি যে মহানুভবতার পরিচয় দিলেন, তা আমার চিরকাল মনে থাকবে। নূরুল কাদের খান আমাকে সংস্থাপন বিভাগেই উপসচিব হিসেবে পোস্টিং দিলেন। এভাবেই স্বাধীন বাংলাদেশের সচিবালয়ে আমার কর্মজীবন শুরু হলো।

সংস্থাপন বিভাগ প্রশাসনের স্নায়ুকেন্দ্র। প্রশাসনের কাঠামো, সরকারি চাকরিকাঠামো, জনবল নিয়োগ ও তাদের প্রশাসন, বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের পদায়ন ইত্যাদি মানবসম্পদ-সংক্রান্ত সব কাজই এখানে নিষ্পন্ন করা হয়। দক্ষ, সৎ ও কর্মঠ মানবসম্পদ উন্নয়ন, তাদের মনোবলের উজ্জীবন এবং উন্নয়ন প্রশাসনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এদেরই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। প্রশাসনিক সংগঠন ও কর্মী ব্যবস্থাপনায় যেকোনো ধরনের অনাচার, বৈষম্য কিংবা পক্ষপাতিত্ব কর্মীদের হতোদ্যম করে, তাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং ফলে দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়।

প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের প্রশাসনব্যবস্থাকে বাংলাদেশের বিদ্যমান প্রশাসনব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের জন্য একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ ছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন দেশে কর্মরত কর্মকর্তা এবং পাকিস্তানে আটকে পড়া প্রত্যাগত বাঙালি সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের ভবিষ্যৎ কী হবে, এ সম্পর্কে সরকারের একটা দৃঢ় সিদ্ধান্তের প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরি ছিল। যাঁরা মুজিবনগর সরকারে যোগদান করেননি এবং দেশে কিংবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তানে থেকে দায়িত্ব পালন করা থেকেও বিরত হননি, বাংলাদেশের প্রতি তাঁদের আনুগত্য কিংবা দেশপ্রেম নিয়ে সরকারের বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকলে সামরিক ও বেসামরিক এসব কর্মকর্তাকে চাকরি থেকে খারিজ করে দেওয়াই যথার্থ ছিল। যুদ্ধকালীন বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসে নিয়োগ পাওয়া কর্মকর্তাদের নিয়োগ এবং ওই সময়ে গৃহীত সমুদয় পাবলিক পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত এই ধরনের একটা মনোবৃত্তিরই পরিচয় বহন করে।

তবে এসব বিষয়ে সরকারের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে পরস্পরবিরোধিতা, মতৈক্যের অভাব ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর একটি সুদৃঢ় ভিত্তির রূপকল্প নির্মাণে ব্যর্থতার কারণে সরকার কোনো ধরনের কঠিন কার্যক্রম থেকে সরে আসে। তথাকথিত অমুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্যের প্রত্যয়ন নিয়ে তাঁদের চাকরিতে বহাল রাখা ঠিক হলেও চাকরিকাঠামো, কর্মকর্তাদের পদোন্নতি ও পদায়ন, তাঁদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা এবং বিভিন্ন সার্ভিস ও এগুলোর শ্রেণীবিন্যাস নিয়ে এমন সব নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, যা বহুদিনের তিলে তিলে গড়ে ওঠা বিভিন্ন সার্ভিসের সততা, নিষ্ঠা, দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে ধূলিসাৎ করে প্রশাসনকে এক পঙ্কিল আবর্তে নিমজ্জিত করে। ওই সময় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব বহুধারায় সম্প্রসারিত হয়ে এমন এক হতাশাব্যঞ্জক ও নৈরাজ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি করেছে, যা থেকে উঠে আসতে হলে এমন এক মহান নেতার আবির্ভাব হতে হবে, যিনি কোনো ধরনের অনুরাগ কিংবা বিরাগের বশবর্তী না হয়ে দীর্ঘ সময় ধরে সব পর্যায়ে কঠিন ও মৌলিক প্রশাসনিক সংস্কার কার্যক্রম সব ধরনের বাধা উপেক্ষা করে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবেন।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ পাকিস্তানি সেনাদের বর্বরোচিত হামলার পরিপ্রেক্ষিতে যেসব কর্মকর্তা ভারতে আশ্রয় নিয়ে পরে মুজিবনগর সরকারে যোগদান করেন, তাঁদের প্রায় সবাই তখন মাঠপর্যায়ের বিভিন্ন পদে কর্মরত ছিলেন। সিএসপি, পিএসপি কিংবা প্রাদেশিক সিভিল কিংবা পুলিশ সার্ভিসের এসব অফিসার ডিসি, এসপি, এডিসি, এসডিও কিংবা ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োজিত ছিলেন। সিএসপিদের সবাই চাকরি ও বয়সে নবীন ছিলেন। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে এঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতম কর্মকর্তার চাকরির বয়স হয়েছিল মাত্র ১২ বছর। মুজিবনগরে পুলিশ সার্ভিস ও ফরেন সার্ভিসের দু-একজন ছাড়া আর কোনো জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা না থাকায় এঁরা অনেকেই সচিব পদে নিয়োগ লাভ করেছিলেন। মুজিবনগর সরকার ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এঁরা যুদ্ধকালীন বাংলাদেশে কর্মরত এবং পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত হাজার হাজার কর্মকর্তার মুখোমুখি হন।

যেহেতু সরকার তথাকথিত অমুক্তিযোদ্ধাদের বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্যের প্রত্যয়নে স্বাক্ষর করার শর্তে চাকরিতে বহাল রাখে, সরকারের অনিচ্ছা সত্ত্বেও কার্যত স্বাধীনতা-পূর্বের চাকরিসংক্রান্ত নিয়মনীতি অপরিবর্তিত থেকে যায়। নতুন সরকারের বিভিন্ন পদে পদায়নকালে আগের নিয়মে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদায়ন কাঙ্ক্ষিত ছিল। সরকার তা না করে এস এম সফিউল আজম, এ কে এম আহসান, এম কেরামত আলী কিংবা মফিজুর রহমানের মতো জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের বসিয়ে রেখে কিংবা অপেক্ষাকৃত নিম্নপদ থেকে বদলি না করে মুজিবনগর থেকে প্রত্যাগত চারজন সিএসপি অফিসারকে মন্ত্রিপরিষদ সচিবসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে নিয়োগ দান করে। এঁদের চাকরির সময়সীমা অনুযায়ী এঁদের কেউ কেন্দ্রীয় সরকারের যুগ্ম সচিব পদে পদোন্নতিরও যোগ্যতা অর্জন করেননি। তা ছাড়া এঁদের কারোরই সচিবালয়ে কাজের তেমন কোনো অভিজ্ঞতাও ছিল না। তাঁদের পোস্টিং নিয়ে শুধু যে সিএসপি ক্যাডারের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে, তা নয়, ফরেন সার্ভিস ও পুলিশ সার্ভিসেও এহেন পদায়নের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সচিবের মাত্র একটি পদ। অথচ ফরেন সার্ভিসের বহু কর্মকর্তা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা এনায়েত করিম ২০ বছর চাকরি পূর্তির পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। অপর সিনিয়র কর্মকর্তা ও মুক্তিযোদ্ধা শাহ এ এম এস কিবরিয়া ১৮ বছর চাকরি পূর্তির পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিবের সমতুল্য) পদে নিয়োজিত হন। তাঁরাও এত স্বল্প মেয়াদের চাকরির রেকর্ড নিয়ে তিন ধাপ ডিঙিয়ে এসব জুনিয়র সিএসপি অফিসারকে সচিব হিসেবে নিয়োগ সমর্থন করেননি। ২১ বছর চাকরির গৌরবোজ্জ্বল রেকর্ডধারী পুলিশের আইজি হিসেবে নিয়োজিত একজন মুক্তিযোদ্ধা পিএসপি অফিসার এ ধরনের বৈষম্যমূলক পদোন্নতিতে এতটা ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন যে, তাঁর আবেদন করা সরকারি বাসভবনটি মন্ত্রিপরিষদ সচিবের অনুকূলে বরাদ্দ করা হলে পুলিশ দিয়ে তিনি ওই সচিবের মালপত্র বাইরে নিক্ষেপ করেন।

জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ দু-চারটি মন্ত্রণালয়ে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের নিয়োগ জরুরি বিবেচনা করা হলে তাঁদের যুগ্ম সচিব হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বাদে অন্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করা যেত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকারের রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী সচিব, অতিরিক্ত সচিব কিংবা যুগ্ম সচিব মন্ত্রণালয় কিংবা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত হতে পারেন। পাকিস্তান আমল থেকেই সিএসপি ক্যাডারের বিরুদ্ধে অন্য কয়েকটি ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মধ্যে চাকরির সুযোগ-সুবিধা নিয়ে অসন্তোষ বিরাজ করছিল। এতৎসত্ত্বেও উচ্চতর প্রশাসনে নিয়োজিত বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মকর্তারা প্রশাসনের লক্ষ্য, কর্মকাণ্ড ও অর্জনকে একটি সম্মিলিত একক প্রচেষ্টা হিসেবে দেখেছেন এবং সেভাবেই সবাই মিলে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন। মুজিবনগর-প্রত্যাগত সিএসপি অফিসারদের সচিব পদে পুনর্বহাল এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। ক্যাডারে ক্যাডারে চাপা অসন্তোষ শুধু যে প্রকাশ্যে বিস্ফোরিত হয়, তা-ই নয়, সিএসপি ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মধ্যে কিংবদন্তিপ্রতিম যে মেলবন্ধন ছিল, তা অপ্রতিরোধ্য ভাঙনের মুখে পড়ে। রাষ্ট্রের লক্ষ্য অর্জনে ঐক্যবদ্ধ প্রশাসনযন্ত্র সদস্যদের নিজ নিজ বিবেচনা ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য বহু গোত্র-উপগোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

মুক্তিযোদ্ধা সিএসপি অফিসারদের সচিব পদে পদায়নের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার রেশ কাটতে না কাটতেই সরকার মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের পক্ষে আরেক নজিরবিহীন পদক্ষেপ নেয়। দেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁদের নিজস্ব ক্যাডার, সার্ভিস, দপ্তর কিংবা সংস্থার পদে দুই বছরের ভূতাপেক্ষ জ্যেষ্ঠতা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। চাকরিতে জ্যেষ্ঠতা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে অর্জন করতে হয় এবং মানসম্পন্ন কাজের ধারাবাহিকতায় তা বহাল রাখতে হয়। একজন কর্মকর্তা যেমন নিজ গুণে তাঁর জ্যেষ্ঠতা অর্জন করেন, তেমনি শুধু নিজ দোষে তাঁর জ্যেষ্ঠতা হারাতে পারেন। অর্থাৎ তাঁর কাজের মান সন্তোষজনক না হলে কিংবা তিনি কোনো গুরুতর অভিযোগে শাস্তিপ্রাপ্ত হলেই শুধু তাঁকে অতিক্রম করে তাঁর চেয়ে কনিষ্ঠ কর্মকর্তাকে তাঁর ওপর জ্যেষ্ঠতা প্রদান করা যেতে পারে। এ ছাড়া আর কোনো অবস্থাতেই চাকরিতে কারও পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা ক্ষুণ্ন করা যায় না। আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোয় বিভিন্ন যুদ্ধে অবদান রাখার জন্য কীর্তিমান ব্যক্তিদের বিভিন্ন মানের খেতাব, নগদ অর্থ কিংবা বিনা মূল্যে জমি বরাদ্দের নজির আছে। কিন্তু ভূতাপেক্ষ জ্যেষ্ঠতা দেওয়ার কোনো উদাহরণ নেই। আমাদের দেশেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য অনেক চাকরিজীবী কর্মকর্তাকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সম্মাননায় ভূষিত করা হয়। এঁদের কাউকে তো চাকরিতে ভূতাপেক্ষ জ্যেষ্ঠতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেওয়ার কথা কেউ কখনো কল্পনাও করেনি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শুধু দুজন সিএসপি অফিসার—খোরশেদ আলম এবং ড. এস এ সামাদ ছাড়া আর কোনো তৃতীয় ব্যক্তি এহেন একটি অযৌক্তিক সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে এই জ্যেষ্ঠতা বর্জন করার ইচ্ছা পর্যন্ত প্রকাশ করেননি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, সংশ্লিষ্ট সবাই মিলেজুলেই এই অপ্রত্যাশিত সুবিধা পাওয়ার কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। সচিব পদে পদায়নে উচ্চতর প্রশাসনে যে অসন্তোষ আর বিভাজনের বীজ বপন করা হয়েছিল, দুই বছরের ভূতাপেক্ষ জ্যেষ্ঠতার নীতি তা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে প্রশাসনের সর্বস্তরে ব্যাপ্ত হয়ে সমগ্র প্রশাসনকে একটা মধ্যযুগীয় করদ-রাজ্যে পরিণত করে। প্রতিষ্ঠিত ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রশাসনিক পদ্ধতি ও আচার-আচরণ নয়—সদ্য স্বাধীনতা পাওয়া দেশের নব্য ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা কাকে কীভাবে কী সুবিধা প্রদান করতে পারেন এবং বিভিন্ন কৌশলে কে কতটা সুবিধা আদায় করে নিতে পারেন, সেসব বিবেচনাই প্রশাসন পরিচালনার মানদণ্ডে পরিণত হয়।

ওপরে বর্ণিত হঠকারী সিদ্ধান্তগুলো শুধু যে মুজিবনগর-প্রত্যাগত কর্মকর্তাদের উদ্যোগে গ্রহণ করা হয়, তা নয়। এর পেছনে সদ্য স্বাধীনতা পাওয়া দেশের নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্বেরও পূর্ণ সমর্থন ছিল। পাকিস্তান আমল থেকেই বিরোধীদলীয় রাজনীতিকেরা, বিশেষ করে আওয়ামী লীগ নেতাদের অনেকেই, সামগ্রিকভাবে আমলাতন্ত্র এবং বিশেষভাবে সিএসপি অফিসারদের সম্পর্কে একধরনের বিরূপ মনোভাব পোষণ করে আসছিলেন। অবশ্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে বেশ কিছু সিএসপি অফিসার ছাত্রজীবনে বিরোধীদলীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন কিংবা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তিনজন জ্যেষ্ঠ সিএসপি অফিসার সহ-অভিযুক্ত থেকে শেষ সময় পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কারাগারে ছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ও বিচ্ছিন্ন এসব যোগাযোগ আমলাতন্ত্রের প্রতি তাঁদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে কোনো প্রভাব রাখেনি। আমলাতন্ত্রের সদস্যরা রাষ্ট্রের কর্মচারী এবং যাঁরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন, তাঁদের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি বিশ্বস্ততার সঙ্গে বাস্তবায়ন করাই এসব কর্মচারীর দায়িত্ব। আবার বিরোধী দল যখন ক্ষমতায় আসীন হবে, তখন একইভাবে আমলাতন্ত্র তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করবে। এটাই মেধাভিত্তিক নিরপেক্ষ আমলাতন্ত্রের কৃষ্টি ও ধর্ম। আমলাতন্ত্রকে এভাবে না দেখে এটিকে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিত্রিত করা হয় এবং এর সদস্যদের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীন মতামত প্রকাশের প্রবণতাকে ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক আদর্শ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিষ্ঠার পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হিসেবে প্রতিনিয়তই তুলে ধরা হতে থাকে। শক্তিশালী আমলাতন্ত্র যত নিরপেক্ষই হোক না কেন, তা দলীয় রাজনৈতিক দর্শনের পরিপূরক নয়। এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করে একে বশে আনার ইচ্ছা ক্রমান্বয়ে একটি রাজনৈতিক কৌশলে পরিণত হয়। আমলাতন্ত্রকে ক্ষমতাসীন রাজনীতিকদের পছন্দমতো ঢেলে সাজানোর একটা সুযোগ এনে দেয় মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা।

এই ইচ্ছা পূরণের প্রথম শিকার সিএসপি ক্যাডার। ১৯৭২ সালে এক নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে এই ক্যাডারকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। সিএসপি ক্যাডারটি পাকিস্তানের তদানীন্তন মন্ত্রিসভার একটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবমূলে সৃষ্টি করা হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার The Laws Continuance Enforcement Order জারিপূর্বক ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বা তৎপূর্বে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে যেসব আইন ও বিধিবিধান চালু ছিল, সেগুলো বহাল রাখার সিদ্ধান্ত প্রদান করে। একইভাবে বিদ্যমান সব কর্মকর্তা-কর্মচারী, যাঁরা সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের প্রতি তাঁদের আনুগত্যের অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করেছেন, তাঁরা বিদ্যমান চাকরির শর্তাবলিসহ চাকরিতে বহাল থাকবেন। এ অবস্থায় মন্ত্রিপরিষদে সিএসপি ক্যাডারসম্পর্কিত কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়া যেকোনো ধরনের নির্বাহী আদেশ অবৈধ ছিল।

চাকরিকাঠামো ঢেলে সাজানোর বিষয়টি কিন্তু সিএসপি ক্যাডার বিলুপ্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল না। যেখানে কেন্দ্রীয় সার্ভিসের অনুরূপ প্রাদেশিক ক্যাডার বিদ্যমান ছিল, সেগুলোকে একীভূত করা ছিল পরবর্তী পদক্ষেপ। এই প্রক্রিয়াতে সিএসপিকে পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের সঙ্গে একীভূত করা হলো। বিষয়টি এ পর্যন্ত টেনেহিঁচড়ে একটা স্থিতাবস্থায় নিয়ে এলে অনেকের কাছেই এটা গ্রহণযোগ্য ও সহনীয় হতো। কিন্তু ইপিসিএস (জুনিয়র) এবং অন্যান্য দ্বিতীয় শ্রেণীর নন-টেকনিক্যাল পদে কর্মরত বেশ কিছু কর্মকর্তা চাকরিকাঠামো সংস্কারের হযবরল অবস্থার সুযোগে তাঁদের পদকেও প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে অনুপ্রবেশের জন্য ব্যাপক তৎপরতা শুরু করেন। এঁদের কেউ কেউ আবার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠজন। তাঁরা দেশকে স্বাধীন করেছেন আর তাঁদের আত্মীয়-পরিজনেরা এ দেশের মাটিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর পদে বিচরণ করবেন, এটা তো হতে পারে না! প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যা তাঁরা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, মুরব্বিদের প্রচ্ছন্ন সমর্থনে তা তাঁদের আয়ত্তে এসে গেল। এসব দ্বিতীয় শ্রেণীর পদকে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করে তাঁদের সবাইকে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারভুক্ত করা হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে প্রক্রিয়াতে কোনো প্রকার মান নির্ধারণ ব্যতিরেকে এবং যাচাই-বাছাই না করে এসব কর্মকর্তাকে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে আত্তীকৃত করা হয়, তাতে এই সার্ভিসটিকে 'সরকারের আঁতুরাশ্রয়' বললে অত্যুক্তি হবে না। আত্মীয়-পরিজনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য খুবই সীমিত আকারে এ ধরনের আত্তীকরণ বিসিএস (ফরেন) ক্যাডারেও করা হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে আত্তীকৃত কর্মকর্তারা অন্তত পাকিস্তান আমলে সেন্ট্রাল ইনফরমেশন সার্ভিস, সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস কিংবা পাকিস্তান মিলিটারি ল্যান্ড অ্যান্ড ক্যান্টনমেন্ট ক্যাডারভুক্ত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা ছিলেন।

আমার মনে আছে, আমি যখন বাগেরহাটে এসডিও হিসেবে কর্মরত ছিলাম, তখন থানার সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) ও সার্কেল অফিসার (রাজস্ব) (যথাক্রমে টিএনও এবং এসি ল্যান্ডের পূর্বসূরি) ইপিএস (জুনিয়র) ক্যাডারভুক্ত কিংবা নিম্নতর পদ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পদোন্নতি পাওয়া কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে নিয়োজিত হতেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই বয়সে নবীন এবং উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। তাঁদের আমি জিজ্ঞেস করতাম, এই চাকরিতে তাঁদের প্রত্যাশা কী? বেশির ভাগেরই উত্তর ছিল, তাঁরা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের পদ থেকে অবসরে যেতে পারলে খুশি হবেন। আর দু-একজন কর্মকর্তার স্বপ্ন ছিল প্রাদেশিক সরকারের উপসচিব হিসেবে চাকরিজীবন শেষ করার।

স্বাধীনতার সন্ধিক্ষণে প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত নন-টেকনিক্যাল দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের সংখ্যা সহস্রাধিক ছিল। এঁদের সঙ্গে সিএসপি এবং ইপিসিএস ক্যাডারের কর্মকর্তারা যুক্ত হওয়ার ফলে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের এন্ট্রি লেভেল প্রথম শ্রেণীর পদসংখ্যা রাতারাতি পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পায়। অথচ পদসোপানের বিভিন্ন উচ্চতর পদে পদসংখ্যা খুব একটা বাড়েনি এবং বাড়ানো সম্ভবও ছিল না। ফলে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তারা যেমন একই পদে ১৫-২০ বছর চাকরি করেও পদোন্নতির মুখ দেখতে পান না; তেমনি নানা প্রশাসনিক জটিলতার কারণে এঁদের মধ্য থেকে অপেক্ষাকৃত মেধাবী কর্মকর্তা বাছাই করে তাঁদের দ্রুত পদোন্নতি প্রদানও সম্ভব হচ্ছে না। এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে গিয়ে সরকার যে কৌশল অবলম্বন করছে, তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য শুধু হতাশাব্যঞ্জকই নয়, অসম্মানজনকও বটে। একই পদে তাঁদের *in situ* পদোন্নতি দিয়ে শুধু বেতনের সুবিধা দেওয়া হয়। ফলে পদোন্নতির আসল মর্যাদা আর সন্তুষ্টি তাঁরা পান না। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের এমন সব *ex cadre* পদে বদলি করা হয়, যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁদের পদমর্যাদার সঙ্গে আদৌ সংগতিপূর্ণ নয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর পদকে ঢালাওভাবে কোনো সমীক্ষা কিংবা পর্যালোচনা ছাড়া প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করার ফলে এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। অথচ বিভিন্ন টেকনিক্যাল সার্ভিসে পাকিস্তান আমল থেকে প্রচলিত দ্বিতীয় শ্রেণীর পদগুলোকে আগের মতোই সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর এন্ট্রি লেভেল পদে পদোন্নতিপ্রাপ্তদের জন্য কোটা সংরক্ষণ করে তাদের সংখ্যা সীমিত করার কৌশল ওই সব সার্ভিসের সব সদস্যের জন্য একটা সার্বিক কর্মজীবনগত পরিকল্পনা প্রণয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

বিভিন্ন সার্ভিসের চাকরির কাঠামোতে আমূল পরিবর্তনের ফলে একটা নতুন আমলাতান্ত্রিক বৃত্তের সূচনা হয়। এত দিনের সযত্নে লালিত আন্তসার্ভিস সম্পর্ক ও ভারসাম্য বিক্ষিপ্ত হয়ে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়, যার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তাৎক্ষণিকভাবে কারও কাছেই সুস্পষ্ট ছিল না। প্রশাসনকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে দলীয় রাজনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা আমলাতন্ত্রের জন্য সব সময়ই একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল। এত কিছু প্রশাসনিক পরিবর্তন প্রশাসনকে রাজনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার প্রত্যয়কে অনেকটাই স্তিমিত করে দিল। নিয়োগ, পদোন্নতি ও চাকরির বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় যে মেধা ও দক্ষতার প্রমাণ দিয়েও রাজনৈতিক পরিচয়ের অভাব পূরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

সরকারি কর্মকর্তাদের চাকরিজীবন কখনোই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না; কিন্তু এখন তা নিঃসন্দেহে কণ্টকাকীর্ণ। আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন গণমাধ্যমে এঁরা অদক্ষ, অসৎ, কর্তব্যবিমুখ, সর্বোপরি গণবিরোধী—এ ধরনের এন্তার অভিযোগ প্রতিনিয়ত আনা হয়। রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের মধ্যেও এর সরব প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এসব অভিযোগের অনেকগুলোর মধ্যে অনেক সত্যতাও খুঁজে পাওয়া যায়। তবে বিবেচনার বিষয় এই যে, এসব কথিত দুষ্কর্মের জন্য সরকারি কর্মচারী কতটুকু দায়ী? সে কি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিধিবিধান অনুসরণ করে তাঁর কাজটি করতে পেরেছে, নাকি বাইরের কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির অন্যায় চাপের মুখে কাজটি করে সব দোষের দায় তাকে বহন করতে হচ্ছে? বিভিন্ন প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে প্রশাসন আর রাজনীতির দায়দায়িত্ব কী? সরকারি কর্মচারীরা দলীয় বিবেচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকলে কে তাঁদের এ কাজে প্রলুব্ধ কিংবা বাধ্য করেছে? প্রশাসনের দক্ষতা, সততা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে কথা বলতে হলে সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ করে তা করতে হবে। তা না হলে ভিত্তিহীন অভিযোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড়জোর রাজনৈতিক বক্তব্য হিসেবেই পরিগণিত হবে এবং প্রশাসন যে ধরনের মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে, তা নিরাময়ের সঠিক পদ্ধতি নিরূপণ করা সম্ভব হবে না।

প্রশাসনের দলীয়করণ অবশ্যই একধরনের রাজনৈতিক অপসংস্কৃতি, যা পরিহারের জন্য সবারই দৃঢ় অঙ্গীকার প্রয়োজন। তবে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত শুদ্ধ প্রশাসন একধরনের অলীক কল্পনা, যা আদৌ বাস্তবসম্মত নয়। প্রশাসন শূন্যতার মধ্যে কাজ করে না—একটা পরিমণ্ডলের মধ্যে বিরাজমান বিভিন্ন অনুষঙ্গের সঙ্গে সার্বিক সমন্বয়ের মাধ্যমে তাকে কাজ করতে হয়। রাজনীতি, রাজনৈতিক দল ও কর্মী—প্রশাসনের অতি ঘনিষ্ঠ স্বার্থসংশ্লিষ্ট অনুষঙ্গ, যাদের সদস্যরা বিভিন্নভাবে প্রতিনিয়ত প্রশাসনের বিভিন্ন কাজে প্রভাব বিস্তার কিংবা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে থাকে। রাজনৈতিক বিভিন্ন চাহিদার অযৌক্তিকতা, আতিশয্য কিংবা অবিমৃশ্যকারিতাকে প্রশাসনিক যুক্তিবাদিতার নিরিখে যতটা সম্ভব যৌক্তিক ও সব পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য করার মধ্যেই প্রশাসনের কৃতিত্ব।

যৌক্তিকীকরণের কাজে প্রশাসন পরিমণ্ডলের মৌলিক অনুষঙ্গ—প্রাথমিক সংগঠন—সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং যেকোনো ব্যক্তির চাকরিজীবন ও জগৎ এসব সংগঠন ঘিরেই আবর্তিত হয়। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে চলার পথে আমার সহযাত্রী ছিলেন অসংখ্য মানুষ—তাঁদের কেউ আমার কয়েক প্রজন্ম আগের, অনেকেই আমার সমসাময়িক, আবার কেউ কেউ সাম্প্রতিক কালের অর্থাৎ নতুন প্রজন্মের। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন আমার অধিকর্তা, অধিকাংশই আমার অধীন আর বাকিরা সবাই একই কাতারে আমার সহকর্মী। তবে তাঁদের সবারই একটি সাধারণ পরিচয়—তাঁরা সবাই বিভিন্ন সার্ভিস ও পদে নিয়োজিত প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী কিংবা রাজনৈতিক নেতা। একেকটা দপ্তরে এরকম কয়েকজনকে নিয়েই একেকটি প্রাথমিক সংগঠনের সৃষ্টি, যাঁদের সবাই সংগঠনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকার ও জনগণের কাছে দায়বদ্ধ। কিন্তু সংগঠনের সব মানুষই একরকম হয় না। দেশের বৃহত্তর সমাজ যেমন মেধাবী, বুদ্ধিদীপ্ত, নীতিবান ও প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের পাশাপাশি নীতিজ্ঞানহীন, স্বার্থপর, অসৎ, পরশ্রীকাতর, কুটিল ও কর্তব্যবিমুখ লোকের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে—প্রাথমিক সংগঠনেও এর অতি ক্ষুদ্রাকার প্রতিফলন কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। আমাদের চাকরিজীবনে নানা উত্থান-পতনের অন্যতম কারণ প্রাথমিক সংগঠন পর্যায়ে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ব্যক্তিদের উপস্থিতি এবং তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি, পছন্দ-অপছন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত ও অন্যায্য হলেও, আমাদের ওপর তা প্রয়োগের ক্ষমতা।

১৯৭২-এর জানুয়ারি থেকে ১৯৭৫-এর জানুয়ারি এবং পরে ১৯৭৯-এর অক্টোবর থেকে ১৯৮১-এর জুন পর্যন্ত আমি সংস্থাপন বিভাগ (১৯৭৫-এর পর মন্ত্রণালয়ের) উপসচিবের দায়িত্ব পালন করি। প্রথম দফায় আমার দায়িত্ব ছিল বিভিন্ন সার্ভিস ও গেজেটেড পদে নিয়োগ এবং সরকারি কর্মকমিশন-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াবলি; সব ধরনের প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ একাডেমি-সংক্রান্ত বিষয়াবলি; সরকারি মুদ্রণালয় ও স্টেশনারি বিভাগ-সম্পর্কিত বিষয়াবলি এবং সরকারের সাধারণ প্রশাসন ও সেবাসম্পর্কিত নীতিনির্ধারণী বিষয়াবলি। আর দ্বিতীয় দফায় দায়িত্ব ছিল সরকারি ও সংস্থাগুলোর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের পদায়ন, পদোন্নতি ও এসব কর্মকর্তার চাকরিসংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়াবলি।

সংস্থাপন বিভাগে প্রথম দফায় উল্লেখযোগ্য যে তিন অধিকর্তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসি, তাঁরা হলেন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর মুখ্য সচিব রুহুল কুদ্দুস, সংস্থাপনসচিব এম মহবুবউজ্জামান এবং ওই বিভাগের যুগ্ম সচিব (পরে অতিরিক্ত সচিব) এ টি এম ছৈয়দ হোসেন। ১৯৭০-এর দশকে মন্ত্রণালয়ে অফিসারের সংখ্যা খুবই সীমিত ছিল—এত যুগ্ম সচিব আর অতিরিক্ত সচিবের ছড়াছড়ি ছিল না। সেই পরিপ্রেক্ষিতে উপসচিবের পদটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সরকারি কাজে বিদেশ ভ্রমণ এবং বিদেশে সব ধরনের প্রশিক্ষণের অনুমোদনের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রী তাঁর মুখ্য সচিবের কাছে ন্যস্ত করেছিলেন। সংস্থাপনসচিব পর্যন্ত নথি প্রক্রিয়াকরণের পর মুখ্য সচিবের অনুমোদনের জন্য গাদা গাদা নথি বগলদাবা করে আমি তাঁর দপ্তরে নিয়ে যেতাম। তিনি সেগুলো দ্রুত স্বাক্ষর করে হাতে হাতে আমাকে ফিরিয়ে দিতেন। এ কাজের জন্য তিনি ব্যস্ত না থাকলে তাঁর কক্ষে যাওয়ার জন্য আমার একধরনের অবারিত অনুমতি ছিল।

রুহুল কুদ্দুস তাঁর রাজনৈতিক দর্শন এবং বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে নৈকট্যের কারণে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের অনেক নিগ্রহের শিকার হয়েছেন। তাঁর এই বিপদের সময় সহকর্মীরা তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে কতটা সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, তা আমার জানা নেই। কিন্তু এ জন্য তাঁর কারও প্রতি কোনো অনুযোগ কিংবা আক্রোশ থাকলেও তাঁর আচার-আচরণে তা কখনো প্রকাশ পায়নি।

এ টি এম ছৈয়দ হোসেন বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি। দেশের স্বাধীনতাকালে তিনি সচিবালয়ে সিনিয়র সহকারী সচিব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। উপসচিব হিসেবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার পোস্টিংয়ের প্রায় একই সময়ে তাঁকে উপসচিব পদে পদোন্নতি দিয়ে সংস্থাপন বিভাগে পদায়ন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং আরও কিছু কিছু নতুন বিভাগ সৃষ্টির ফলে সচিবালয়ে কক্ষ বরাদ্দ নিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে তখন টাগ অব ওয়ার চলছে। আমাকে সচিবালয়ের প্রধান ভবনের পশ্চিম দিকের শেষ কক্ষটি বরাদ্দ দেওয়া হয়। সেখানে ঢুকতে গিয়ে দেখি মাঝবয়সী এক অফিসার তাঁর কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে আলাপচারিতায় ব্যস্ত। আমি তাঁকে সালাম দিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম, এই কক্ষটি আমার নামে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এটি খালি আছে মনে করে আমি এখানে এসেছিলাম। এখন দেখছি...। আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই তিনি তাঁর পরিচয় দিয়ে আমাকে বললেন, রুমটা আপনার নামে বরাদ্দ আছে ঠিকই, তবে সচিবালয়ে কক্ষের স্বল্পতা আছে। আপনাকে আমার সঙ্গে কক্ষটি শেয়ার করতে হবে। ভালোই হবে—আমরা কাজের ফাঁকে ফাঁকে গল্পগুজব করে সময় কাটাতে পারব। ছৈয়দ হোসেন সম্পর্কে ইতিমধ্যে বিভিন্নজনের কাছে বহু কাহিনি শুনেছি। লোকটি অত্যন্ত বদমেজাজি এবং তাঁর আচার-আচরণ আদৌ সৌহার্দ্যপূর্ণ নয়। এভাবে চিত্রিত ব্যক্তির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই তাঁকে কিন্তু আমার অত্যন্ত নির্বিরোধ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ বলেই মনে হলো। অবশ্য ছৈয়দ হোসেনের সঙ্গে আমার বেশি দিন কক্ষ শেয়ার করতে হয়নি। যুগ্ম সচিব হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে তিনি সংস্থাপন বিভাগেই থেকে গেলেন এবং আরও অনেকের সঙ্গে আমার তত্ত্বাবধানকারী অধিকর্তার দায়িত্ব পেলেন।

সামগ্রিকভাবে সব কেন্দ্রীয় সার্ভিস, বিশেষ করে সিএসপি ক্যাডারের বিরুদ্ধে ছৈয়দ হোসেনের বহু অনুযোগ ছিল। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা যে প্রাদেশিক সার্ভিসগুলোকে বঞ্চিত করে এরা অন্যায়ভাবে নিজেদের মধ্যে সব সুযোগ-সুবিধা ভাগ করে নিয়েছে। এ ধরনের বৈষম্যের দ্রুত অবসানের একটা তাগিদ তাঁর কথায় ও কাজে প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হতে দেখা গেছে। তবে সিএসপি অফিসারদের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যথেষ্ট বৈপরীত্য দেখা গেছে। সিএসপির ১৯৬০ ব্যাচ ও তদূর্ধ্ব জ্যেষ্ঠ সিএসপিদের প্রতি তাঁর প্রচণ্ড ক্ষোভ ও অবজ্ঞা ছিল। বঙ্গবন্ধুর আত্মীয় হওয়ার কারণে চাকরিজীবনে ছৈয়দ হোসেনও বহুবার হয়রানির শিকার হয়েছেন। জ্যেষ্ঠ সিএসপিদের অনেকেই তাঁর হয়রানির কারণ বলে তিনি সন্দেহ পোষণ করতেন।

ছৈয়দ হোসেন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব হলেও সব মন্ত্রণালয়েই তাঁর অবাধ পদচারণ ছিল। নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতায় আমরা অনেকেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁকে Super Minister without Portfolio বলে সম্বোধন করতাম। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে অবাধে যোগাযোগের সুযোগে তিনি বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের সম্পর্কে একটা ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হন, যা আগে তাঁর পক্ষে কখনো সম্ভব ছিল না। এ পর্যায়ে অন্য সার্ভিসের অফিসারদের তুলনায় নবীন সিএসপি অফিসারদের নিষ্ঠা ও দক্ষতা সম্পর্কে তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁদের প্রতি তাঁর বৈরী মনোভাবকে অনেকটাই সংযত করে নেন। এমনকি আমাদের কর্মজীবন পরিকল্পনার অনেক বিষয়ে তাঁর আনুকূল্য প্রদর্শন করে আমাদের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে তাঁর ভাবমূর্তি গড়ে তোলেন।

নবীন সিএসপি অফিসারদের প্রতি ছৈয়দ হোসেনের এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির বহু উদাহরণ আমি স্বচক্ষে দেখেছি। এগুলোর মধ্যে একটি ঘটনার উল্লেখ না করলে নয়। আমাদের সহকর্মী অন্যতম সিএসপি অফিসার আকবর আলি খান জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে যোগদানের জন্য সরকারি চাকরি থেকে ইস্তফা দিলে তা প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গৃহীত হয়ে বিজ্ঞপ্তি জারির জন্য সংস্থাপন বিভাগে আসে। ছৈয়দ হোসেন ওই বিজ্ঞপ্তি জারি না করে আকবরকে ডেকে পাঠান। পরম সুহৃদের মতো তিনি আকবরকে বললেন, আপনার তো জীবনের অনেক পথই বাকি আছে। যদি কোনো সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজটি আপনার ভালো না লাগে এবং আপনি আবার সরকারে ফিরে আসতে চান, চাকরিতে ইস্তফা দিলে আপনার সে পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাবে। আপনি ফিরে আসার একটা অপশন খোলা রাখেন। আপনি ইস্তফা না দিয়ে চাকরিতে লিয়েন রেখে জাহাঙ্গীরনগরে যোগদান করেন। তাঁর কথায় রাজি হয়ে আকবর আলি আবেদন করলে লিয়েনসহ তাঁর ডেপুটেশন মঞ্জুর করা হয়। ছৈয়দ হোসেনের এই অপ্রত্যাশিত হস্তক্ষেপ যে কতটা বাস্তবসম্মত ছিল, আকবর আলি খান তা ভালো করেই জানেন।

সংস্থাপন বিভাগে নূরুল কাদের খানের স্থিতি ছিল স্বল্পকালীন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন জ্যেষ্ঠ সিএসপি অফিসার এবং সংস্থাপন বিষয়ে সমগ্র পাকিস্তানের অন্যতম বিশেষজ্ঞ মহবুবউজ্জামান। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে সংস্থাপন এবং চাকরিসংক্রান্ত সব আইনকানুন, বিধিবিধান ও ম্যানুয়াল সযত্নে রক্ষিত ছিল। তিনি কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন এবং নিজ হাতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ওপর নোট লেখা পছন্দ করতেন। অফিস সময়ের পরও দীর্ঘ সময় তিনি তাঁর দপ্তরে কাজ করতেন। কিন্তু অন্য অনেক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার মতো বিনা কাজে বিভাগের সব অফিসারকে বসিয়ে রেখে কাজ করা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। দিনভর যেসব নথি সচিবের টেবিলে জমা হতো, পরদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকালে আমাদের যার যার অফিসে গিয়ে দেখতাম সেগুলো প্রয়োজনীয় আদেশসহ আমাদের কাছে ফিরে এসেছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সংস্থাপন বিভাগে সুন্দর একটা কাজের পরিবেশ ও পদ্ধতি চালু করে এই বিভাগে একটা গতির সঞ্চার করেন। ছৈয়দ হোসেনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কখনোই সহজ ছিল না—তাঁর অনেক প্রস্তাবই সচিব যুক্তিসংগত নয় বলে নাকচ করে দিতেন। তা ছাড়া মহবুবউজ্জামানের যুক্তিবাদী ধারণার সঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ধ্যান-ধারণা সংঘাতপূর্ণ হওয়ায় তাঁকে এখান থেকে অল্প দিনের মধ্যে বিদায় নিতে হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের পর ছৈয়দ হোসেনকে প্রধানত রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন অভিযোগে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে সামরিক আদালতে বিচারের জন্য হাজির করা হয়। সংস্থাপনসচিবদের ওপর প্রভাব খাটিয়ে অনেক অন্যায্য কাজ তাঁদের করতে বাধ্য করেছেন, এমনকি তাঁর জামাতার উপযুক্ততা না থাকলেও তাঁকে উপসচিব পদে পদোন্নতির জন্য সচিবকে বাধ্য করেছেন—এই অভিযোগের অনুকূলে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য সচিব মহবুবউজ্জামানকে ডাকা হয়। ছৈয়দ হোসেনের বৈরিতার কারণে তাঁকে কখনো কখনো বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং কৌশলে তাঁকে সংস্থাপন বিভাগ থেকে সরিয়ে একটি গুরুত্বহীন পদে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মহবুবউজ্জামানের নীতির প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধের কারণে কোনো ধরনের ভাবাবেগ তাঁর সাক্ষ্যকে প্রভাবিত করতে পারেনি। অতিরিক্ত সচিবের চাপের মুখে তিনি অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, এই অভিযোগ নাকচ করে দিয়ে তিনি বলেছিলেন যে সচিবেরা অতিরিক্ত সচিবের চাপে কোনো কাজ করেন না—প্রচলিত আইনকানুন ও রীতিনীতি অনুসরণ করেই তাঁদের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আর ছৈয়দ হোসেনের জামাতার পদোন্নতি সমস্ত পদ্ধতি অনুসরণ করেই করা হয়েছে—এখানেও নিয়মের কোনো ব্যত্যয় ঘটানো হয়নি। নিরপেক্ষ প্রশাসন যে কোনোভাবেই ভাবাবেগ দ্বারা তাড়িত হওয়া উচিত নয়—এই সাক্ষ্য সেই আদর্শেরই একটি সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

চার বছর পর ১৯৭৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সিরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোকপ্রশাসনে এমপিএ এবং পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের পর দেশে ফিরে আবার সংস্থাপন মন্ত্রণালয়েই আমার পোস্টিং হলো। তবে এবার পরিবেশ অনেক ভিন্ন। সংস্থাপন বিভাগকে মন্ত্রণালয়ে রূপান্তর করা হয়েছে এবং চিরাচরিত প্রথার ব্যত্যয় ঘটিয়ে এটিকে সরকারপ্রধানের কাছে না রেখে একজন মন্ত্রীর অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে। আর এর লোকবল বেড়েছে ১৯৭২-এর তুলনায় চার গুণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদেশে বসে আমি আশা করেছিলাম যে স্বাধীনতার প্রায় এক দশক পর দেশে ফিরে প্রশাসনে একটা স্থিতাবস্থা দেখতে পাব—যে সিদ্ধান্তই সরকার গ্রহণ করুক না কেন, তা হবে আইন ও বিধিবিধানের ভিত্তিতে। কিন্তু মাঝেমধ্যেই নিয়মবহির্ভূত সব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য উচ্চপর্যায় থেকে মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। একদিন এমন একটি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য একটি নজিরবিহীন টোকা আমার টেবিলে এল। কোয়ার্টার সাইজ নোট প্যাডে সংস্থাপনমন্ত্রীর নিজ হাতে লেখা নির্দেশ: সাবেক সিএসপি সচিব বোরহানউদ্দিন আহমদকে পিও ৯-এর অধীনে রাষ্ট্রপতি চাকরি থেকে বাধ্যতামূলক অবসরের আদেশ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে দ্রুত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হোক। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে দুই দফায় চার বছর কাজ করছি। সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করা হচ্ছে; অথচ এ জন্য কোনো নথি নেই, সারসংক্ষেপ নেই, রাষ্ট্রপতির কোনো স্বাক্ষরিত আদেশও নেই। মন্ত্রীর নোটের ভিত্তিতে এ ধরনের আদেশ জারি করা কখনোই বৈধ হবে না। আমি নোটপ্যাডের ওই নির্দেশনাটি সচিবালয়ের ফুলস্কেপ সাইজের নোটশিটে আঠা দিয়ে খুব ভালোভাবে সেঁটে আমার সব বক্তব্য সুন্দর করে লিখে ওপরে পাঠালাম। নথি মন্ত্রী পর্যন্ত গেলে তিনি বিরক্ত হয়ে লিখলেন, অহেতুক রাষ্ট্রপতির আদেশ বাস্তবায়নে বিলম্ব করা হচ্ছে। রাষ্ট্রপতির মৌখিক নির্দেশই যথেষ্ট। আজই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হোক। বোরহানউদ্দীন অত্যন্ত দক্ষ, সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা ছিলেন; তবে তিনি কঠিন ও অনমনীয় প্রকৃতির লোক ছিলেন। কোনো অন্যায় কাজ তাঁর হাতে করানো অসম্ভব ছিল। হয়তো সে কারণেই তাঁকে চাকরি থেকে এমনভাবে বিদায় নিতে হলো। পরে তিনি সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করে সুপ্রিম কোর্টের আদেশে সসম্মানে চাকরিতে বহাল হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আত্মসম্মান এত প্রখর ছিল যে চাকরিতে যোগদান করে তাঁর অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে তিনি পরদিন থেকে অবসরে চলে যান।

প্রশাসনে লালফিতার দৌরাত্ম্যের কথা কম-বেশি আমরা সবাই জানি। লালফিতার মাহাত্ম্য হচ্ছে, প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনে আইন কিংবা বিধিবিধানের অন্ধ অনুসরণ এবং উপস্থাপিত সব বিষয় ওই সব বিধিবিধানের আক্ষরিক ব্যাখ্যার আড়ালে নাকচ করার প্রবণতা। বিধিবিধান মানুষের প্রয়োজনেই তৈরি করা হয়। তবে এর প্রয়োগে সে জন্য ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপ ছাড়া অনেক সহজ বিষয়ের নিষ্পত্তিও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকবর আলি খানের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির প্রসঙ্গ ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছিলাম। এর মধ্যে আকবর কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে কানাডায় অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এসেছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা প্রতিকূলতার মুখে তিনি আবার সরকারে ফিরে আসার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন পেশ করেন। কানাডায় যাওয়ার আগে তাঁকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চাকরি করার নিশ্চয়তার অনুকূলে একটি বিরাট অঙ্কের বন্ডে স্বাক্ষর করতে হয়েছিল। বন্ডে নির্ধারিত সময়ের আগেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন বলে বন্ডের টাকা পরিশোধ করলেই তাঁকে সরকারে ফিরিয়ে আনা যাবে—শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিম্নপর্যায়ের কর্মকর্তারা এই অবস্থান গ্রহণ করেন। আকবরের যুক্তি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শতভাগ সরকারি অনুদানে পরিচালিত। সুতরাং, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বন্ডটি সরকারের অনুকূলে হস্তান্তর করা হলে নগদ অর্থ পরিশোধের কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব পর্যায় পর্যন্ত এই যুক্তি গ্রহণে তাদের অপারগতা প্রকাশ করে কেসটি ঝুলিয়ে রাখছিল। এমন সময় আকবর সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কিছু করতে পারে কি না, সেই খোঁজে আমার কাছে এলেন। আমি শুনে বললাম, বন্ড হস্তান্তরে আমি তো কোনো অসুবিধা দেখি না। সে সময় জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের চাকরিসংক্রান্ত কিছু কিছু বিষয় মন্ত্রিপরিষদ সচিবের ওপর ন্যস্ত ছিল। তখন এম কেরামত আলী মন্ত্রিপরিষদ সচিব। রুহুল কুদ্দুসের বরাবর আমি যেমন হাতে হাতে নথি পেশ করতাম, সেই একই স্টাইলে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বরাবর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের নির্দিষ্ট বিষয়ের নথিগুলো আমি তাঁর কাছে পেশ করতাম। সেই সুবাদে তাঁর সঙ্গে আমার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আমি আকবরকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে সমস্ত কেসটি ব্যাখ্যা করলাম। তিনি শুনে বললেন, এটা তো কোনো জটিল বিষয় নয়। আর আমাদের এখানে নবীন ও মেধাবী অফিসারদের অনেক ঘাটতি আছে। ওকে সরকারে ফিরিয়ে আনতে পারলে আমাদেরই লাভ। আমি শিক্ষাসচিবকে ফোন করে দিচ্ছি। তাঁর কাছে তোমরা এখনি যাও। তবে আকবরের প্রত্যাবর্তনের আদেশ হলে তাঁকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পোস্টিং দিতে হবে।

আমরা কালবিলম্ব না করে শিক্ষাসচিব কাজী ফজলুর রহমানের দপ্তরে হাজির হলাম। ১৯৫৬ ব্যাচের সিএসপি ফজলুর রহমান সমগ্র পাকিস্তানের সিএসএস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। অত্যন্ত স্বল্পভাষী এই কর্মকর্তা দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে এত পারঙ্গম যে আমাদের কথা খানিক শুনেই তিনি বললেন, এই নথি আমাকে এরা কেন পাঠায়নি? শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্ড হস্তান্তর করতে হবে বলে তিনি আকবরের আবেদনের কপির ওপর সুস্পষ্ট নির্দেশ দিলেন। আকবর কয়েক দিনের মধ্যেই সরকারে ফিরে এলেন।

আমি ১৯৮১ সালে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে কৃষি মন্ত্রণালয়ে বদলি হয়ে এসেছি। অত্যন্ত মেধাবী, উন্নয়ন প্রশাসনে অভিজ্ঞ ও লক্ষ্য অর্জনে দুর্বার ও দৃঢ়চিত্ত আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ খান আমার সচিব। প্রশাসন পরিচালনায় তাঁর স্টাইল ছিল তাঁর পছন্দের ও আস্থার ব্যক্তিদের বিভিন্ন পদে সমাসীন করে তাঁদের হাতে প্রশাসনের খুঁটিনাটি ছেড়ে দিয়ে নীতিনির্ধারণী বিষয়ে মনোনিবেশ করা। কিছুদিন গেলে দেখি যে অন্য অনেক সচিবের মতো অধিকাংশ নথি তিনি পরে দেখবেন বলে ধরে রাখতেন না। ফাইল খুলে দ্রুত স্বাক্ষর করে নথি নিষ্পত্তি করে দিতেন। তাঁর বুদ্ধিমত্তা এত প্রখর ছিল যে কোন বিষয়গুলো তাঁকে ভালোভাবে দেখতে হবে, তা তিনি জানতেন এবং সেই নথিগুলো তিনি রেখে যেতে বলতেন।

একদিন একটা নথি আমার হাতে দিয়ে সচিব বললেন, যত দ্রুত সম্ভব প্রয়োজনীয় আদেশ ও বিজ্ঞপ্তিগুলো জারি করো। আমার অফিসকক্ষে ফিরে নথি খুলে বিস্ফারিত চোখে দেখি, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের আধুনিকায়নের জন্য তাদের লোকবল সংখ্যা বহুগুণ বাড়িয়ে একটা বিরাট অর্গানোগ্রাম তৈরি করা হয়েছে, যেখানে শুধু পদসংখ্যাই যে বাড়ানো হয়েছে, তা-ই নয়, অনেক নতুন নতুন পদও সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বিদ্যমান পদের মান উন্নীত করা হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগে মহাপরিচালকের একটি পদ সৃষ্টি করে তাকে সচিবের বেতন স্কেল প্রদান করা হয়েছে, যা তখন শুধু বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদের নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান ছাড়া বাংলাদেশ সরকারের আর কোনো বিভাগীয় প্রধানের জন্য প্রযোজ্য ছিল না। মোট ৩২ হাজার পদসংবলিত এই অর্গানোগ্রামের শেষ পাতায় তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সবুজ কালিতে লেখা এরকম একটি অনুমোদন ছিল :

নথিতে রক্ষিত প্রস্তাবসমূহ অনুমোদন করা হল। সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির কোন প্রয়োজন নাই।

কৃষি সম্প্রসারণের সঙ্গে জড়িত পাঁচটি স্বতন্ত্র বিভাগকে একক নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যই এই উদ্যোগ। এ ধরনের একীভূতকরণের জন্য ইতিমধ্যে অনেক সমীক্ষা হয়েছে এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং বিশ্বব্যাংকও এ কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করার তাগিদ দিয়ে আসছিল।

প্রস্তাবটির যৌক্তিকতা এবং যথার্থতা নিয়ে কোনো সন্দেহ কিংবা বিতর্কের অবকাশ নেই। সমস্যা হচ্ছে এর প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি নিয়ে। সরকারের রুলস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অব বিজনেস অনুযায়ী যেকোনো প্রশাসনিক সংস্কার প্রস্তাব কিংবা অর্গানোগ্রামের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন কিংবা বিয়োজন প্রথমে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তা অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির জন্য পাঠানো হয়। এদের পরীক্ষা শেষ হলেই কেবল নথি রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। তবে এই দুটি মন্ত্রণালয় সম্পর্কে আমলাতান্ত্রিক মহলের ধারণা যে, এরা অত্যন্ত রক্ষণশীল এবং বর্তমান যুগের চাহিদা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য দৃষ্টিভঙ্গির যে প্রসারতা ও কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যে সাহস দরকার, তা তাদের নেই। এরা দুইকে বাড়িয়ে বড়জোর চার করতে পারে; কিন্তু চার শ করার মতো সাহস এদের নেই। এসব শুনেই হয়তো রাষ্ট্রপতি ওই দুই মন্ত্রণালয়কে বাদ দিয়েই তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশ সত্ত্বেও, আমি জানি, সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি ছাড়া এ আদেশ জারি করা যাবে না। তা করলে মহাহিসাব রক্ষক এদের বেতন-ভাতা দেবেন না। আমি যুগ্ম সচিব পর্যায় পর্যন্ত চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে আমার সচিবের কাছে ফিরে গিয়ে বললাম, স্যার, সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি ছাড়া এ বিজ্ঞপ্তি জারি করা যাবে না। নিচের পর্যায়ে কথা বলে আমি ব্যর্থ হয়েছি। আপনি অর্থসচিবের সঙ্গে কথা বলুন। ওবায়দুল্লাহ খান অর্থসচিব গোলাম কিবরিয়ার সঙ্গে কথা বললে তিনি সব কাগজপত্র নিয়ে পরের দিন তাঁর দপ্তরে আমাকে হাজির হতে বললেন। পাকিস্তান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট সার্ভিসের অন্যতম সদস্য গোলাম কিবরিয়া তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও জটিল বিষয় দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আমলাতান্ত্রিক মহলে বহুল আলোচিত ছিলেন। তিনি খুব দ্রুত বিষয়টি অনুধাবন করতে পারলেন এবং তাঁর সরাসরি হস্তক্ষেপে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনকৃত অর্গানোগ্রামটি ঠিক যেভাবে তিনি অনুমোদন করেছিলেন, সেভাবেই বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হই। দেশের স্বাধীনতাকালে প্রায় ৯০ লাখ হেক্টর জমিতে বাংলাদেশ ৭০ লাখ টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করেছিল। কৃষিযোগ্য সেই জমির পরিমাণ বর্তমানে অনেক হ্রাস পেলেও এখন বাংলাদেশ ৩ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করছে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ১৯৮১ সালের কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের আধুনিকায়ন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

অন্য আরেকটি ঘটনা, যা আমি উল্লেখ করতে চাই, সেটিও কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগসংশ্লিষ্ট। তখন বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সংস্থায় নতুন নতুন অবকাঠামো নির্মাণের কাজ চলছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রজেক্ট ইমপ্লিমেনটেশন ইউনিট (PIU) নামে একটি সংস্থা নির্মাণ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি দেখার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। কর্নেল আনসার ওই ইউনিটের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছিলেন। আমি মন্ত্রণালয়ে যোগদানের পর প্রথম সাক্ষাতে তিনি একগাদা কাগজপত্র আমাকে দিয়ে বললেন, এটা দ্রুত প্রসেস করতে হবে। ঠিকাদারের পেমেন্ট না হলে এরা কাজ বন্ধ করে দেবে। আমি তাঁকে বিনীতভাবে বললাম, আমি এই মন্ত্রণালয়ে কেবল এসেছি। আমি সব ভালোভাবে বুঝে তার পর নথি সচিবের কাছে পেশ করব। আমাকে দুদিনের সময় দিন। কর্নেল আনসার আমার কথায় আশ্বস্ত হয়ে বিদায় নিলেন। আমি ওই দিনই সংশ্লিষ্ট সহকারী সচিব এবং পিআইইউর অ্যাকাউন্টস অফিসারকে নিয়ে সারা দিন সংশ্লিষ্ট সব কাগজপত্র ঘেঁটে দেখি যে নথিটি কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের হেডকোয়ার্টার কমপ্লেক্স খামারবাড়িতে তিনটি ছয়তলা ভবন নির্মাণসম্পর্কিত। এটির একটি পিপি আছে ঠিকই কিন্তু এই পিপির অনুমোদন এখনো পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন। এডিপিতে এই প্রকল্পের অনুকূলে কোনো অর্থ বরাদ্দও নেই। এমনকি নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের মনোনয়নও ক্রয় কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত করা হয়নি। সেটিও চূড়ান্ত হওয়ার অপেক্ষায় আছে।

পরদিন ভোরে সচিব অফিসে আসার সঙ্গে সঙ্গেই নথিটি নিয়ে সচিবের সঙ্গে আলাপ করতে গেলাম। আমার সব কথা শুনে সচিব তাঁর স্বভাবসুলভ মৃদু হেসে আমাকে বললেন, এ সবকিছু আমার জানা আছে। তবে প্রকল্পটি জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগে ঠিকমতো সুন্দর কাজের পরিবেশ করে দিতে না পারলে ওদের কাছ থেকে কাজ পাওয়া যাবে না। বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। Extension and Research Project, যেটার চূড়ান্ত অনুমোদন হয়ে গেছে, সেখান থেকে টাকা পেলেই অন্য প্রকল্প থেকে ধার করা টাকা সমন্বয় করা হবে। তুমি আমার সঙ্গে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই লাইনে নোট লিখে পাঠাও। বাকি সিদ্ধান্ত আমি নথিতে লিখে দেব। আলাপ শেষে আমি যখন আমার অফিসে ফেরার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছি, তখন ওবায়দুল্লাহ খান আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখো সামনে তো তোমাকে অনেক সময় পার করতে হবে। জনস্বার্থে ভালো কাজে নিয়ম ভঙ্গ করতে হলে দু-এক সময় তা করতে দ্বিধা করবে না। যারা তা করার সাহস রাখে, তারা এগিয়ে যায়; আর যারা তা পারে না, তারা পিছিয়ে থাকে।

ওবায়দুল্লাহ খানের অন্যতম ভাবশিষ্য সৈয়দ শামীম আহসানের সঙ্গেও আমার কাজ করার সুযোগ হয়েছে। তিনিও তাঁর গুরু ওবায়দুল্লাহ খানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টাইলে পছন্দমতো অফিসার বাছাই করে তাঁদের ওপরই মূলত মন্ত্রণালয় পরিচালনার দায়িত্বভার সঁপে দিয়েছিলেন। তাঁর কাজ ছিল উচ্চপর্যায়ে যোগাযোগ করে মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিত করা এবং দাতা সংস্থাগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে প্রকল্পের পাইপলাইনকে স্ফীত ও প্রবহমান রাখা। ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যার পর তাঁরই অকুণ্ঠ সমর্থন ও বিভিন্ন মহলে যোগাযোগের কারণে Flood Policy Study শীর্ষক সমীক্ষা দ্রুত সম্পন্ন করে সমগ্র বাংলাদেশের জন্য একটি ব্যাপক Food Action Plan তৈরি করা হয়। এসব প্রাথমিক কাজের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে পানি ব্যবহারকারী সব প্রতিষ্ঠানের চাহিদা সামনে রেখে সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম জাতীয় পানিনীতি রচিত হয় এবং সরকারি পর্যায়ে তা গৃহীতও হয়। ওই নীতি ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের সঙ্গে নিবিড় মতবিনিময়ের পর National Water Management Plan-ও প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে পানিসম্পদ সেক্টরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক যেসব উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, সেগুলো জাতীয় পানিনীতি ও জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করেই তৈরি করা হয়। সৈয়দ শামীম আহসান কাজের একটা উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে সক্ষম হওয়ায় পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে গর্ব করার মতো আমরা একটা উত্তরাধিকার রেখে আসতে সক্ষম হয়েছিলাম।

অন্ধকার যেমন আলোকে তাড়া করে বেড়ায়, তেমনি আমাদের আনন্দ-উল্লাসের ছন্দপতনেও বিলম্ব হলো না। কিছুকাল পর এমন একজন সচিবের আবির্ভাব হলো, যিনি মন্ত্রণালয়ে পা রাখার আগে থেকেই এখানে কর্মরত কয়েকজন সম্পর্কে বিভিন্নভাবে তাঁর নেতিবাচক মন্তব্য বা বক্তব্য জানাতে শুরু করলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই তিনি কিছুকাল পানি উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁর ধারণা, পানিসম্পদ বিষয়ে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি; যদিও ৪০ বছর আগে তাঁর আহরিত জ্ঞান চর্চার অভাবে বর্তমান সময়ে প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছিল। গুরুতর অসুস্থ হয়ে তিনি লন্ডনে চিকিৎসার জন্য চলে গেলে সেখানকার দূতাবাসে কর্মরত ইকোনমিক মিনিস্টার অন্যতম সিএসপি অফিসার সৈয়দ রেজাউল হায়াত বোধ হয় খুব ভালোভাবেই তাঁর দেখাশোনা করেছিলেন। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে তখন সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট সার্ভিসের কর্মকর্তা এস এম এ গাজীকে যুগ্ম সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। গাজী দীর্ঘ সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশের বিভিন্ন মিশনে কাজ করে আমাদের মন্ত্রণালয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়োজিত হলেন। তিনিই আমাকে শোনাতে লাগলেন যে সচিব দেশে ফিরে রেজাউল হায়াতকে এখানে অতিরিক্ত সচিব হিসেবে আনতে চান। দু-তিন মাস পর আমার সচিব হিসেবে পদোন্নতি পাওয়ার কথা। হায়াতেরও মুক্তিযোদ্ধার জ্যেষ্ঠতা নিয়ে ওই একই সময়ে সচিব হওয়ার কথা। এই স্বল্প সময়ের জন্য বদলাবদলির কারণ হিসেবে আমাকে সচিবের অপছন্দ করা ছাড়া আর কিছুই আমি খুঁজে পেলাম না।

সচিব দেশে আসার পর আমাদের বদলাবদলির রহস্যটা একটু একটু করে উন্মোচিত হতে লাগল। বিভিন্ন সার্ভিসে কিছু অফিসার আছেন, সংখ্যায় তাঁরা অতি নগণ্য, যাঁরা তাঁদের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা, দপ্তর কিংবা মন্ত্রণালয়কে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তাঁদের জমিদারি বলে গণ্য করেন এবং এসব প্রতিষ্ঠানের জনবল ও সহায়সম্পদ নির্দ্বিধায় ব্যক্তিগত সম্পদের মতো ব্যবহার করেন। এই সচিব মন্ত্রণালয়ে পা রেখেই অধীনস্থ দপ্তর থেকে নিজের প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি গাড়িটি ছাড়াও আরও তিনটি গাড়ির ব্যবহার শুরু করেন। পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়মিত চেয়ারম্যান হঠাৎ ইন্তেকাল করলে বেশ কিছুকাল আগে থেকেই আমি বোর্ডের চেয়ারম্যানের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করে আসছিলাম। একদিন আমার দপ্তরে গিয়ে শুনি, সচিবের নির্দেশে চেয়ারম্যানের দপ্তরের সোফাটি সরিয়ে সচিবের দপ্তরে স্থাপন করা হয়েছে। বোর্ডের গাড়ি ও সোফা এভাবে মন্ত্রণালয়ে পাচার হওয়ায় বোর্ডের প্রকৌশলীদের মধ্যে চাপা অসন্তোষ বিরাজ করছিল। আরেকটি ঘটনা এই পরিস্থিতিকে আরও নাজুক করে তুলল। বোর্ডের অধীন ড্রেজার অধিদপ্তরে পাকিস্তান আমলে নির্মিত একটি লঞ্চ ও কয়েকটি স্পিডবোট বিভিন্ন প্রকল্প তদারকির জন্য মজুত ছিল। লঞ্চটি চালাতে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি খরচ হতে দেখে ওটাকে কার্যত ব্যবহারের অনুপযোগী হিসেবে ফেলে রাখা হয়েছিল। ড্রেজার অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী একদিন আমার কাছে এসে অভিযোগের সুরে বললেন, দুদিন আগে সচিবের পিএসের মাধ্যমে পাওয়া আদেশে কলকাতা থেকে আসা তাঁর কিছু বন্ধু-বান্ধবীকে লঞ্চে করে নৌবিহারে চাঁদপুর নিয়ে যেতে হয়েছে। তা ছাড়া তাঁদের ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার ইত্যাদিতে তাঁর সারা বছরের বাজেটে যা বরাদ্দ ছিল, তা শেষ হয়ে গেছে। এখন বিভিন্ন প্রকল্প দেখার জন্য স্পিডবোটগুলো চালানোর মতো জ্বালানি কেনার অর্থ নেই। কীভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা হবে? আমি লক্ষ করে আসছিলাম যে সংস্থাপ্রধানের সঙ্গে কথা না বলে নিম্নপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সরাসরি আদেশ-নির্দেশ দিয়ে তাঁর বিভিন্ন ধরনের ইচ্ছাপূরণ করাই হলো এই সচিবের স্টাইল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে কারণে বোর্ডের চেয়ারম্যান হলেও সোফা সরিয়ে নেওয়া কিংবা নৌবিহার সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না।

বিভিন্ন সংস্থার সহায়-সম্পত্তির যথেচ্ছ ব্যবহার রোধে কিছু করার একটা তাগিদ অনুভব করলাম। বোর্ডের সংশ্লিষ্ট সব কর্মকর্তাকে ডেকে আমি নির্দেশ দিলাম যে এখন থেকে মন্ত্রী কিংবা সচিব সহায়-সম্পদ ব্যবহারের জন্য যে আদেশই দিন না কেন, আমার সম্মতি ছাড়া তা বাস্তবায়ন করা যাবে না। কয়েক দিনের মধ্যেই আমার আদেশ যে ফলপ্রসূ হয়েছে, তা বুঝতে পারলাম। তখন কোথায় যেন ক্রিকেট বিশ্বকাপের খেলা চলছিল। বোর্ডের পাবলিক রিলেশনস অফিসার মোয়াত্তের আমার কাছে এসে বললেন, স্যার, আপনার দপ্তরের বড় টেলিভিশনটি সচিব তাঁর দপ্তরে এক্ষুনি স্থাপন করতে বলেছেন। বড় টিভির অভাবে তিনি ভালোভাবে বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলা দেখতে পারছেন না। মুহূর্তের মধ্যে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, এখন আমার শোডাউনের সময় এসেছে। আমার যত বিপদই আসুক, আমাকে কঠিন হতে হবে। মোয়াত্তেরকে আমি বললাম, বোর্ডের চেয়ারম্যানের টিভি কেন সচিবের দপ্তরে যাবে? আমার ও সচিবের অফিস আলাদা এবং আমাদের বাজেটও আলাদা। সচিবের বড় টিভির প্রয়োজন হলে তিনি তা কেনার ব্যবস্থা করতে পারেন। আর তা ছাড়া অফিসের কাজ ফেলে তো টিভি দেখার কথা নয়। তেমন কিছু করতে গেলে ছুটি নিয়ে বাসায় বসে টিভি দেখতে হবে।

আমি জানি, এ ধরনের আচরণের ফল ভালো হবে না। মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আমার যখন একটা স্নায়ুযুদ্ধ চলছে, তখন আমার সংকট আরও ঘনীভূত করার জন্য আরেকটি ঘটনা ঘটে গেল। মন্ত্রীর এপিএস আমাকে ফোন করে জানালেন যে মন্ত্রীর এক ঘনিষ্ঠজন একটা কাজের জন্য একটু পরে আমার কাছে আসবেন। আমি যেন তাঁর কাজটি করে দিই। কিছুক্ষণ পর পাটোয়ারী নামধারী মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠজন আমার দপ্তরে এলে আমি তাঁকে দ্রুত ভেতরে নিয়ে আসতে বললাম। সুঠাম দেহের অধিকারী স্যুট-টাই পরিহিত সুদর্শন এক যুবক একটি অতি মনোরম অ্যাটাচি হাতে আমার অফিসে প্রবেশ করলেন। ইউডি কোলনের তীব্র সুগন্ধে সারা কক্ষ সুরভিত হয়ে উঠল। আমি তাঁকে ইশারায় বসতে বললে তিনি তাঁর পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি মন্ত্রীর সব নির্বাচনের খরচপাতির জোগানদাতা। আগামী নির্বাচনেও তাঁর খরচের সবটাই আমাকে বহন করতে হবে। তবে এসব খরচ আমি তো আর আমার পকেট থেকে বহন করব না। মন্ত্রীর মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্প থেকে টাকাটা আমাকে তুলে নিতে হবে। বিশ্বব্যাংকের Cyclone Damage Rehabilitation প্রকল্পে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মনোনীত ঠিকাদার বাছাইপর্বে উত্তীর্ণ হয়ে টেন্ডার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। তাঁকে কাজটা পাইয়ে দিতে হবে।

আমি পাটোয়ারীকে বললাম, টেন্ডার মূল্যায়নে আপনার পার্টি কী অবস্থায় আছে, আমার জানা নাই। আপনি একটু বসুন। আমি টেন্ডার কার্যক্রমের সর্বশেষ অবস্থাটা একটু জেনে নিই। আমি প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা)-কে সংশ্লিষ্ট নথি নিয়ে দ্রুত আমার দপ্তরে আসতে বললাম। নথি পর্যালোচনা করে দেখি যে পাটোয়ারীর পার্টির অবস্থান ৭ নম্বরে। আমি প্রধান প্রকৌশলীকে বিদায় করে পাটোয়ারীকে বললাম, আপনার ঠিকাদারের অবস্থান ৭ নম্বরে। এটা বিশ্বব্যাংকের প্রকল্প। ঠিকাদার নিয়োগ চূড়ান্ত করতে বিশ্বব্যাংকের অনুমোদন লাগবে। এখানে কোনো ধরনের হেরফের আমি তো দূরের কথা, মন্ত্রীও করতে পারবেন না। পাটোয়ারী তাঁর কথায় অবিচল থেকে আমাকে বললেন, কে পারবেন কি না পারবেন, সেটা আমার দেখার বিষয় নয়। আপনি আমাকে কাজটা দিতে পারবেন কি না, আমি সেটা জানতে এসেছি। আমি বিনীত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে তাঁকে বললাম, না ভাইয়া, এ কাজটি আমি আপনার ঠিকাদারকে দিতে পারব না। উঠতে উঠতে পাটোয়ারী বললেন, ঠিক আছে, আপনি না পারলে যিনি পারবেন, এমন লোককে আমরা বোর্ডের চেয়ারম্যান বানাব। আমি বললাম, আপনি এ কাজটি করতে পারলে আমি আজীবন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। বহুবার মন্ত্রণালয়ে অনুনয়-বিনয় করার পরও আমাকে এ কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে না। সেটা হলে আমি বেঁচে যাই।

পরের দিন শুক্রবার সাভারে মন্ত্রণালয়ের পিকনিক। মন্ত্রী সস্ত্রীক এলেন। আমিও সেখানে সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলাম। একসঙ্গে আহারাদি সম্পন্ন করলাম এবং বৈঠকি আমেজে অনেক কথাবার্তা হলো। মনে মনে ভেবে খুশি হলাম যে পাটোয়ারী ফ্যাক্টরের রাহুগ্রাস থেকে হয়তো এখন পর্যন্ত আমি মুক্ত আছি।

রোববার অফিসে পৌঁছে দেখি আমার টেবিলে পেপারওয়েটে চাপা দেওয়া সচিবের স্বাক্ষরিত একটি বিজ্ঞপ্তি, যার মাধ্যমে আমাকে চেয়ারম্যানের অতিরিক্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এর কয়েক দিন পরই সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে কর্মরত আমার এক গুণগ্রাহী অফিসারের কাছ থেকে শুনতে পেলাম যে মন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে সচিব গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগ এনে আমার বিরুদ্ধে দ্রুত বিভাগীয় মামলা শুরু করার জন্য অভিযোগনামা প্রেরণ করেছেন। আমি বুঝতে পারলাম, এই মন্ত্রণালয় থেকে দ্রুত বের হতে না পারলে আমার সচিব পদে পদোন্নতি বিঘ্নিত হতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. কামালউদ্দীন সিদ্দিকীকে সবকিছু বলে আমাকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলাম। এরকম পরিস্থিতিতে পরিকল্পনা কমিশন সবচেয়ে নিরাপদ বিবেচনা করে সেখানে একটা পোস্টিং চাইলাম। পরিকল্পনা কমিশনের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে আমার অন্যতম শিক্ষাগুরু মোকাম্মেল হকের অধীনে নতুন কাজে যোগ দিলাম।

রাজনীতি ও প্রশাসনের পরিবেশ সামগ্রিকভাবে ভিন্নতর হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার অনেক মিলও খুঁজে পাওয়া যাবে। উভয় প্রতিষ্ঠানই বহু মত ও পথের ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত, যাঁরা সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থে বড় বড় বিষয়ে একমত পোষণ করলেও অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁদের নিজস্ব মতামত থাকে। আরেকটি ক্ষেত্র, যেখানে উভয় প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা একই নিয়তির সম্মুখীন হন, তা হচ্ছে বিভিন্ন পদে তাঁদের ক্ষণকালীন স্থায়িত্ব। সরকারি কর্মকর্তারা যেমন এক পদ কিংবা দপ্তর থেকে অন্যত্র কিছুকাল পর পর বদলি হয়ে যান, তেমনি সরকারি দলের রাজনৈতিক নেতারাও সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত পালাবদল করে থাকেন। রাজনীতি ও প্রশাসনের সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা এবং বিভিন্ন পদে তাঁদের ক্ষণকালীন স্থিতি বহুবিধ প্রশাসনিক অন্যায় ও ব্যভিচার থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রক্ষা করে থাকে। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে প্রশাসন ও রাজনীতিতে ধারাবাহিকতার অভাবে কখনো কখনো অনেক গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত বিচারের আওতা থেকে বেরিয়ে আসে।

AMARBOI.COM

পরিকল্পনা কমিশনে আমার তখনো এক মাসও পূর্ণ হয়নি। এমন সময় একদিন অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান আমাকে সরাসরি ফোন করে পরের দিনই বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগদানের অনুরোধ করলেন। অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে আমার পূর্বপরিচয় নেই। আমাকে একনেকের সভায় দেখে থাকলেও আমাকে নামে চেনার মতো তখনো তেমন কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। পরে অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিবের (ব্যাংকিং) কাছ থেকে জানতে পারলাম যে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো ১০ জন অফিসারের ডসিয়ার দেখে অর্থমন্ত্রী আমাকে নির্বাচিত করেছিলেন। কৃষি ব্যাংকে চাকরির দুই মাসের মধ্যেই সচিব পদে আমার পদোন্নতি হলো এবং মন্ত্রী আমাকে সেখানেই রেখে দিলেন। বুঝতে বাকি থাকল না যে অর্থমন্ত্রীর কারণে পানিসম্পদমন্ত্রী ও সচিবের আমার পদোন্নতি ঠেকানোর চেষ্টা ফলপ্রসূ হলো না। একই সরকারের একই রাজনৈতিক দলের দুই মন্ত্রীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা আমাকে সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রণালয় ও এর অধীন বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাদের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি টিমের অভ্যুদয় আমলাতান্ত্রিক মহলে খুব একটা নজরে পড়ে না। অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান এই সহায়ক পরিবেশে আমরা কৃষি ব্যাংকে একটা গতিময়তার সঞ্চার করতে সক্ষম হলাম। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতি অর্থমন্ত্রীর একটা গভীর মমত্ববোধ ছিল। কৃষি ব্যাংকে আমরা দীর্ঘদিনের পুরোনো খেলাপি ঋণের বহর কমানোর জন্য খুব উদারতার সঙ্গে ঋণ মওকুফ অনুমোদন করছিলাম। কোনো কোনো ফোরামে এর সমালোচনা হলেও অর্থমন্ত্রী আমাদের পূর্ণ সমর্থন দিয়ে বলতেন, বড়লোকেরা শত শত কোটি টাকা ঋণ নিয়ে ফেরত দেয় না; তাদের বিরুদ্ধে কেউ কোনো কথা বলে না। আর গরিব চাষিদের ঋণ মওকুফ করলে তার সমালোচনা হয়। এটা অযৌক্তিক। গ্রামাঞ্চলে কৃষিঋণের প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য তিনি বাজেট কিংবা প্রকল্পের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ফান্ড আহরণে সব সময়ই আমাদের সমর্থন দিয়েছেন।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে কয়েকবার আমাকে সচিবালয়ে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হলেও অর্থমন্ত্রী প্রতিবারই তা নাকচ করে দিয়েছেন। কী মনে করে শেষবার তিনি আমাকে ডেকে বললেন, তোমার পরের পোস্টিং নিয়ে আমার একটা প্ল্যান আছে। কাজের চাপে অর্থসচিব ব্যাংকিং সেক্টরে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন না। তা ছাড়া আর্থিক খাতের বিরাট একটা আইনি সংস্কারের প্রোগ্রামও আমার আছে। আমরা একজন সচিবের অধীনে পূর্ণাঙ্গ একটা ব্যাংকিং বিভাগ সৃষ্টি করতে চাই। আর সেখানেই তোমার পোস্টিং হবে। আমার প্রতিক্রিয়া জানার জন্য মন্ত্রী আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালে আমি বললাম, স্যার, আপনার সঙ্গে আরও কিছুকাল কাজ করতে পারব, এটা তো আনন্দ ও সৌভাগ্যের কথা।

এর কিছুকাল পর নতুন ব্যাংকিং বিভাগ সৃষ্টির গেজেট প্রকাশিত হলো এবং প্রায় একই সঙ্গে আমার বদলির আদেশও জারি হলো। আমি প্রথম ব্যাংকিং সচিব হিসেবে আমার নতুন কাজে যোগদান করলাম।

মন্ত্রণালয়ে এসে সাইফুর রহমানকে আরও কাছে থেকে দেখার সুযোগ হলো। এত দিন আমি তাঁকে দেখেছি একজন ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগী মন্ত্রী হিসেবে, যিনি মাঠপর্যায়ের বিভিন্ন কর্মসূচি সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সমর্থন দিতে সদা প্রস্তুত। মন্ত্রণালয়ে এসে আর্থিক সেক্টরে তাঁর নেতৃত্ব ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপের বহু নিদর্শন দেখতে পেলাম। চিন্তা-চেতনায় তিনি যেমন স্বচ্ছ ছিলেন, তেমনি রাজনৈতিকভাবে অপ্রিয় বিষয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁর সাহসের অভাব ছিল না। অনেক বিরোধিতার মুখেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনিই প্রথম বাংলাদেশে ভ্যাটের প্রবর্তন করেন, যা বাংলাদেশের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অবস্থাপন্ন ঋণখেলাপিদের প্রতি তাঁর অবিমিশ্র ঘৃণা ছিল এবং রাজনীতিতে এদের প্রভাব হ্রাস করার জন্য তিনি বহু উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ও সমর্থনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগে একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরও ঋণ রিশিডিউল না হলে ঋণখেলাপিদের নির্বাচনে অংশগ্রহণে অযোগ্যতার বিধান নির্বাচনী আইনে সংযোজন করা হয়। আর্থিক খাতের সার্বিক উন্নয়ন ও সুস্থতা বিধানের জন্য তিনি ব্যাংক কোম্পানি আইন, অর্থঋণ আদালত আইনসহ অনেক আইনের গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী কার্যকর করেন। বহু বছর ধরে প্রক্রিয়াধীন দেউলিয়া আইনকে ওই সময়ই একটা চূড়ান্ত রূপ দিয়ে কার্যকর করা হয়। ১৯৯০ সালের প্রথম দিকে গৃহীত এসব পদক্ষেপের ফলে ব্যাংকিং খাত একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের পরও সে ধারা এখনো অব্যাহত আছে।

১৯৯৬ সালে সরকার পরিবর্তনের পর তদানীন্তন পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসের কর্মকর্তা শাহ এ এম এস কিবরিয়া নতুন সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেন। তিনি মন্ত্রণালয়ের অফিসে আসার পর আমি আর তৎকালীন অর্থসচিব তাঁর সঙ্গে প্রথমবারের মতো সাক্ষাৎ করতে যাই। কিছুক্ষণ আলাপচারিতার পর তিনি আমাদের দিকে চোখ রেখে একটু তির্যকভাবে বললেন, আপনারা উভয়েই নাকি সাইফুর রহমানের কাজে আপনাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন? অনেকেই আমাকে এরকম কথা বলেছেন। কিবরিয়ার মতো একজন ঝানু কূটনীতিক ও প্রশাসনে অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে এ ধরনের কথা শুনে আমি একটু হতবাক হলাম। নিজেকে সামলে নিয়ে আমি বললাম, বিদায়ী অর্থমন্ত্রীর নীতি ও কর্মসূচি যেরকম নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নিয়ে বাস্তবায়ন করেছি, আপনার কাজও আমরা একইভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা করব। স্থায়ী আমলাতন্ত্রের কাজই তো হলো ক্ষমতাসীন দলের নীতিনির্ধারণ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান। আমাদের সঙ্গে কিছুকাল কাজ করার পর কিবরিয়া অবশ্যই অনুমান করতে পেরেছিলেন যে প্রথম সাক্ষাৎকালের মন্তব্যটি শুধু অসৌজন্যমূলকই নয়, অনভিপ্রেতও ছিল। ড. আকবর আলি খান আওয়ামী লীগ সরকারের পূর্ণ সময়জুড়ে অর্থসচিবের দায়িত্ব পালন করেন। আমাকে পানিসম্পদমন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক ছেড়ে দেওয়ার জন্য বারবার অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ করার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আমাকে ছেড়ে দিতে রাজি হলেন।

আমি ১৯৯৬-এর জুন মাসে পানিসম্পদ সচিব হিসেবে কাজে যোগদান করি। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে ইতিপূর্বে আমি ১৯৮৮ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত চার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বছর যুগ্ম সচিব ও অতিরিক্ত সচিব হিসেবে কাজ করেছি। অতিরিক্ত সচিবের পদে থেকে ১৮ মাস অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে পানি উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করেছি। বোর্ডকে একটি দক্ষ, সেবাধর্মী ও ফলপ্রসূ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এর আইন, পদ্ধতি, কর্মচারী প্রশাসন এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য নিরীক্ষা করে বিরাট সংস্কার কর্মসূচি প্রণয়ন করে কঠোর নিরপেক্ষতা ও গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে তা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু চার বছর বোর্ডের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মচারী সংগঠন, প্রকৌশলীদের সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন ও ওই সময় মন্ত্রণালয়ে আমার স্থিতির শেষ পর্যায়ে মন্ত্রী ও সচিবের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির কারণে আরব্ধ কাজ সমাপ্ত না করতে পারার হতাশা এবং ওই মন্ত্রণালয়ে শেষ দুই মাসের দিনগুলো আমার জন্য এত কষ্টদায়ক ছিল যে আমি আর ওই মন্ত্রণালয়ে দ্বিতীয়বারের মতো পা রাখতে আদৌ আগ্রহী ছিলাম না। পানিসম্পদমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আমি সোজাসুজি তাঁকে বললাম, আমাকে যদি এখানে আসতেই হয়, তাহলে যেসব সংস্কার কর্মসূচি আগের দফায় হাতে নিয়ে বাস্তবায়ন করতে পারিনি, সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রী পর্যায়ে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস চাই। মন্ত্রী এসব বিষয়ে পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দিয়ে বললেন, এগুলো ছাড়াও আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য আমাদের অর্জন করতে হবে আর তা হলো, ভারতের সঙ্গে গঙ্গার একটি পানিবণ্টন চুক্তি সম্পাদন।

আমি সংস্কার কর্মসূচির বিভিন্ন কম্পোনেন্টের ওপর আগের সব কাগজপত্র জোগাড় করে ক্রমান্বয়ে সেগুলো হালনাগাদকরণের কাজ শুরু করলাম। সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আমাদের কাজ এগোতে লাগল। এবার স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে বিবেচ্য সব বিষয়ের ওপর উন্মুক্ত আলোচনা ও মতবিনিময়ের ব্যবস্থা রাখা হলো। মন্ত্রণালয়ের সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে সংশ্লিষ্ট জনগণের মতামত নেওয়ার উপযোগটি আনুষ্ঠানিকভাবে মন্ত্রণালয়ের কার্যপদ্ধতির মধ্যে সংযুক্ত করা হলো।

প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত আগ্রহ ও উদ্যোগে গঙ্গার পানিবণ্টনের বিষয়ে একটা সমঝোতায় পৌঁছার লক্ষ্যে দুই দেশেরই উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতাদের যোগাযোগের মাত্রা অনেক বৃদ্ধি পেতে লাগল। এরই একপর্যায়ে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আই কে গুজরাল তাঁর পররাষ্ট্রসচিব সালমান হায়দারকে নিয়ে ঢাকায় আসেন। উচ্চপর্যায়ে বিভিন্ন স্থানে কথা বলে তিনি একদিন বিকেলে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে এলেন। তাঁরই অনুরোধে ওই সভায় যৌথ নদী কমিশনের কোনো কর্মকর্তা কিংবা কোনো প্রকৌশলীকে ডাকা হলো না। ওই সভায় দুই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্ত্রী, সালমান হায়দার ও আমি ছাড়া আর কেউ উপস্থিত ছিলেন না। গুজরাল খুব স্পষ্টভাবে বললেন, উভয় দেশের যৌথ নদী কমিশনের প্রকৌশলীদের বিপরীতমুখী অনড় অবস্থানের কারণে কয়েক যুগ ধরে গঙ্গার পানিবণ্টনের বিষয়টি ঝুলে আছে। এদেরকে এই আলোচনার দায়িত্বে রেখে কোনো অগ্রগতি অর্জন সম্ভব নয়। এই আলোচনাকে এদের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। আমি প্রস্তাব করি যে বিষয়টি এখন কূটনীতিকদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক। আমি জানি, বিষয়টি উভয় দেশেরই পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত এবং এ দায়িত্ব থেকে তাদের সরিয়ে দেওয়াকে প্রকৌশলীরা মোটেই সুনজরে দেখবেন না। তবু আমাদের এটা করতে হবে। মন্ত্রী আবদুর রাজ্জাককে লক্ষ করে বললেন, আপনি বিষয়টি জরুরিভিত্তিতে ভেবে আপনাদের সিদ্ধান্ত আমাদের জানান। আমরা দ্রুত পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করব।

গুজরাল মন্ত্রণালয় থেকে বিদায় নেওয়ার পর আমি আর মন্ত্রী একান্তে বসে অনেকক্ষণ বিষয়টি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করলাম। আমি মন্ত্রীকে বললাম, গুজরালের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। যৌথ কমিশনের সদস্যরা পালাক্রমে এ-ওর দেশে যান, সরকারি অতিথি হিসেবে পাঁচ তারকা হোটেলে তাঁদের আপ্যায়ন করা হয় ও উপঢৌকনও বিনিময় করা হয়; কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। যৌথ নদী কমিশনের সভা একটি অর্থহীন আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হয়েছে। একটা চুক্তিতে উপনীত হওয়ার জন্য আমাদের কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করা প্রয়োজন। আমরা পরদিনই প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি-পূর্ব আলোচনায় আমাদের সম্মতির কথা জানিয়ে দিলাম।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক তারেক আহমদ করিমকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রধান আলোচক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো। তাঁকে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও যৌথ নদী কমিশনের সদস্য আইনুন নিশাতকে দায়িত্ব দেওয়া হলো। কলকাতা ও নয়াদিল্লিতে একাধিক বৈঠকের পর একটা খসড়া দুই দেশের সরকারের কাছে অনানুষ্ঠানিকভাবে পেশ করা হলো। এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমর্থন লাভের জন্য মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গেও প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পানিসম্পদমন্ত্রী পর্যায়ে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করা হলো। অবশেষে ১২ ডিসেম্বর তারিখে উভয় দেশের সরকারপ্রধান নয়াদিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। গঙ্গার পানিবণ্টনের বিষয়ে চুক্তিতে উপনীত হতে পারা ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব প্রকৌশলীদের আলোচনা থেকে কিছুকালের জন্য বিরত রেখে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় গভীর প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছে। অচলায়তন ভেঙে সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য কখনো কখনো যে দীর্ঘদিনের প্রচলিত পদ্ধতিকে উপেক্ষা করা জরুরি হয়ে পড়ে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হাতে সাময়িকভাবে আলোচনার দায়িত্ব তুলে দেওয়ার ঘটনা ছিল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

গঙ্গা চুক্তি স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো জাতীয় পানিনীতি প্রণয়ন ও জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির কাজও সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলছিল। পানি ব্যবহারকারী এবং অন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে এসব দলিল প্রস্তুত করা হচ্ছিল। কিন্তু বাধা এল পানি উন্নয়ন বোর্ডের ম্যান্ডেট পুনর্নির্ধারণ এবং জনবল নিরীক্ষা করে যৌক্তিকীকরণের ক্ষেত্রে। পাঁচ শতেরও অধিক নদ-নদী এবং হাজার হাজার একরজুড়ে বিস্তৃত খাল-বিল-জলাশয় নিয়ে বাংলাদেশের জলাভূমি গঠিত। শত শত ক্ষুদ্রাকার পানি উন্নয়ন, সেচ ও বন্যানিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ বোর্ডের পক্ষে সম্ভব নয়। মধ্য ও বড় আকারের প্রকল্প বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণেই তাদের জনবল সম্পূর্ণ নিয়োজিত থাকে এবং সম্পদও নিঃশেষিত হয়ে যায়। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল দপ্তরের সঙ্গে দায়িত্বের বণ্টন সময়ের দাবি এবং আইন সংশোধনের প্রয়োজন। কিন্তু বোর্ডের প্রকৌশলীরা কোনো ছাড় দিতে প্রস্তুত নন। এটা করলে তাঁদের অধিক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে যাবে। কেননা, এঁদের কেউই তাঁদের ক্ষমতার পরিধি কমাতে সম্মত নন।

জনবলের বিষয়ে দুটি সমস্যা ছিল—প্রথমত, প্রয়োজনের অতিরিক্ত জনবল, যাঁদের বেতন-ভাতা দেওয়ার ক্ষমতা বোর্ডের ছিল না। এঁদের বেতন-ভাতা মেটাতে গিয়ে বোর্ড প্রায়ই অবৈধ উপায়ে প্রকল্পের অর্থ কিংবা জমি অধিগ্রহণের অর্থ সরিয়ে নিয়ে তা পূরণ করত। এতে জমি অধিগ্রহণের কাজ বিলম্বিত হয়ে প্রকল্পের সমাপ্তিও বিলম্বিত হতো। আর দ্বিতীয় বিষয়টি ছিল, বোর্ডের জনবলে প্রকৌশলীদের পাশাপাশি সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে ডিগ্রিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য বোর্ডে প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি করা। বিশ্বের বহু দেশেই পানি ব্যবস্থাপনা কাজে প্রকৌশলীদের পাশাপাশি সমাজবিজ্ঞানীদের নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু এখানেও প্রকৌশলীদের আপত্তি। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানের ওপর একটি কোর্স চালু করা হয়। ওই কোর্সে আহরিত জ্ঞানই যথেষ্ট এবং প্রকৌশলীরাই সমাজবিজ্ঞানীদের নির্ধারিত কাজটি করতে সক্ষম বলে তারা মনে করত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রকৌশলী অ্যাসোসিয়েশনের শিরোমণি ছিলেন আ ন হ আখতার হোসেন নামের একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী। তিনি কোনো দিন দাপ্তরিক কাজ করেছেন বলে আমার জানা নেই। দিনভর তিনি অ্যাসোসিয়েশনের কাজেই ব্যস্ত থাকতেন বলে শুনেছি। যেকোনো সংস্কার-প্রস্তাবের প্রতি এই ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি এত নেতিবাচক ছিল যে আমার নয় বছরকালীন পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে অবস্থানকালে কোনো সংস্কার-প্রস্তাবে তাঁর সমর্থন পাইনি। এই সেই আখতার হোসেন, যাঁকে পরবর্তী সরকার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী থেকে এক বছরে তিনটি পদসোপান অতিক্রম করিয়ে সচিব পদে পদোন্নতি দিয়ে একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ দিয়েছিল। পরে ফখরুদ্দীন সরকারের আমলে বিভিন্ন অভিযোগে তাঁর বিচার হয় এবং তিনি কারাবরণ করেন।

কর্মচারী পর্যায়ে নেতা ছিলেন আবুল কালাম মোল্লা। অন্য প্রভাবশালী নেতা ছিলেন বিএনপি-সমর্থক ইউনিয়ন নেতা আবুল কাশেম। আবুল কাশেম সব সময়ই একই দলের পক্ষে কাজ করেছেন এবং তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও মার্জিত রুচির কর্মচারী ছিলেন। আবুল কালাম ছিলেন তাঁর বিপরীত চরিত্রের, অর্থাৎ নীতি-বিচ্যুত ও নিচু প্রকৃতির। এরশাদ আমলে আমি যখন পানি উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছিলাম, তখন এই আবুল কালামই চেয়ারম্যানের দরজায় লাথি মেরে আমাকে আওয়ামী লীগের দালাল বলে গালমন্দ করেছেন এবং আমার বিরুদ্ধে সভা ও শোভাযাত্রা করেছেন। সেই ব্যক্তিই এখন আওয়ামী লীগের বিরাট ভক্ত সেজে বসেছেন। এই ব্যক্তিকে প্রায়ই আমি মন্ত্রীর কক্ষে দেখে একদিন মন্ত্রীকে বললাম, এই লোকটি চরিত্রহীন একটা সুবিধাবাদী। এর সম্পর্কে আপনার সতর্ক থাকা উচিত। মন্ত্রী উত্তরে আমাকে বললেন, রাজনীতির খেলা বড়ই বিচিত্র। ওসব আপনি বুঝবেন না। আপনাকে ওদের সহ্য করতে হবে।

সহ্য অবশ্যই আমাকে করতে হলো। প্রকৌশলী অ্যাসোসিয়েশনের প্রচ্ছন্ন সমর্থনে কর্মচারী ইউনিয়ন শুধু ঢাকা বাদে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার প্রতিটি অফিসের প্রবেশপথে সংস্কার কর্মসূচি ও সচিবের প্রতি অনাস্থা জানিয়ে প্ল্যাকার্ড স্থাপন করে কালো পতাকা উত্তোলন করল।

এদিকে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নতুন আইনের খসড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে সংসদীয় কমিটির সামনে বিবেচনাধীন এবং বোর্ডের নতুন অর্গানোগ্রামও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায়। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, এ পর্যায়ে আমি রণে ভঙ্গ দেব না। যে প্রক্রিয়া আমি ১০ বছর আগে শুরু করেছিলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার তা শেষ করেই এখান থেকে বিদায় নেব। ১৯৯৯ সালে জাতীয় পানিনীতি ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের পরিবর্তিত অর্গানোগ্রাম ও জনবল সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হলো। বাকি থাকল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পানি উন্নয়ন বোর্ডের নতুন বিল জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদন ও এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ। বিভিন্ন মহল ঘুরে এবং জোর তৎপরতার পর ১৯৭২ সালের পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের পানি উন্নয়নসংক্রান্ত অংশগুলো বাতিল পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হলো এবং কিছুদিন পরই তা বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশিত হলো। আমাদের অনেকেরই, বিশেষ করে পানি ব্যবহারকারী অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থা, সুশীল সমাজ, পানি ব্যবহারকারী সমিতি ও দাতা সংস্থাগুলোর দীর্ঘদিনের একটা দাবি এত দিনে পূরণ হলো।

৫৭ বছরের চাকরি শেষে আমার অবসরের দিন ঘনিয়ে আসছিল। কিন্তু এটা স্বচ্ছন্দে হওয়ার ছিল না। বছর খানেক ধরে ওলন্দাজ সরকারের 'ওরেট' নামক প্রোগ্রামের অধীনে কয়েকটি ড্রেজার সংগ্রহের একটি প্রস্তাব বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে ক্রয় আদেশ বিবেচনার জন্য মন্ত্রণালয়ে আসে। এই ক্রয় নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে বলে আমি অনেকটাই নিশ্চিন্ত ছিলাম। কারণ, দরপত্রগুলো ওলন্দাজ সরকার মূল্যায়ন করে তাদের সুপারিশ সরকারের সম্মতির জন্য আমাদের কাছে পাঠিয়েছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন কোম্পানির স্থানীয় প্রতিনিধিরা সব সময়ই মনে করে যে এ দেশের কর্মকর্তারা সব দুর্নীতিবাজ এবং অর্থ বিলিয়ে এদের দিয়ে সবকিছু করানো সম্ভব। একবারও এসব লোক ভেবে দেখে না যে এখানেও বহু লোক আছেন, যাঁরা এ ধরনের অনাচার বরদাশত করতে রাজি নন; তাঁরা সত্যকে সমুন্নত রাখার জন্য অনেক ত্যাগও স্বীকার করতে পারেন। এ ধরনের ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা অনেক হাস্যকর অবস্থারও সৃষ্টি করেন। ওলন্দাজ সরকার সুপারিশকৃত দ্বিতীয় নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে একটি পত্র পাঠিয়ে তাদের অভিহিত মূল্যের চেয়ে ১ কোটি টাকা কমিয়ে ক্রয় আদেশ প্রদান করার জন্য অনুরোধ করে। দরপত্র জমা দেওয়ার পর যে তাতে আর কোনো পরিবর্তন আনা যায় না, তা খুব সাধারণ একজন ব্যবসায়ীও জানে। অথচ একটি আন্তর্জাতিক ক্রয়ে এ ধরনের প্রহসনের সৃষ্টি করা হলো। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে তাদের দরখাস্ত নাকচ করে দিলাম। ওই কোম্পানি আমাদের কাছে প্রেরিত পত্রের একটি অনুলিপি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরেও পাঠায়। ওই পত্রের সূত্র ধরে প্রধানমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব মোক্তাদির চৌধুরী আমার দপ্তরে এসে দেখা করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলল, স্যার, এই কোম্পানিকে ক্রয়াদেশ দিলে সরকারের ১ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। একে ক্রয়াদেশ দিলে সবার জন্য ভালো।

—যে দরপত্রগুলো ওলন্দাজ সরকার মূল্যায়ন করে তাদের সুপারিশ পাঠিয়েছে, সেটিতে কোনো হেরফের করার এখতিয়ার আমাদের নেই। আর টেন্ডার খোলার পর টেন্ডারের কোনো শর্তে কিংবা দরদামে পরিবর্তন বৈধ নয়। সরকারি ক্রয় তো আর মাছের বাজারের দর-কষাকষির মতো হয় না।

—স্যার, বিষয়টা আপনি ভালো করে ভেবে দেখেন। কিছুদিন পর চাকরিতে আপনার এক্সটেনশনের ব্যাপারও আছে।

—মোক্তাদির, চাকরিজীবনের প্রথম থেকেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যেচে আমাকে সব সময় পোস্টিং দিয়েছে। আমি নিজে চেয়ে কখনো কোনো পোস্টিং নিইনি। এবারও আমি কাউকে আমার চাকরির এক্সটেনশনের জন্য বলিনি। সরকারের ইচ্ছে হলে আমাকে এক্সটেনশন দেবে, না হলে নাই।

ওলন্দাজ সরকারের সুপারিশ করা কোম্পানিকেই সরকার থেকে ড্রেজার সরবরাহের আদেশ দেওয়া হলো। আর আমি ২০০০ সালের ৯ জুলাই সরকারি চাকরি শেষে সরকার থেকে বিদায় নিলাম।

আমি চাকরিরত অবস্থায়ই আমার অবসর-উত্তর জীবনের একটি প্ল্যান তৈরি করেছিলাম। আমি অবসরে যাওয়ার আগেই গুলশানে আমার নিজের বাড়িতে আমাদের ছোট্ট সংসার গুছিয়ে বসেছি এবং পরিকল্পনামতো কনসালট্যান্সির কাজ করছি। এর মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা এম হাফিজউদ্দীন খান ফোন করে আমাকে জানালেন যে আমাকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এটি খণ্ডকালীন কাজ। আমার কনসালট্যান্সিতে কোনো বিঘ্ন ঘটাবে না দেখে আমি এই নিয়োগে খুশি হলাম। বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিয়মিত কোনো অফিস থাকার কথা নয়; যদিও আমি যখন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলাম, আমার তিন চেয়ারম্যানের মধ্যে দুজনই জাঁকিয়ে অফিস করতেন।

স্বচ্ছন্দে নির্বিঘ্ন জীবন যাপন করছি। ব্রিটিশ সরকারের অনুদানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তাদের জন্য কোনো একটা আইরিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ব্যবসায় প্রশাসনে এমএস ডিগ্রি প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল। ওই কোর্সের মৌখিক পরীক্ষায় বহিঃপরীক্ষক হিসেবে রাজস্ব বোর্ড আমাকে মনোনীত করায় আমি প্রায় সপ্তাহকাল প্রতিদিন দুপুর পর্যন্ত ওখানেই ব্যস্ত থাকতাম। ২০০২ সালে আবার বিএনপি সরকার গঠন করলে সাইফুর রহমান তৃতীয়বারের মতো ওই সরকারের অর্থমন্ত্রী নিয়োজিত হন। ওই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিনের পরীক্ষা প্রায় শেষ পর্যায়ে। এরই মধ্যে ফোনে অনুযোগের সুরে সাইফুর রহমানের কণ্ঠস্বর, আরে, তোমাকে আমি এক ঘন্টা ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি। যেখানেই থাকো, খুব তাড়াতাড়ি মন্ত্রণালয়ে আমার সঙ্গে দেখা করো। আমি সেদিনের মতো রাজস্ব বোর্ড থেকে বিদায় নিয়ে সোজা মন্ত্রীর দপ্তরে গিয়ে হাজির হলাম।

গভর্নরের পদে ফরাসউদ্দিনের টার্ম শেষ হতে চলেছে। আমরা তোমাকে ওই পদে নিয়োগ দিতে চাই।

ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পায়। জীবনে বহুবার আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে এখন শান্তিতে আছি। নতুন করে আর অশান্তিতে পড়তে চাই না।

—স্যার, এসব পদে নানা রকম লবিং আর ধরাধরি হয়। আমি আর আহত হতে চাই না।

—আরে, না না। কেউ কোনো লবিং করছে না। আজকেই আমি ফাইল নিয়ে যাচ্ছি। নতুন কাজের জন্য তৈরি হও।

সরকারের কোনো কথাই গোপন থাকে না। বাসায় এসে দেখি বিশ্বব্যাংকের আবাসিক প্রতিনিধি ফ্রেডারিক টেম্পল ব্যাংকিং সংস্কারের একগাদা কাগজপত্র বিশেষ দূতের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়েছেন। গভর্নর হিসেবে আমার নিয়োগ সমাসন্ন জেনেই হয়তো তিনি এ কাজটি করেছেন। দুদিন পর ব্যাংকিং বিষয়ে একটি সেমিনারে আওয়ারও দাওয়াতপত্র পেলাম। ঘটনার আকস্মিকতায় আমি অবশ্যই অভিভূত হলাম।

দুদিন পর সাইফুর রহমান আবার আমাকে তাঁর অফিসে ডেকে পাঠালেন। ইতিমধ্যে আগের রাতে ড. ফখরুদ্দীন আহমদের গভর্নর হিসেবে নিয়োগের খবর টেলিভিশনে ও পরদিন ভোরে খবরের কাগজে ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে।

মন্ত্রীর কক্ষে ঢুকে এক বিমর্ষ সাইফুর রহমানকে দেখতে পেলাম।

—আরে, তোমার বাড়ি যে ফরিদপুর তা তো আমাকে বলোনি! ফরিদপুরের লোককে স্পর্শকাতর পদে পার করা খুব কঠিন। হুদা, আমি খুবই দুঃখিত, তোমার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়নি।

মন্ত্রীকে তাঁর চেষ্টা এবং আমার প্রতি আস্থা রাখার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এলাম।

গভর্নর পদে নিয়োগের কাহিনি বাংলাদেশের প্রশাসনে প্রতিদিন ঘটে যাওয়া অসংখ্য বিয়োগান্ত নাটকের একটি ক্ষুদ্র পর্ব। আমার পর্বটি শেষ হয়েও শেষ হলো না—আরেকটি পর্ব বাকি ছিল। সেই কাহিনি সংক্ষেপে বলেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার চাকরিজীবনে ঘটে যাওয়া কাহিনি বর্ণনার ইতি টানতে চাই।

কৃষি ব্যাংকে বোর্ড সভা কিংবা নির্বাহী কমিটির সভা থাকলে ওই সব দিন আমি ব্যাংক অফিসে যাই। আমার পিএস অনেক দিন ধরে এক কর্মচারী দম্পতিকে সাক্ষাৎকার দেওয়ার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করছিল।

—আমি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যাপারে বোর্ডের বাইরে নীতিগতভাবে কোনো হস্তক্ষেপ করতে চাই না। কর্মচারী প্রশাসন বোর্ড ম্যানেজমেন্টের ব্যাপার। তারাই এসব বিষয় দেখবে।

—স্যার, আপনার কথাই ঠিক। তবে এই দম্পতির বিষয় নিতান্তই মানবিক এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক পর্যায়ে তাঁদের সমস্যার সমাধান হচ্ছে না।

অগত্যা আমার অবস্থান থেকে সরে তাদের সঙ্গে আমি দেখা করতে সম্মত হলাম। আজকের বোর্ড মিটিং শেষ করে আমি দুই সপ্তাহের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে আমার মেয়ের সমাবর্তন উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য ইন্ডিয়ানার ব্লুমিংটনে যাব। তার আগেই আমি সব কাজ শেষ করে খোলা মনে বাইরে যেতে চাই। অনুমতি দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই এক নবীন দম্পতি আমার কক্ষে প্রবেশ করল। প্রথমে মহিলা, দৃশ্যত অন্তঃসত্ত্বা, পেছনে তার স্বামী। মহিলাই কথা বলা শুরু করল।

—স্যার, আমি আর আমার স্বামী—আমরা দুজনেই ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার। আগামী মাসে আমার প্রথম সন্তান ডেলিভারির তারিখ ডাক্তার নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ অবস্থায় আমাকে বরিশালের এক থানায় আর আমার স্বামীকে পটুয়াখালীর পাথরঘাটায় বদলি করা হয়েছে। স্যার, বরিশালের প্রত্যন্ত থানায় আমার বিপদ হলে সেখানে আমাকে কে দেখবে? আমাকে দেখাশোনার কেউ নেই। দয়া করে আমাদের উভয়ের এই বদলির আদেশ বাতিল করে দিন।

—কৃষি ব্যাংকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলিসংক্রান্ত নীতিমালা আছে। সেই বিধি অনুযায়ী আপনার মতো অবস্থায় কাউকে তো বদলি করা যায় না। আপনারা কি দীর্ঘকাল ধরে ঢাকায় আছেন?

—স্যার, নীতিমালা আছে ঠিকই। সে অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ আমাদের বদলি করতে পারে না। তা ছাড়া এক বছরও পূর্ণ হয়নি আমরা মফস্বল থেকে ঢাকায় এসেছি। এক জায়গাতে আমরা কমপক্ষে তিন বছর একনাগাড়ে থাকতে পারি।

—গুরুতর কোনো অভিযোগে আপনাদের কারও বিরুদ্ধে কি কোনো তদন্ত চলছে কিংবা আপনাদের কেউ কি শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছেন?

—না, স্যার, ওসব কিছু নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—সবকিছুই আপনাদের পক্ষে আছে। তবে আপনাদের বদলি করা হলো কেন? কারণ কী?

—স্যার, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আমরা বিএনপি-দলীয় সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে কাজ করেছি—এই অপরাধে ওই অ্যাসোসিয়েশনের চাপে আমাদের বদলি করা হয়েছে।

আমি ইন্টারকমে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাজেদুর রহমানকে এই কেসটি সম্পর্কে তিনি অবহিত আছেন কি না, জিজ্ঞেস করলাম।

—স্যার, কেসটি আমি ভালোভাবেই জানি।

—বদলি নীতিমালার আলোকে এদের বদলি করার কোনো কারণ আছে কি?

—সত্যি বলতে কি, স্যার, নাই।

—তবে কেন এদের বদলি করা হলো। বদলি করা যথার্থ হলেও মহিলার যা অবস্থা, তাতে আর কিছু না হোক, মানবিক কারণেও তাদের বদলি আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। আপনি কি দয়া করে এদের বদলির আদেশ বাতিল করবেন?

—স্যার, আপনার কাছে আমি মাফ চাই। এই বদলির আদেশ বাতিল করলে আমার চাকরি থাকবে না।

—বিষয়টি তাহলে এই পর্যায়ে নেমে গেছে? ঠিক আছে। আমি এই আদেশ বাতিলের জন্য আপনাকে বোর্ডের সিদ্ধান্ত দিচ্ছি। বোর্ডের কার্যবিবরণীর জন্য অপেক্ষা না করে আজই আদেশ জারি করবেন—এই মর্মে কার্যবিবরণীতে লেখা থাকবে।

AMARBOI.COM

পরে বিবিধ বিষয়ে বোর্ড সভায় বিষয়টি তুলে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সঙ্গে আলাপমতো তাঁর হাতে সেদিনই সিদ্ধান্ত পৌঁছে দিলাম। পরদিন সন্ধ্যার ফ্লাইটে ইন্ডিয়ানার উদ্দেশে আমি ঢাকা ত্যাগ করলাম।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ঢাকা ফিরে বিমানবন্দরেই আমার স্ত্রী আমাকে খবরটা শোনালেন। কিছুদিন আগে কৃষি ব্যাংকের চেয়ারম্যানের পদ থেকে আমাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। নতুন চেয়ারম্যান আরেক সিএসপি অফিসার আহবাব আহমদ আমি ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে তাঁর দায়িত্বভার বুঝে নিয়েছেন। অথচ আমি আমার পূর্বসূরিকে আমার প্রথম বোর্ড মিটিংয়ে বিশেষভাবে দাওয়াত করে তাঁকে মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়ন করে সসম্মানে বিদায় দিয়েছিলাম। রাজনৈতিক পর্যায়ের কালিমা যেন প্রশাসনকে কলুষিত না করে, সেটি আমার মনোবাসনা ছিল। কিন্তু আমারই এক সিএসপি সহকর্মীর হাতে আমার সে মনোবাঞ্ছা অপূর্ণই থেকে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বাচন কমিশনের সময়কাল

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনে আমার অপ্রত্যাশিত নিয়োগ-নেপথ্যের কথা দিয়ে যে কাহিনির শুরু করা হয়েছিল, প্রায় সাত যুগ ধরে যাপিত জীবনের কিছু খণ্ডচিত্র তুলে ধরার পর সেই স্থগিত কাহিনির একটি পরম্পরা খুঁজে পাওয়া যাবে। নির্বাচন কমিশনে পাঁচ বছর মেয়াদি আমার সময়কালের কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করে এই কাহিনির সমাপ্তি টানতে চাই।

AMARBOI.COM

কতিপয় ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ

কমিশনের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার: প্রনিকের দায়িত্ব গ্রহণের পর নির্বাচন কমিশনের হৃত ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করাই ছিল আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। প্রতিষ্ঠানের পদে সমাসীন হলে আপনা-আপনিই দেশের জনগণের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা আর আস্থা অর্জন করা যায় না। আচার-আচরণে, কথায় ও কাজে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে পূর্ণ স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও নিরপেক্ষতা বজায় রেখে জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য অনেক সময় ধরে চেষ্টা করতে হয়। ২০০৬-০৭ সালে দেশে চলমান সাংঘর্ষিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে কমিশনের প্রতিভূ হিসেবে প্রনিক ও অপর দুই কমিশনারের কথাবার্তা ও আচার-আচরণের যে চিত্র আমরা প্রতিদিন টেলিভিশনের পর্দায় দেখেছি কিংবা কাগজে এর রসাল বর্ণনা সবিস্তারে পাঠ করেছি, তাতে কমিশনের ভাবমূর্তির চূড়ান্ত অধোগতির অনেকগুলো কারণের মধ্যে কমিশনকে একটি একক সত্তা হিসেবে জনগণের সামনে উপস্থাপনের ব্যর্থতাই প্রধান বলে মনে হয়েছে। কমিশনারদের ব্যক্তিত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি কিংবা কার্যক্ষেত্রের পূর্ব-অভিজ্ঞতা ভিন্নতর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হওয়াই স্বাভাবিক এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনের বিবেচ্য বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তাদের মতের ভিন্নতা থাকতে পারে। তবে প্রতিষ্ঠানের অন্তর্নিহিত শক্তি বিকাশের স্বার্থে নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে এসব মতদ্বৈধতা মিটিয়ে জনগণের সামনে একক বক্তব্য তুলে ধরাই এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের রীতি। নির্দ্বিধায় ও নিঃসংকোচে আলাপ-আলোচনার অবারিত সুযোগ, ভিন্ন মতের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সর্বোপরি, অধিকতর গ্রহণযোগ্য ভিন্ন মত গ্রহণের ঔদার্যের মাধ্যমে কমিশনাররা নিজেদের একটি শক্তিশালী টিম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে কমিশনের একাত্মতা নিশ্চিত করতে পারেন। আর এ কাজে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে প্রনিককেই, কেননা, তিনিই কমিশনারদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি।

জীবনে আমরা যা কিছুই করি না কেন, তা আমাদের অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। অতীতের অবিচ্ছেদ্য পরম্পরার ওপর বর্তমান প্রতিষ্ঠিত এবং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই তিন কালচক্রের মধ্যে একটি সেতুবন্ধ রচিত হয়। তবে কখনো কখনো ভাবহীন, গতিহীন ও ম্রিয়মাণ প্রতিষ্ঠানে জীবনের সঞ্চার করার স্বার্থে অতীতের কিছু কিছু বিষয়কে ঝেড়ে ফেলে নতুন নতুন উদ্যোগের সঙ্গে পরিশুদ্ধ অতীতকে মিলিয়ে নতুন পথের সন্ধান করতে হয়। সব প্রতিষ্ঠানই রক্ষণশীল। পরিবর্তন সহসা কেউ মেনে নিতে চায় না। নতুনের মধ্যে অভিনবত্ব আছে। তবে এর সফলতার বিষয়টি ঝুঁকিপূর্ণ। এসব জেনেও কমিশনের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে আমরা বেশ কিছু নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছি, যা আগের সব কমিশন থেকে আমাদের স্বাতন্ত্র্য প্রদান করেছে।

যেহেতু আমি মনে করেছি কমিশনকে একটি শক্তিশালী টিম হিসেবে রূপান্তরের দায়িত্ব মূলত প্রনিক-এর, সে লক্ষ্যে শুরুতেই আমি পদ্ধতি উন্নয়নের পাশাপাশি কিছু ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগও নিই।

আমার একটি ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ ছিল আমার সঙ্গে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠান এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকালে অপর দুই কমিশনারের উপস্থিতি নিশ্চিত করা। আমাদের সময় দেশের সার্বিক পরিস্থিতির কারণে নির্বাচন কমিশনের গুরুত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন মহলের বক্তব্য, মিডিয়া কাভারেজ এবং জনগণের প্রত্যাশা থেকে অনেক সময়ই আমার মনে হয়েছে, যেন এই কমিশনের কার্যক্রমের ওপরই দেশ ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। দেশের অসংখ্য রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি ছাড়াও বহু বিদেশি পদস্থ ব্যক্তি প্রায়ই কমিশনে নির্বাচনসংক্রান্ত সর্বশেষ পরিস্থিতি জানার জন্য আসতেন। এঁদের মধ্যে প্রভাবশালী দেশগুলোর রাষ্ট্রদূতেরা তো ছিলেনই, এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাড়া অন্য বহিরাগত যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাদের কাছে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে কমনওয়েলথের দুই সেক্রেটারি জেনারেল ডন ম্যাককিনন ও কমলেশ শর্মা, ব্রিটিশ লেবার পার্টির এমপি ও পররাষ্ট্রবিষয়ক স্টেট সেক্রেটারি ডেভিড মিলিব্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি রিচার্ড বাউচার ও একই বিভাগের সহকারী আন্ডার সেক্রেটারি জন গ্যাসট্রাইট এবং ইউএনডিপির প্রশাসক কামাল দরবেশের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই এককভাবে শুধু আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইতেন। আমার পূর্বসূরিরাও তা-ই করেছেন—শুধু সাক্ষাৎকারের সংক্ষিপ্তসার রাখার জন্য সচিবালয়ের একজন পদস্থ কর্মকর্তা উপস্থিত থাকতেন। নিজেদের মধ্যে যেন ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয় এবং কার সঙ্গে কী আলোচনা হচ্ছে সে সম্পর্কে অপর কমিশনারদের অবহিত রাখার জন্যই আমি তাঁদের উপস্থিতি মোটামুটি একটা রুটিনে পরিণত করে ফেলেছিলাম। আলাপচারিতা মূলত আমার সঙ্গেই হতো, তবে আমার দুই সহকর্মীকেও অবাধে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছি।

একইভাবে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনেও সব সময়ই উভয় কমিশনারকেই পাশে রেখেছি। অপর কমিশনাররা অধিকাংশ সময়ই কোনো বক্তব্য না দিলেও জনগণ পূর্ণ কমিশনকে একত্রে দেখতে পেয়ে কমিশনের একক সত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে। কিছুদিন আগে প্রকাশ্যে বিতর্কে লিপ্ত প্রনিক ও নির্বাচন কমিশনারদের চিত্রের পাশাপাশি আমাদের পূর্ণ কমিশনের রীতিসিদ্ধ উপস্থিতি কমিশন সম্পর্কে জনগণের নেতিবাচক ধারণা ক্রমান্বয়ে পাল্টে দিতে শুরু করে।

দেশের বাইরে বিভিন্ন ধরনের সম্মেলন কিংবা সেমিনারে অংশগ্রহণ কিংবা অনুষ্ঠেয় সংসদ নির্বাচন প্রত্যক্ষ করার জন্য বিভিন্ন নির্বাচন কমিশন কিংবা সংস্থা থেকে আমাকে যোগদানের জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করা হতো। আমার পূর্ণ মেয়াদকালে শুধু একটি আমন্ত্রণ আমার পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব না হলে আমার কোনো সহকর্মী কমিশনারকে মনোনীত করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। আমি আমাদের তিনজনের মধ্যে বিদেশ ভ্রমণের সমান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আয়োজনকারী নির্বাচন কমিশন কিংবা সংস্থাকে বিকল্প প্রতিনিধি গ্রহণে সম্মত করিয়ে আমার সহকর্মী কোনো কমিশনারের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছি।

কর্মচারী প্রশাসন ও প্রতিষ্ঠান উন্নয়নসংক্রান্ত বিষয়াবলি সম্পূর্ণভাবে প্রনিক-এর একক কর্তৃত্বাধীন। কিন্তু তবু এসব বিষয় নিয়ে যেন কোনো ধরনের কাদা-ছোড়াছুড়ি না হয়, সে জন্য আমি কমিশনারদের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনানুষ্ঠানিক আলোচনা করে এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাঁদের মতামত গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত দিয়েছি। এ ধরনের আলোচনা কিংবা মতামত গ্রহণ করার কোনো আবশ্যকতা না থাকলেও কমিশনের একক সত্তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমি এই ধারা অনুসরণ করেছি।

কমিশনের একক সত্তা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে প্রনিক হিসেবে আমার সর্বাত্মক চেষ্টার পরও মাঝেমধ্যে যে তা হুমকির সম্মুখীন হয়নি, তা নয়। তবে পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে আমাকে বহুবার ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। এর মধ্যে যে বিষয়টি নির্বাচন কমিশনে আমাদের মেয়াদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার গভীর উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার কারণ ছিল তা হলো, আমার অপর দুই সহকর্মীর প্রতিনিয়ত কমিশনের কর্মসূচি কিংবা বিবেচ্য বিষয়ের ওপর মিডিয়াতে আগাম বক্তব্য কিংবা মতামত প্রদান। সব সাংবিধানিক পদই অত্যন্ত স্পর্শকাতর; তবে কমিশনারের পদটি এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্পর্শকাতর। এসব পদাধিকারীর চালচলনের বিষয়ে কিছু অলিখিত বিধান আছে, যা অনুসরণ শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, আবশ্যিকও বটে। কমিশনাররা যত্রতত্র যেতে পারেন না এবং যেকোনো ফোরামে যখন খুশি তাঁদের বক্তব্য কিংবা মতামত ব্যক্ত করতে পারেন না। নির্বাচন কমিশনের প্রতিটি পদক্ষেপ এবং কার্যক্রম সম্পর্কে জানার অধিকার অবশ্যই দেশবাসীর আছে এবং দেশে গণতন্ত্রের সুষ্ঠু ধারা প্রবর্তনের লক্ষ্যে তথ্যের অবাধ প্রবাহ অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। মাঠপর্যায়ে, বিভিন্ন সংস্থায় এবং মন্ত্রণালয়ে কাজ করে আমি শিখেছি যে সংগঠনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য জনগণকে অবহিত রাখা এবং তাদের মতামত গ্রহণ করা কত জরুরি। তথ্যপ্রবাহের মাধ্যমেই একটি প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি সম্পর্কে জনগণ নিশ্চিত হতে পারে। কিন্তু সব সংগঠনেই এই তথ্য প্রদানের একটি স্বীকৃত পদ্ধতি আছে : তা হলো—দেশি-বিদেশি সংস্থা কিংবা মিডিয়ার মাধ্যমে তথ্য প্রকাশের একমাত্র অধিকার ওই প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কিংবা তাঁর নির্দেশিত অপর কোনো দায়িত্ববান ব্যক্তির। নির্বাচন কমিশনের ক্ষেত্রে এ দায়িত্ব প্রনিক-এর। কেননা, তিনিই কমিশনের প্রধান নির্বাহী।

দেশের মন্ত্রিপরিষদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংস্থার বোর্ডে বিবেচিত সমুদয় বিষয় প্রকাশ করার আগ পর্যন্ত অত্যন্ত গোপনীয় হিসেবে চিহ্নিত থাকে এবং কেবল স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই তা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হয়। আমার দুই সহকর্মী এসব বিষয় ভালোভাবেই জানেন। তাঁরা উভয়েই দীর্ঘকাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন। গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করেছি যে কমিশন সভায় আলোচনার পর্যায়ে আছে এমন বিষয় নিয়েও তাঁরা নির্দ্বিধায় মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলেছেন। এ বিষয়ে আমি এমন যুক্তি শুনেছি যে এভাবে আগেভাগে বিবেচ্য বিষয় মিডিয়াতে প্রকাশ করলে তা ওই প্রস্তাবের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে সহায়তা করে। কোন বিষয়ে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করা হবে এবং কী পদ্ধতিতে তা করা হবে, এটা কমিশনের সিদ্ধান্তের ব্যাপার—কোনো কমিশনার এককভাবে তাৎক্ষণিক এ ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না।

প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে মিডিয়ার সামনে যখন-তখন অবাধে কথা বলার প্রবণতা অনেক সময়ই কমিশনকে বিব্রতকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। দু-এক সময় তা কমিশনারদের জন্য দুঃখের কারণও হয়েছে। বিচারাধীন একটি মামলার বিষয়ে মন্তব্যের কারণে কমিশনার ছহুল হোসাইনকে আদালত অবমাননার দায়ে কোর্টে দাঁড় করানোর উপক্রম হয়েছিল, যা থেকে তাঁকে রক্ষা করা হয়েছিল বহু কষ্টে।

আমার সময়ে মিডিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়ে কোনো লিখিত বিধান ছিল না। আমি বিশ্বাস করেছিলাম যে সাংবিধানিক পদাধিকারীদের জন্য অলিখিত বিধানই যথেষ্ট। তবে আমার তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইনের অধীনে যখন বিধিমালার খসড়া তৈরি করছিলাম, তখন এই বিষয়ের ওপর একটি ধারা সংযুক্ত করা হয়েছে। সেই বিধি আমাদের সময়ই গেজেটে প্রকাশের পর চালু হয়েছে। আশা করি, ভবিষ্যতে এই বিধির আলোকে মিডিয়ার সঙ্গে কমিশনের সংযোগের পদ্ধতি সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করা হবে।

মিডিয়াতে বক্তব্য প্রদান সম্পর্কে আমাদের পরস্পরবিরোধী অবস্থান দেশের আপামর জনগণ না জানলেও কমিশনের কর্মকর্তা এবং মিডিয়ার কর্মীরা ভালোভাবেই জানতেন। তবে বিষয়টা অনেকখানি নৈর্ব্যক্তিক হওয়ার কারণে এহেন আচরণের লাভ-ক্ষতি ব্যক্তিগত হিসাব-নিকাশের ঊর্ধ্বে ছিল। কিন্তু অপর যে বিষয়টি আমি তুলে ধরতে চাই, সেটা মোটেই নৈর্ব্যক্তিক ছিল না এবং আমার অবস্থানে অন্য যেকোনো ব্যক্তি এ নিয়ে অবশ্যই ক্ষুব্ধ হতেন। কমিশনের একক সত্তা বজায় রাখতে গিয়ে যখনই এই বিষয়টা নিয়ে বিভিন্ন মহলে কিংবা মিডিয়াতে আলাপ-আলোচনা হয়েছে, আমি নিশ্চুপ থেকেছি। একক সত্তা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজেদের মধ্যে মতানৈক্যের বিষয় নিয়ে আমরা কোনো প্রকাশ্য বিতর্কে যাব না—আমার সহকর্মীরা এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করলেও আমি আমাদের সিদ্ধান্তে অটল থেকেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কমিশন ও প্রনিক-এর দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত কমিশন সচিবালয় দুই ধরনের কাজে সহায়তা করে থাকে। প্রথমত, নির্বাচনসংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজ এবং দ্বিতীয়ত, প্রশাসন ও উন্নয়নসংক্রান্ত কার্যাবলি। নির্বাচনসংশ্লিষ্ট কাজ কমিশনের আওতাভুক্ত এবং প্রনিক এককভাবে এসব বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না। কমিশন সভায় প্রনিক সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন ঠিকই; তবে এ ক্ষেত্রে তিনি কেবল সমকক্ষদের মধ্যে প্রথম (first among the equals)। সভায় আলোচ্যসূচিভুক্ত কোনো বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত না হলে ভোটাভুটির মাধ্যমে সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত বিকল্প গ্রহণ বাধ্যতামূলক। প্রনিক কোনো বিকল্পের পক্ষে একক ভোটদাতা হলে তাঁকে অপর দুই কমিশনার সমর্থিত প্রস্তাবই মেনে নিতে হবে। এই সীমাবদ্ধতা বাদে প্রনিক কমিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং কর্মচারী প্রশাসন ও উন্নয়নসম্পর্কিত বিষয়াদি সম্পূর্ণ তাঁর এখতিয়ারভুক্ত। একটি সংস্থায় সিইও যেমনভাবে প্রশাসনের পূর্ণ দায়িত্বে থাকেন, এখানেও তা-ই। প্রশাসনে দক্ষতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ক্ষমতার একটি কেন্দ্রবিন্দু থাকা অতি প্রয়োজনীয়, অন্যথায় unity of command বিঘ্নিত হয়ে অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে কমিশনের প্রশাসনে প্রনিক-এর একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ২০০৮ সালের ৯ মার্চ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় অধ্যাদেশ, ২০০৮ জারি হয়। এই অধ্যাদেশ জারির আগে কমিশন সচিবালয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিল। দীর্ঘদিন ধরে দেশের সুশীল সমাজ, বিশেষজ্ঞ মহল, রাজনৈতিক দল ও গণমাধ্যম অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বিযুক্ত করে কমিশনকে একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের দাবি জানিয়ে আসছিল। রাজনৈতিক দলগুলোর এ বিষয়ে অঙ্গীকার থাকলেও ক্ষমতায় গিয়ে তারা আর তাদের কথা রাখেনি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ড. ফখরুদ্দীন আহমদ নিজ উদ্যোগে আমাদের সঙ্গে এক সভায় এ কাজটি সম্পন্ন করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। বলা যায়, তাঁরই একক প্রচেষ্টায় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে আলাপ-আলোচনার পর ২০০৭ সালের ২৩ জুন উপদেষ্টা পরিষদের সভায় একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন সচিবালয় অধ্যাদেশ জারির বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ৩০ জুলাই আইন মন্ত্রণালয় প্রণীত একটি খসড়া কমিশনের মতামতের জন্য পাঠানো হলে সেটিতে কমিশনকে যথেষ্ট পরিমাণে আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান না করে শুধু সচিবালয়কে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বিযুক্ত করা যথেষ্ট নয় বলে আমরা মতামত প্রদান করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরই পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন থেকেই জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের আদলে একটি খসড়া প্রস্তুত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং কমিশনে সরকার থেকে প্রেষণে নিযুক্ত যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ হোসেন একটি খসড়া প্রস্তুত করে কমিশনের বিবেচনার জন্য কমিশন সভায় পেশ করেন। উল্লেখ্য, ওই খসড়াতে সচিবালয়ের সার্বিক কর্তৃত্ব প্রনিক-এর ওপর ন্যস্ত করা হয়। কিছু পরিবর্তনের পর ওই খসড়াটি কমিশন কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য তা আইন মন্ত্রণালয়ে অগ্রায়ণ করা হয়। ওই পর্যায়েও কিন্তু প্রনিক-এর একক কর্তৃত্বের ধারাটি বহাল ছিল এবং কারও তরফ থেকে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্যও পাওয়া যায়নি। খসড়াটি সব পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে, এমন সময় দুই কমিশনার আমার কাছে এসে একক কর্তৃত্বের ধারাটির বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করেন। যেকোনো প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনে একক কর্তৃত্ব থাকতে হয় এবং এখানেও তা-ই হয়েছে—এই মর্মে আমি আমার অভিমত ব্যক্ত করি। দুই কমিশনার বিষয়টি নিয়ে উপদেষ্টার সঙ্গে আলাপ করতে চান এবং তাঁর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের আয়োজন করতে আমাকে অনুরোধ করেন। ইতিমধ্যে কমিশনাররা বিষয়টিকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসেন এবং মিডিয়াতে এ বিষয়ে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করতে থাকেন। মিডিয়ার সঙ্গে সংযোগের বিষয়ে আমি আমার নীতিতে অটল থাকি এবং অনেক আপত্তিকর বক্তব্য দেওয়া হতে থাকলেও আমি সম্পূর্ণ নীরব থাকি। প্রধান উপদেষ্টাও কমিশনারদের তরফ থেকে এ ধরনের মন্তব্যে খুবই মর্মাহত হন। তবু উচ্চপর্যায়ে তাঁদের বক্তব্য পেশের সুযোগ করে দেওয়া আমার দায়িত্ব বিবেচনা করে আমি প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে একটি সভার আয়োজন করি। আমি আমার সহকর্মীদের জানিয়ে দিই যে সভায় আমি উপস্থিত থাকব ঠিকই, তবে আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে আমি কোনো বক্তব্য দেব না। নির্ধারিত দিনে প্রধান উপদেষ্টা দীর্ঘ দেড় ঘণ্টা ধরে ধৈর্যসহকারে কমিশনারদের বক্তব্য শুনলেন। তাঁর শেষ কথা এই ছিল যে দুনিয়ার সব দেশে সব প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব ওই প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীর হাতেই থাকে এবং এখানেও তা-ই হবে। কিন্তু প্রধান উপদেষ্টার এই দৃঢ় সিদ্ধান্তের পরও তাঁরা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। কিছুকাল পর তাঁরা আরেক দফা প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। আমি সরাসরি তাঁর সঙ্গে কথা বলে আরেকটি সভা অনুষ্ঠানের অনুরোধ করলে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেও সভা করতে সম্মত হলেন। ওই সভায় আইন উপদেষ্টা হাসান আরিফও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু অনেক যুক্তি-তর্কও প্রধান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপদেষ্টার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে সক্ষম হলো না। সভাকক্ষ ছেড়ে যাওয়ার আগে কমিশনারদের উদ্দেশে তিনি বললেন, আপনারা চাইলে আইন উপদেষ্টার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করতে পারেন। তবে অধ্যাদেশটির অনুমোদনে আর বিলম্ব করা ঠিক হবে না। পরে একসময় উভয় কমিশনার আইন উপদেষ্টার কাছে গেলেন, কিন্তু গৃহীত সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিতই থাকল।

অধ্যাদেশের যে খসড়া কমিশনারদের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো, সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যেটি উপদেষ্টা পরিষদেও অনুমোদিত হলো, সরকারপ্রধানের সঙ্গে দুই দফা সভার পরও যা অপরিবর্তিত রাখা হলো এবং পরে আরেক দফা আইন উপদেষ্টার পরীক্ষায়ও টিকে গেল, তা গ্রহণ না করার বিপক্ষে আমি কোনো যুক্তি খুঁজে পাইনি। এ ধরনের একটি অনভিপ্রেত পরিস্থিতির মুখে কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি নিজ হাতে নয়টি আইন ও বিধির সংশোধনী/নতুন প্রস্তাবনা তৈরি করে কমিশনের বিবেচনার জন্য পেশ করেছি। শুধু কমিশন সচিবালয় অধ্যাদেশটি যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ হোসেনের হাতে তৈরি হয়েছিল। এই বিরাট কর্মযজ্ঞে সচিবালয়ের কর্মকর্তারা শতভাগ শ্রম দিয়ে প্রতিটি কমিশন সভায় উত্থাপিত সংশোধনীগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একাধিক পরিবর্তিত খসড়া তৈরি করে আমাদের সহায়তা করেছেন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই আমার হাতে তৈরি অপূর্ণাঙ্গ খসড়াগুলো পূর্ণাঙ্গতা পেয়েছে।

২০০৮ সালের নভেম্বরে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনে একটি সরকারি নৈশভোজ শেষে তাঁর কাছ থেকে বিদায়কালে অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত স্বরে তিনি বললেন, একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন সচিবালয় তোমার পূর্বসূরি কমিশন এবং তোমাদের স্বপ্ন ছিল। কোনো সরকার এ কাজটি করেনি। আমরা করলাম। কোথায় তোমরা আমাদের ধন্যবাদ জানাবে, তা না করে তোমার সহকর্মী দুজন মিডিয়াতে নানা ধরনের বক্তব্য দিয়ে একটি ভালো উদ্যোগের সৌকর্যকে অনেকটাই নষ্ট করে ফেলেছে। আশা করি, একদিন তারা তাদের ভুলটি বুঝতে সক্ষম হবে।

উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর নতুন আইনমন্ত্রীর কাছেও কমিশনাররা বিষয়টি কয়েকবার উত্থাপন করেছেন। কিন্তু কর্তৃত্বের ধারাটি যথাস্থানেই আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

কমিশন সভায় পদ্ধতি উন্নয়ন : অনানুষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত এসব উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি আমি কমিশন সভায় পদ্ধতি উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করি। প্রথম কমিশন সভা আয়োজন করতে গিয়ে জানলাম যে সভা করার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য কমিশনে কোনো কার্যপ্রণালি বিধি নেই। অথচ মন্ত্রিপরিষদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংসদীয় কমিটি, মন্ত্রিসভা উপকমিটি, বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা কিংবা সরকারি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভা, কমিটি কিংবা বোর্ডের সভায় গ্রহণ করা হয়। এসব সভা পরিচালনার জন্য যে কার্যপ্রণালি বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে, তাতে সভা অনুষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তি জারি করা থেকে শুরু করে এজেন্ডা তৈরি, আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি, গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর বাস্তবায়ন, সমুদয় দলিল ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষণের মতো বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশাবলি দেওয়া আছে।

কমিশনে এ ধরনের কার্যপ্রণালি বিধি না থাকার অন্যতম কারণ নথির মাধ্যমে কমিশনের কাজ নির্বাহ করার প্রবণতা। নথিতে সিদ্ধান্ত প্রদানের ফলে অতীতে কোনো বিষয়ে কমিশনের কী সিদ্ধান্ত ছিল, কেউ তা জানতে আগ্রহী হলে বহু নথি খোঁজাখুঁজি করে কয়েক দিন অপেক্ষা করার পর তা জানতে হবে; তাৎক্ষণিকভাবে জানার কোনো উপায় নেই।

আমরা নথিতে সিদ্ধান্ত প্রদানের প্রাধান্যকে পেছনে ফেলে সভা অনুষ্ঠানকে সবার ওপরে স্থান দিই। লেখার মধ্যে অনেকেরই অনেক জড়তা, আলস্য কিংবা খোলাখুলি বক্তব্য রাখার বিষয়ে সংশয় থাকে। কিন্তু আলোচনা অনেক বেশি উন্মুক্ত ও পরিব্যাপ্ত। লেখার মধ্যে যেসব সীমাবদ্ধতা থাকে, আলোচনায় তা থেকে অনেকটাই মুক্ত হওয়া যায়। আমরা কার্যপ্রণালি বিধি তৈরি পর্যন্ত অপেক্ষা না করে প্রথম সভা অনুষ্ঠান থেকেই নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে একটা পদ্ধতির রূপরেখা তৈরি করি, যেটির ভিত্তিতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় অধ্যাদেশ জারির অব্যবহিত পরই এই বিধিমালা জারি হয়। আমাদের সময়ে মোট ৪২০টি কমিশন সভায় ১ হাজার ১৭টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর মধ্যে ৯৯৪টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয় এবং আমরা কমিশন ছাড়ার মুহূর্তে ২৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অপেক্ষায় ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রুটিন কিছু বিষয়ে কমিশনে আলোচনার প্রয়োজন হয় না। তবে আইনের বিধান পরিপালনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সব তথ্য নথিতে সংযোজন করে সব কমিশনারের স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, সব পর্যায়ের নির্বাচনের প্রতিটি আসনের ফলাফলের গেজেট প্রকাশের আগে সব কমিশনারকে নথিতে উপস্থাপিত আদেশপত্রে স্বাক্ষর করতে হয়। শুধু এই একটি বিষয়ের ওপরই আমাদের সময় পাঁচ হাজারের অধিক নথি আমাদের স্বাক্ষরের জন্য প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছিল। সভায় এবং নথিতে গৃহীত সমুদয় সিদ্ধান্ত কমিশন সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখাগুলোতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা আমরা নিশ্চিত করেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার প্রবর্তন : কমিশনের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথে বাধাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো দূরীকরণের উপায় নির্ধারণ এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারের রূপরেখা নির্ণয় করা ছিল কমিশনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমাদের অব্যবহিত আগের কমিশনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, বিশেষ করে নির্ভুল একটি ভোটার তালিকা তৈরির প্রশ্নে তাদের পরস্পরবিরোধী ও অবাস্তব কতিপয় উদ্যোগ জনমনে বিরূপ ধারণা ও সন্দেহের উদ্রেক করেছিল। অবশ্য শুধু ভোটার তালিকা ইস্যুতে ২০০৭ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছিল বললে বাংলাদেশের সংঘাতপূর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রেক্ষিত সার্বিকভাবে বোঝা যায় না। অতীতে নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে বিশ্বাসযোগ্যতার পাশাপাশি কালোটাকা ও পেশিশক্তির প্রভাব, নির্বাচনী আইনগুলোর অপর্যাপ্ততা, আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে অনীহা, ক্ষমতাসীন দল ও ব্যক্তিদের ক্ষমতার সীমাহীন অপব্যবহার এবং নির্বাচনসম্পর্কিত আপত্তিগুলো নিষ্পত্তিতে দীর্ঘ সময় ক্ষেপণ ও নানাবিধ অনাচারের অভিযোগও বিভিন্ন ফোরামে উচ্চকিত হয়েছে। এ সবকিছু থেকে প্রতীয়মান হয় যে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাধাগুলো বহুবিধ, জটিল ও নির্বাচনসংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের অনেক গভীরে প্রোথিত। হালকাভাবে ছোটখাটো সংস্কারের মাধ্যমে এই সমস্যার গভীরে যাওয়া যাবে না। আবার এ কথাও সত্যি যে অতীতে ছোটখাটো সংস্কারকাজ হাতে নিয়েও কমিশন প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়েছে। রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে আপত্তির কারণে জারি করার পরপরই কোনো কোনো আইন কিংবা আইনি সংশোধনী হয় বাতিল কিংবা নমনীয় করে সংশোধন করতে হয়েছে। অতীতে কমিশনের জন্য সবচেয়ে বিব্রতকর ছিল সরকারি উদ্যোগে একতরফাভাবে আইনি সংস্কার। এই প্রক্রিয়া নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সব দলের সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকারী তত্ত্বের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বিদ্যমান নির্বাচনী আইনের যেকোনো ধরনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন কিংবা সংযোজন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা লাভবান করে। আবার একই বিধান এক দলের জন্য সুবিধাজনক হলেও অন্য দলের জন্য তা ক্ষতির কারণ হতে পারে। কাজেই সব রাজনৈতিক দলের মতামত গ্রহণ না করে শুধু ক্ষমতাসীন দলের ইচ্ছা অনুযায়ী আইনি সংস্কার সম্পূর্ণ বৈষম্যমূলক ও অগণতান্ত্রিক।

সৌভাগ্যক্রমে আমরা দায়িত্ব গ্রহণের আগেই দেশের সুধীসমাজ, রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে কী করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়োজন, এ বিষয়ে জনগণের সঙ্গে ব্যাপক মতবিনিময় করে তাঁদের সুপারিশমালা তৈরি করেছেন। বিগত কয়েক বছরে এসব বিষয়ে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা মূল্যবান গবেষণা পরিচালনা করে প্রতিবেদন, নিবন্ধ ও সমীক্ষা প্রণয়ন করেছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এসব বিষয়ে বহু প্রতিবেদন বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। সমুদয় তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে কী ধরনের সংস্কারের প্রয়োজন, তা বিশদভাবে চিহ্নিত আছে। আইনি, প্রশাসনিক, ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজন এবং তা হতে হবে বহু বিস্তৃত ও ব্যাপক—এ সম্পর্কে কমিশনের কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। তবে এ ধরনের ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচির সফলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই এসব কাজে হাত দেওয়া সংগত বলে কমিশন মনে করে। সংস্কার বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও প্রধান উপদেষ্টা একাধিকবার তাঁদের সমর্থন ও সহযোগিতার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। তবে একটি অনির্বাচিত সরকারের সমর্থন দীর্ঘ মেয়াদে রাজনৈতিক সরকারের আমলে ওই সব সংস্কারের স্থায়িত্ব নিশ্চিত না-ও করতে পারে। কমিশনকে এমন একটা পদ্ধতি বের করতে হবে, যার মাধ্যমে সংস্কারপ্রক্রিয়া এগিয়ে নিলে এর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে অনেকটাই নিশ্চিত হওয়া যাবে।

আশির দশক থেকেই বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারণ, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ কিংবা আইনি কাঠামোর প্রয়োজনীয় সংযোজন, সংশোধন কিংবা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া (participatory decision making) প্রথমে দাতাগোষ্ঠীর মাধ্যমে এবং পরে সরকারের উদ্যোগে চালু করা হয়। এই পদ্ধতিতে কাজ করার আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছিল। এ পদ্ধতির আওতায় আমি স্বার্থসংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেক্টরের বহু নীতিমালা ও বিধিবিধান, জাতীয় পানিনীতি, উপকূলীয় অঞ্চলের ব্যবস্থাপনানীতি ও জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি প্রক্রিয়াকরণ করেছি। পানি একটি দুষ্প্রাপ্য সম্পদ এবং বিভিন্ন ব্যবহারকারীর পানি প্রাপ্যতার দাবির মধ্যে যথেষ্ট পরস্পরবিরোধিতা বিদ্যমান। পানিপ্রবাহের নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ কিংবা অন্য যেকোনো প্রকারের ব্যবহার সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করে না। উজানবাসীর জন্য যা লাভজনক, ভাটির মানুষের জন্য তা দুঃখের কারণ হতে পারে। পানি ব্যবস্থাপনায় টেকসই কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করতে হলে সবার সঙ্গে পরামর্শ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে তা প্রণয়ন অপরিহার্য। সে জন্য আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির চেয়ে অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণপ্রক্রিয়া অনুসরণ করে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে অনেক বেশি ভালো ফল পাওয়া গেছে। এই সফলতার সূত্র ধরে এই পদ্ধতিকে আইনের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক করে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে।

আমার পূর্ব অভিজ্ঞতার ওপর ভরসা করে আইনি সংস্কার কর্মসূচি প্রক্রিয়াকরণে অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণপ্রক্রিয়া অনুসরণের উদ্যোগ গ্রহণ করি। নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ করার ক্ষেত্রে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২; জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধিমালা, ১৯৯৬; এবং নির্বাচন কমিশন (রাজনৈতিক দল নিবন্ধীকরণ) বিধিমালা, ২০০১—এই তিনটি আইন ও বিধিমালার সংশোধনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। সুশীল সমাজের কাছ থেকে পাওয়া সংশোধনীর খসড়ার ওপর ভিত্তি করে আমি নিজেই অফিসের কাজের ফাঁকে ফাঁকে খসড়া তৈরি করে সেগুলো কমিশনে আলোচনার জন্য এজেন্ডাভুক্ত করি। এরপর অব্যাহতভাবে কমিশন আরও বহু সভায় মিলিত হয়ে ওই সব খসড়ার প্রতিটি লাইন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষার পর সংস্কার প্রস্তাবের একটি রূপরেখা প্রস্তুত করে।

এই রূপরেখার ওপর মতামত গ্রহণের জন্য কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে দেশের আপামর জনগণের অবগতি ও তাদের মন্তব্য প্রদানের জন্য প্রস্তাবনাগুলো মিডিয়াতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হবে এবং কমিশনের ওয়েবসাইটেও তা সংকলিত থাকবে। মুখোমুখি আলোচনার জন্য প্রথমে সুশীল সমাজের সঙ্গে বৈঠক করা হবে। ওই বৈঠকে প্রাপ্ত মন্তব্য ও সংশোধনীগুলো খসড়া প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করে পরে সিনিয়র সাংবাদিকদের সঙ্গে বৈঠক করা হবে। এই প্রক্রিয়ায় ওই সভায় প্রাপ্ত মতামত অন্তর্ভুক্ত করে খসড়াটি আরেক দফা সংশোধন করে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার কার্যপত্র তৈরি করা হবে।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কমিশনের সংলাপ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি একটি স্পর্শকাতর বিষয়। এ জন্য কয়েক দফা কমিশন সভায় আলোচনার পর আমন্ত্রণের মানদণ্ড, আলোচনার সময়সূচি, সংলাপের আলোচ্যসূচি ও সংলাপ অনুবর্তী কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আমাদের আলোচনা যেন তাদের রাজনৈতিক বক্তব্যে পর্যবসিত না হয়, সে জন্য আমরা আইনের খসড়াগুলো সন্নিবেশ করে একটি সুনির্দিষ্ট এজেন্ডা তৈরি করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সভার ১৫ দিন আগে আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে আমাদের প্রস্তাবিত বিভিন্ন ধারার সূত্রে তাদের সংশোধনী প্রস্তাব লিখিত আকারে পেশ করতে অনুরোধ করা হয়।

২০০৭ সালের ১২ সেপ্টেম্বর রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক আলোচনাকালে কমিশন প্রধানত সংস্কার কর্মসূচির বিভিন্ন বিষয়ের ওপর রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত শ্রবণ ও রেকর্ড করে কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে এসব মতামতের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো কথা বলেনি। তবে কোনো ধারা বা উপধারার ওপর ব্যাখ্যা চাওয়া হলেই তা করা হয়েছে এবং একইভাবে রাজনৈতিক দলের ব্যাখ্যাও গ্রহণ করা হয়েছে। মোট ১৬টি দলের সঙ্গে ২০০৭ সালের ১১ ডিসেম্বর প্রথম পর্যায়ের আলোচনা সমাপ্ত হয়।

প্রথম দফা সংলাপ অন্তে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে মূল প্রস্তাবনা সংশোধন করে দ্বিতীয় দফা সংলাপে বসার অপরিহার্যতা কমিশন অনুভব করে। ২০০৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় দফা সংলাপ শুরু হয়ে তা একই সালের ২৭ এপ্রিলে শেষ হয়।

নির্বাচনসংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ আমাদের কমিশনের একটি সফল ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ। এর আগে দু-একবার বিচ্ছিন্নভাবে সংলাপের চেষ্টা কমিশন করেছে; তবে সুপরিকল্পিত উপায়ে সুনির্দিষ্ট আলোচ্যসূচি মোতাবেক আলোচ্য বিষয়ের ওপর সুবিন্যস্ত কার্যক্রম তৈরি করে রাজনীতিবিদদের মুখোমুখি হওয়ায় এ আলোচনা বাস্তবসম্মত হয়েছে। প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলোর ওপর আনুষ্ঠানিক আলোচনাকালে রাজনৈতিক দলগুলোর নিজস্ব মতামত ও সুপারিশগুলোও ছিল বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী। রাজনৈতিক দলের যৌক্তিক সুপারিশগুলোর সিংহভাগই কমিশন গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিতে সন্নিবেশ করেছে। যেসব বিষয়ে গণতন্ত্রের ধারাকে মজবুত করতে কমিশন প্রস্তাবিত সংস্কার বহাল রাখার প্রয়োজন বলে মনে করেছে, সেসব সুপারিশ, রাজনৈতিক দলের কিছুটা ভিন্নমত থাকলেও কমিশন অপরিবর্তিত রেখেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সংলাপে অভিমত ব্যক্ত করা আমন্ত্রিতদের অধিকার; তবে সেগুলো গ্রহণ বা বর্জন কমিশনের দায়িত্ব।

দুই দফা ব্যাপক আলোচনার ভিত্তিতে, ২০০৮ সালে সংশোধিত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে নিম্নোক্ত প্রধান প্রধান বিষয়ে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—প্রার্থীর যোগ্যতা/অযোগ্যতা
—নির্বাচনী ব্যয়
—নির্বাচনী বিরোধ নিষ্পত্তি
—রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন

সব কটি রাজনৈতিক দলের প্রবল আপত্তির মুখেও কমিশন আইনে প্রথমবারের মতো 'না ভোট'-এর বিধান সন্নিবেশ করে। ২০০৯ সালে গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশটি আইনে রূপান্তরকালে রাজনৈতিক সরকার শুধু না ভোটের বিধানটি এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অংশ থেকে 'বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ'কে বাদ দেয়। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে সংশোধনী প্রস্তাবগুলো সন্নিবেশ করার ফলে তাদের মধ্যে একধরনের অংশদারির মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল, যে কারণে রাজনৈতিক সরকারের আমলেও এসবের স্থায়িত্ব বড় ধরনের কোনো বিরোধিতার সম্মুখীন হয়নি।

ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রস্তুতকরণ

AMARBOI.COM

ভোটার তালিকা প্রণয়নের বিদ্যমান পদ্ধতির সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয় সাধন করে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং একই সঙ্গে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) তৈরির সিদ্ধান্ত কমিশনের জন্য ছিল আরেকটি যুগান্তকারী ও ব্যতিক্রমধর্মী পদক্ষেপ। এই কার্যক্রমটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ এ জন্য যে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও সশস্ত্র বাহিনীর যৌথ নেতৃত্বে এটির ধারণাগত কাঠামো, প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রয়োজনীয় সম্পদ ও জনবলের বিন্যাস, প্রকল্প সংগঠন ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও এনআইডি বিতরণ প্রক্রিয়াসংক্রান্ত সমুদয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচির রূপরেখা তৈরির পর নির্বাচন কমিশন ও সশস্ত্র বাহিনী অংশীদারির ভিত্তিতে দেশের জনগণ এবং সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করে কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর কোনো একটি একক কর্মসূচিতে দলমত-নির্বিশেষে প্রায় ১৮ মাস ধরে জনগণের সঙ্গে সরকারের বিভিন্ন সংগঠনের এমন সংযোগ আর দেখা যায়নি।

দীর্ঘকাল ধরে সুশীল সমাজ ও রাজনৈতিক দলগুলো ভোটার তালিকা প্রণয়নের পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ—এমন একটা সন্দেহ পোষণ করে আসছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০০৫-০৬ সালে দেশব্যাপী পৃথক তিনটি 'বাড়ি বাড়ি ভোটার নিবন্ধন' সম্পন্ন করা হলেও ১ কোটির বেশি ভুয়া ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছে, এমন অভিযোগ ভোটার তালিকার নির্ভুলতা ও সঠিকতা সম্বন্ধে তাদের সন্দেহ আরও ঘনীভূত করে।

দেশের সুশীল সমাজ ও বিরোধী দল এই সমস্যার সমাধানকল্পে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নের বিষয়টি সামনে নিয়ে আসে। কিন্তু কাজটি জটিল এবং সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ বিবেচনা করে নবগঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ভোটার পরিচয় কার্ডের বিকল্প নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করে। পরে ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে ভোটার পরিচয় কার্ডের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরীর নেতৃত্বে আট সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে। এদের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর একটি বিশেষজ্ঞ দলও বিদেশে শান্তি মিশনে তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রণয়নের একটি কারিগরি প্রস্তাব তৈরি করার উদ্যোগ নেয়।

উভয় কমিটির রিপোর্টই ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) জারির বিষয়ে ইতিবাচক মন্তব্য প্রদান করে। একই ভোটারের একাধিক নিবন্ধন নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে জামিলুর রেজা কমিটি আঙুলের ছাপ চিহ্নিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার ব্যবহারেরও পরামর্শ দেন। মালামাল সংগ্রহের পর এক বছরের মধ্যে এই কর্মসূচি সমাপ্ত করা সম্ভব মর্মে উভয় কমিটি অভিমত নেয়।

এদিকে নির্বাচন কমিশন কয়েক সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন বিকল্প পর্যালোচনা করে ২০০৭ সালের ২১ মার্চে ছবিসহ ভোটার তালিকা ও এনআইডি প্রস্তুতকরণ বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ২০০৭ সালের ৫ এপ্রিল ভোটার তালিকা প্রণয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ওপর ১৮ মাসের একটি কর্মসূচি জনসমক্ষে প্রকাশ করে।

এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অযাচিত বেশ কিছু প্রস্তাব কমিশনে জমা পড়ে। এদের প্রকল্প ব্যয়ের পরিমাণ ২০০ থেকে ৬৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আর প্রকল্প বাস্তবায়নকাল ১৮ মাস থেকে চার বছর পর্যন্ত ব্যাপৃত। অন্যদিকে অনেক কম খরচে মালামাল সংগ্রহের পর মাত্র ১২ মাসের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করার প্রস্তাব সেনাবাহিনী থেকে পাওয়া যায়। এ ধরনের কাজে এদের পূর্ব-অভিজ্ঞতা, দেশব্যাপী তাদের সুশৃঙ্খল বাহিনী ও সংগঠনের অবস্থান, যানবাহন ও অন্য সরঞ্জামাদির সহজলভ্যতা, সর্বোপরি প্রকল্প বাস্তবায়নে তাদের অতীত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিজ্ঞতা—এসব বিষয় বিবেচনা করে কমিশন সেনাবাহিনীর মাধ্যমেই কাজটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়।

এই প্রকল্প নিয়ে ভাবনার শুরু থেকেই কমিশন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কারিগরি সহায়তা ও অর্থায়ন বিষয়েও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছিল। কমিশন এবং ইউএনডিপির যৌথ উদ্যোগে Preparation of Election Rolls with Photographs (PERP) প্রকল্প দলিল প্রস্তুত হয় এবং ২০০৭ সালের ২৭ আগস্ট উভয় পক্ষ এই দলিলে স্বাক্ষর করে। ৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাজেট ধার্য করা হয়, যার সিংহভাগ নির্ধারিত হয় আন্তর্জাতিক দাতাদের অনুদান হিসেবে। কমিশনকে এই প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য সেনাবাহিনীর একজন পদস্থ কর্মকর্তাকে প্রেষণে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়।

প্রকল্পের রূপরেখা নির্ণয় করে তা চালু করা হলেও সেনাবাহিনীর সঙ্গে কমিশনের এবং প্রকল্পের সম্পর্ক একটি আইনি কাঠামোর মধ্যে সুনির্দিষ্ট করা জরুরি বলে আমি মনে করি। ৫৭০ কোটি টাকার একটি প্রকল্পে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির জন্য কার কী দায়িত্ব, তা প্রতিটি ব্যয়ের খাত অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন। নির্বাচন কমিশনই যে PERP প্রকল্পের উদ্যোক্তা এবং প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্ভাবিত তথ্যভান্ডার এবং এনআইডির স্বত্বাধিকারী, প্রকল্প দলিলের বিভিন্ন ধারা তা নিশ্চিত করে। প্রাথমিকভাবে এই প্রকল্পের কারিগরি ডিজাইন একাধিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেনাবাহিনী চূড়ান্ত করলেও প্রকল্পের সার্বিক দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে কমিশনের ওপর অর্পণ করা হয়। কমিশনের উচ্চপর্যায়ে যোগাযোগের জন্য সেনাবাহিনীর জেনারেল পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে মনোনীত করা হয়। সর্বোপরি প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা, পরিবীক্ষণ ও সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য প্রনিক-এর নেতৃত্বে একটি আন্তসংস্থা প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়। এই প্রকল্পের বিষয়ে কমিশনের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সম্পর্ককে আনুষ্ঠানিকতা প্রদানের জন্য ২০০৭ সালের মে মাসে এই উভয় সংস্থার মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

বাড়ি বাড়ি নিবন্ধনের পর রেজিস্ট্রেশন সেন্টারে ছবি তোলা ও আঙুলের ছাপ গ্রহণের মিশ্র পদ্ধতি গ্রহণ করা ছিল এই প্রকল্পের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ উদ্ভাবন। সনাতন পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহকারী কিংবা রেজিস্ট্রেশন অফিসারের সম্মুখে শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়া সম্ভব ছিল। আর এখানেই সঠিক তালিকা প্রণয়নের ফাঁকির সূত্রটি নিহিত। ছবিসহ ভোটার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তালিকা পদ্ধতিতে বাড়ি বাড়ি না গেলে যেমন প্রাথমিকভাবে তালিকাভুক্ত করা যায় না এবং তা না হলে ছবি তোলা হয় না, তেমনি তালিকাভুক্তির পর সশরীরে নিবন্ধন কেন্দ্রে না গেলে ডাটাবেসে নাম তোলাও সম্ভব নয়। নিবন্ধনের দুই অংশ একে অন্যের পরিপূরক হওয়ায় ভোটার তালিকার নির্ভুলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। আর একই ব্যক্তি যাতে একাধিকবার ভোটার হতে না পারে, সে জন্য আঙুলের ছাপ মেলানোর সফটওয়্যারও সংযোজন করে সম্ভাব্য সব ধরনের জালিয়াতির পথ বন্ধ করা হয়েছে। নির্ধারিত সময় অন্তর এই ডাটাবেসকে ভোটার তালিকা আইনের বিধান অনুযায়ী ভোটার সংযোজন-বিয়োজন করে হালনাগাদ করা হয়। পাশাপাশি এনআইডি প্রস্তুতকরণ ও বিতরণের কাজও অব্যাহত রাখা হয়। ভবিষ্যতে ভোটার তালিকার সঠিকতা ইস্যুতে কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠান বাধাগ্রস্ত হবে না বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

ছবিসহ ভোটার তালিকার সফলতা সম্পর্কে আমাদের কিছু সংশয় ছিল। প্রথমত, জনগণ এই মিশ্র পদ্ধতি কতটা গ্রহণ করবে এবং দ্বিতীয়ত, পর্দানশীল ও রক্ষণশীল নারীরা তাঁদের ছবি ও আঙুলের ছাপ দিতে সম্মত হবেন কি না। গাজীপুর জেলার শ্রীপুরে অনুষ্ঠিত পাইলট প্রকল্প আমাদের সমস্ত সংশয়কে অমূলক প্রমাণ করে। ভোটার নিবন্ধনের সঙ্গে জাতীয় এনআইডিপ্রাপ্তিকে সংযুক্ত করার ফলে নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্রনির্বিশেষে সবাই নিজ উদ্যোগে ভোটার নিবন্ধনে আগ্রহী হয়। প্রয়োজনীয় ২২ ধরনের সেবাপ্রাপ্তির জন্য এনআইডি প্রদর্শনের বিষয় জনগণকে অবহিত করা হলে ভোটারদের নিবন্ধনে আগ্রহ আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী কোনো স্বীকৃত পরিচয়পত্রের অভাবে অনেক সময়ই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কিংবা বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনেক নিগ্রহ ও হয়রানির শিকার হয়েছে। তাদের জন্য জাতীয় এনআইডিপ্রাপ্তি ছিল একধরনের ক্ষমতায়ন ও সম্মানের বিষয়। আর নারীদের ছবি তোলা কিংবা আঙুলের ছাপ দেওয়ার বিষয়টিও তেমন কোনো বিঘ্নের সৃষ্টি করেনি। তবে এ বিষয়ে মসজিদের ইমাম ও অন্যান্য ধর্মীয় নেতারা আমাদের অনুরোধে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছেন।

এই প্রকল্প থেকে আরেকটি শিক্ষণীয় বিষয় ছিল এই যে PERP-এর মতো সূক্ষ্ম প্রযুক্তিনির্ভর, জটিল ও বহুমাত্রিক প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিনিয়ত অব্যাহতভাবে প্রয়োগকৃত পদ্ধতির পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, সংযোজন কিংবা বিয়োজন করার মানসিকতা থাকতে হবে। PERP প্রকল্প

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিটি পর্যায়ে এই অণুবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এবং শেষ নিবন্ধন কেন্দ্রে ব্যবহৃত পদ্ধতি শ্রীপুরের ব্যবহৃত পদ্ধতি থেকে অবশ্যই অনেক উন্নততর ও সমৃদ্ধ ছিল।

১৮ মাসব্যাপী PERP প্রকল্প সারা দেশে ১ লাখের বেশি ডাটা এন্ট্রি অপারেটরের মাধ্যমে ভোটার তালিকা নিবন্ধনের কাজ সম্পন্ন করেছে। এই অপারেটরদের অধিকাংশই ছিল এসএসসি কিংবা এইচএসসি পাস। সেনাবাহিনী সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের মাঠে নামিয়েছে। এদের অনেকেই আরও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আইটি সেক্টরে তাদের অবদান রাখছে। এই সেক্টরে এই প্রকল্পের অগ্রগামী ভূমিকা যেমন উল্লেখ করার মতো, তেমনি বহুসংখ্যক যুব মহিলাকে এই প্রকল্পে সম্পৃক্ত করে মহিলাদের কর্মসংস্থানেও অবদান রেখেছে।

জনগণ, কমিশন, সশস্ত্র বাহিনী, মাঠপর্যায়ের প্রশাসন, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম, এনজিও, বেসরকারি খাত ও আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠীর প্রত্যেকে অন্য অংশীদারদের তুলনায় তারা যে বিষয়ে বেশি সমর্থ, সেই সব ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে অংশীদারির মাধ্যমে উন্নয়নের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এভাবে সবার মধ্যে কাজ ভাগ করে নেওয়ার ফলে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও এনআইডি প্রস্তুতকরণের মতো একটি জটিল কাজ কমিশন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যথাক্রমে ৩৮০ কোটি টাকা ও ৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। এত অল্প সময়ে ও স্বল্প ব্যয়ে এ ধরনের একটি বিশাল কর্মসম্পাদন যেকোনো দেশের গণপ্রশাসনের জন্য পরম তৃপ্তি ও গৌরবের বিষয়।

জিআইএস সফটওয়্যার ব্যবহার

সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণে জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেমের (জিআইএস) সফটওয়্যার-ভিত্তিক Delimitation Tool ব্যবহার ছিল কমিশন কর্তৃক নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহারের আরেকটি সফল উদ্যোগ। বাংলাদেশে জিআইএস প্রযুক্তি বিকাশের সঙ্গে আমি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম। বিভিন্ন সময়ে মোট নয় বছর পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে কাজ করার সময় মন্ত্রণালয়ের সমর্থনে ও ডেনিশ সরকারের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় জিআইএসকে একটি প্রকল্প থেকে মন্ত্রণালয়ের অধীনে Centre for Environment and Geographic Information Systems

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(CEGIS) নামে একটি স্ব-অর্থায়িত স্বাধীন ফাউন্ডেশন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলাম। CEGIS-এর পরিবর্তিত সাংগঠনিক বিন্যাস মন্ত্রণালয়ের বাইরের কাজ গ্রহণের পথ সুগম করে। আমার সেই অভিজ্ঞতার আলোকে CEGIS-কে সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি জিআইএস-ভিত্তিক Delimitation Tool তৈরি করে আমাদের সহায়তা করার জন্য অনুরোধ করি। ফাউন্ডেশন সানন্দে আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করে খুব দ্রুত একটি Tool উদ্ভাবন করে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত সারা দেশের জিআইএস তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত কম্পিউটারাইজড কোডিং সিস্টেম সরবরাহ করে। এসবের সমন্বয়ে CEGIS প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক তথ্যভান্ডার প্রস্তুত করে। উদ্ভাবিত Delimitation Tool সীমানা নির্ধারণের মতো সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়াকে এত সহজ করে দেয় যে, কম্পিউটারের মাউস ঘুরিয়ে মুহূর্তেই সীমানা নির্ধারণের বিভিন্ন বিকল্প কম্পিউটারের পর্দায় দেখা সম্ভব হয়।

সীমানা নির্ধারণ একটি স্পর্শকাতর বিষয় এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা অধিকতর প্রযোজ্য এই কারণে যে, এখানে নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারিত হয় প্রতিটি নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক ভোটের ওপর। তবে কাজটি কঠিন ও স্পর্শকাতর হলেও এটি উপেক্ষা করার অবকাশ নেই। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের আসনসংখ্যা একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকার (single territorial constituency) ভিত্তিতে ৩০০টি আসনে নির্ধারিত আছে। যেহেতু আসনসংখ্যা নির্দিষ্ট কিন্তু দেশের জনসংখ্যা ক্রমবর্ধনশীল এবং জনগণের মধ্যে কতিপয় বৃহৎ শহরে অভিপ্রয়াণের (migration) প্রবণতা বেশি, সেহেতু নির্দিষ্ট সময় অন্তর সর্বশেষ আদমশুমারি অনুযায়ী নির্বাচনী এলাকাগুলোর সীমানা পুনর্নির্ধারণ অত্যন্ত জরুরি। সব ভোটের সমমূল্য (principle of equal suffrage) গণতান্ত্রিক নির্বাচনে আন্তর্জাতিক মানের একটি প্রধান সূচক। এই পরিপ্রেক্ষিতে আন্ত-আসন সীমানায় জনসংখ্যার ব্যাপক বৈষম্য গ্রহণযোগ্য নয়।

কমিশনের রেকর্ড থেকে প্রতীয়মান হয় যে ১৯৮৪ সালে বড় ধরনের সীমানা নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছিল। তারপর বিভিন্ন সময়ে হালকাভাবে কিছু কিছু আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা হলেও আইনগতভাবে পূর্ণাঙ্গ কোনো কাজ হয়নি। ফলে বেশির ভাগ আসনেই আন্ত-আসন জনসংখ্যার বিরাট বৈষম্য দেখা যায়। ঢাকা জেলার একটি আসনের জনসংখ্যা ১ লাখ ১৯ হাজার ২৪২ জনের বিপরীতে অপর একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসনের জনসংখ্যা ৬ লাখ ৩৩ হাজার ৪৩৫ জন। এই বৈষম্যের পরিমাণ ৫০০ শতাংশ।

আন্ত-আসন সীমানার বৈষম্য সহনীয় পর্যায়ে আনার লক্ষ্যে কমিশন নির্বাচনী রোডম্যাপে সীমানা পুনর্নির্ধারণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে এবং জানুয়ারি-জুন ২০০৮ এই সময়সীমার মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করার কর্মসূচি প্রণয়ন করে। ওই কর্মসূচি অনুযায়ী কমিশন ১৩৩টি আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করে প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করে। ওই তালিকার ওপর প্রাপ্ত আপত্তিগুলোর শুনানি অন্তে কমিশন চূড়ান্তভাবে ৮৪টি আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করে গেজেট প্রকাশ করে। অত্যন্ত স্বচ্ছতা ও আইনের বিধিসমূহ কঠোরভাবে পরিপালন করেও কমিশন অনেকেরই সন্তুষ্টি বিধানে ব্যর্থ হয়। সংবিধানে এ সম্পর্কে কোনো আইনি কার্যক্রম বারিত থাকলেও কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মোট ১৮টি রিট পিটিশন দাখিল করা হয় এবং কমিশন ঘোষিত তারিখে সংসদ নির্বাচন হুমকির মুখে পড়ে। পরে অবশ্য হাইকোর্ট রিটগুলো খারিজ করে এই বাধা অপসারিত করে।

সীমানা পুনর্নির্ধারণে অসন্তুষ্টির বীজ এই প্রক্রিয়ার পরস্পরবিরোধিতার মধ্যেই নিহিত। এটি এমন একটি কাজ, যা রাজনীতিবিদেরা মনে করেন যে, তাঁদের অধিক্ষেত্রভুক্ত এবং এখানে কারও হস্তক্ষেপ কাঙ্ক্ষিত নয়। পূর্ণ নিরপেক্ষতার সঙ্গে সীমানা পুনর্নির্ধারণ গণতান্ত্রিক রীতির একটি আবশ্যিক অনুষঙ্গ। এই পরস্পরবিরোধিতা সংশ্লিষ্ট আইনের মধ্যেও লক্ষণীয়। একদিকে বলা হয় যে সীমানা পুনর্নির্ধারণের ভিত্তি হচ্ছে সর্বশেষ আদমশুমারি অনুযায়ী প্রাপ্ত জনসংখ্যা। আবার একই নিঃশ্বাসে বলা হয়েছে যে, এই কাজটি এমনভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে, যেন প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধা, পুনর্নির্ধারিত অঞ্চলের অখণ্ডতা এবং সামাজিক পরিবেশের ভারসাম্য মোটামুটি বজায় থাকে।

এই ধরনের পরস্পরবিরোধিতা ন্যূনতম পর্যায়ে কমিয়ে আনতে হলে নদীভাঙনের শিকার অঞ্চলগুলোর জনগণের অবস্থা এবং বড় বড় শহরে বিপুল জনগোষ্ঠীর অভিপ্রয়াণের বিষয়টি বিবেচনা করে একটি নতুন আইনি কাঠামো জারি করা প্রয়োজন। ২০১১ সালের ৭ জুন থেকে ৭ আগস্ট পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমের সঙ্গে দ্বিতীয় দফা সংলাপকালে নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন ও একটি বিধিমালার খসড়া উপস্থাপন করা হয়েছিল। আশা করি, এ বিষয়ে প্রয়োজনে আরও আলোচনার পর প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইভিএম প্রযুক্তির ব্যবহার

২০০৯ সালে দুই কমিশনার ভারতের পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচন প্রত্যক্ষ করতে সেখানে যান এবং ওই নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম)-এর ব্যাপক ব্যবহার দেখতে পান। নব নব প্রযুক্তি ব্যবহার করে সফলতা পাওয়ার ফলে নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য যেকোনো ভালো প্রযুক্তি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে আমাদের কোনো দ্বিধা ছিল না। কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন ইভিএম পরীক্ষা করে দেখার ব্যাপারে সবিশেষ উদ্যোগী ছিলেন এবং আমাদের প্রযুক্তিমনা সচিব হুমায়ুন কবিরের সহযোগিতায় খুব দ্রুত বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজির পরিচালক অধ্যাপক এস এম লুৎফুল কবিরের নেতৃত্বে গঠিত দলের হাতে প্রস্তুত ইভিএমের একটি মডেল উপস্থাপন করেন। এই যন্ত্রটিকে সহজ, সরল, সাশ্রয়ী ও ভোটারবান্ধব করার লক্ষ্যে কয়েকবারই আমরা এটি অধিকতর উন্নয়নের জন্য পরামর্শ দিই।

চূড়ান্ত সংস্করণে ১৩০টি মেশিন তৈরি করে কমিশন ২০১০ সালে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনে একটি ওয়ার্ডে এটি সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করে। ভোট শেষ হওয়ার আধা ঘণ্টার মধ্যে ওই ওয়ার্ডের ফলাফল ঘোষণা করা সম্ভব হয়।

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনে সন্তোষজনকভাবে ইভিএম ব্যবহারের পর এটি আরও ব্যাপকভাবে ব্যবহারের বিষয়ে কমিশন সিদ্ধান্ত নেয়। বুয়েট উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যাপক হারে এই মেশিনের বিভিন্ন অংশ সংযোজন, প্রার্থীদের তালিকা সংযোজন, মেশিনগুলো বিভিন্ন জেলায় বিতরণ ও পরবর্তী সময়ে সংরক্ষণের জন্য গাজীপুরস্থ বাংলাদেশ মেশিন টুল ফ্যাক্টরি (বিএমটিএফ)-কে নির্বাচন করা হয়। বুয়েট এবং বিএমটিএফের সুনাম ও নিজ নিজ বিষয়ে পেশাদারির কারণে ইভিএম বিষয়টি দেশের বিভাজিত রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকবে বলে আমার আশা ছিল। কিন্তু আমাদের এমন দুর্ভাগ্য যে ২০১০ সালের কোনো এক সময়ে প্রধানমন্ত্রী এই মর্মে ঘোষণা দেন যে, আগামী সংসদ নির্বাচন ইভিএমের মাধ্যমেই অনুষ্ঠিত হবে। যাঁরা ইভিএমের অগ্রযাত্রা বিষয়ে কমিশনের নিজস্ব উদ্যোগ সম্পর্কে অবহিত নন, তাঁদের কারও কারও কাছে হয়তো মনে হতে পারে যে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই আমরা এ কাজে হাত দিয়েছি। আসলে কাজটি শুরু হয়েছে আমাদের উদ্যোগেই, কারও নির্দেশে নয়। বস্তুতপক্ষে, আমাদের আগে আমার এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্বসূরি এম এ সাঈদ বোধ হয় এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করেছিলেন এবং ভারত থেকে একটি মেশিনও সংগ্রহ করেছিলেন। তবে এ বিষয়ে কেন কোনো অগ্রগতি হয়নি, তা আমি অনেক চেষ্টা করেও জানতে পারিনি। যাহোক, ইভিএম সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা আমাদের বিরোধী দলের প্রচণ্ড বিরোধিতার মুখে ঠেলে দেয়। যে কাজটি অত্যন্ত নির্বিঘ্নে ও স্বচ্ছন্দে অগ্রসর হচ্ছিল, সেটির অগ্রযাত্রা চরমভাবে ব্যাহত হলো। বিরোধী দলের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন এই মেশিনটি ভোট কারচুপিতে সহায়তার জন্য তৈরি করা হচ্ছে, এমন প্রচারণাও শুরু করে দিল।

ইভিএমের প্রতি কমিশনের আগ্রহের কারণ, এটি ব্যবহারের মাধ্যমে নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার দৃশ্যমান উন্নয়ন। যেমন :

ক. কাগজের ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচনে ব্যালট পেপার মুদ্রণ, ব্যালট বাক্সের সিল, অফিশিয়াল সিল, মার্কিং সিল, স্ট্যাম্প প্যাড, হেসিয়ান ব্যাগ, মোমবাতি, ম্যাচ, গালা, ব্রাশ ইত্যাদি খুচরা মালামাল সংগ্রহ ও বিতরণ করতে হয়। এসব অসংখ্য মালামাল সংগ্রহ ঝক্কিঝামেলার ব্যাপার। ইভিএম ব্যবহারে এসবের কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকবে না।

খ. ইভিএম ব্যবহারে বৈধ ভোট, বাতিল ভোট, নষ্ট ও হারিয়ে যাওয়া ব্যালটের জন্য অসংখ্য ফরম পূরণ ও প্যাকেট ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। প্রিসাইডিং ও সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তাদের জন্য কাজটি করা অনেক সহজসাধ্য হবে।

গ. যেহেতু কাগজের কোনো ব্যালট থাকবে না, সেহেতু ব্যালট পেপার টেম্পারিং, হারানো কিংবা ছিনতাইয়ের কোনো সুযোগ থাকবে না।

ঘ. কম্পিউটারের মাধ্যমে যেহেতু ভোট গণনা করা হবে, সেহেতু গণনা সঠিক হবে। দিবালোকের মধ্যেই ভোট গ্রহণ ও গণনা সম্পন্ন হবে এবং এ-সংক্রান্ত জটিলতা ও সহিংসতা ন্যূনতম পর্যায়ে নেমে আসবে।

পক্ষান্তরে ইভিএম নিয়ে যেসব সমালোচনা হয়েছে, তার কিছু অপ্রাসঙ্গিক এবং বেশ কিছু অমূলক। যেমন :

ক. বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন যে ইলেকট্রনিক ভোট গ্রহণ পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা করেছে, তা ই-ভোটিং নয়। ই-ভোটিং ব্যবস্থা তখনই প্রবর্তিত হয়, যখন মেশিনগুলো একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত হয়। এই মেশিনগুলো একেকটি একক ইউনিট (stand alone unit)। এগুলোর একটির সঙ্গে আরেকটির কোনো আন্তসংযোগ থাকবে না। কেউ কোনো অপকর্ম করতে সক্ষম হলেও তা ওই দখল করা ইউনিটগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ. এই মেশিনগুলো সম্পূর্ণ ব্যাটারিচালিত এবং এগুলো দেশের যেকোনো স্থানে ব্যবহার করা যাবে।

গ. মেশিনগুলোর সফটওয়্যারে OTP (one time programmable chip) ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে কেউ চাইলেও অন্য কোনো প্রোগ্রাম সঞ্চালন করতে পারবে না।

ঘ. কন্ট্রোল ইউনিটের সম্মুখভাগে স্থাপিত displayটি মেশিন চালু অবস্থায় এবং ভোট গ্রহণকালে অব্যাহতভাবে ভোট প্রদানের অবস্থা প্রদর্শন করতে থাকবে।

ঙ. কন্ট্রোল ইউনিট চালু করার জন্য স্মার্ট কার্ড ও মাস্টার কার্ড যথাক্রমে সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার ও প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে থাকবে। এগুলো ছাড়া মেশিন চালু করা সম্ভব হবে না।

ইভিএমের প্রতি রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধিতায় কমিশন হতাশ হলেও সম্পূর্ণ নিরাশ হয়নি। এটির অধিকতর উন্নয়নের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চলেছে অব্যাহতভাবে। স্থানীয় নির্বাচনে এটিকে ব্যবহার করে ক্রমান্বয়ে জাতীয় পর্যায়ে উত্তরণের জন্য বেশ কিছু রাজনৈতিক দলের পরামর্শের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে আংশিক এবং কুমিল্লা সিটি করপোরেশন ও নরসিংদী পৌরসভা নির্বাচনে এর সম্পূর্ণ ব্যবহার করে মেশিনটির প্রতি ব্যাপক জনগোষ্ঠীর আস্থা ও আগ্রহ দেখতে পেয়েছি। বাংলাদেশের বিভাজিত ও সাংঘর্ষিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে নির্বাচন বিষয়ে যেকোনো নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার সহজেই সবাই গ্রহণ করবেন—এরকম আশা করা উচিত হবে না। এটি ব্যবহারের সিদ্ধান্তে অটল থেকে একাধিক কমিশনকে এই লক্ষ্য অর্জনে প্রজ্ঞা, ধৈর্য ও সাহসিকতার পরীক্ষা দিতে হবে। ভারতে খুব সহজে এই লক্ষ্য অর্জিত হয়নি, আমাদের এখানেও হবে না।

সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্নির্ধারণ ও কর্মী-ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

নির্বাচন কমিশনের কর্মী ব্যবস্থাপনা মূলত নির্বাচন ব্যবস্থাপনাকেন্দ্রিক। এই কাজকে ব্যাপক অর্থে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও কমিশনের নিজস্ব সংগঠনের ব্যবস্থাপনা। কমিশনের সচিবালয় ও মাঠপর্যায় মিলিয়ে নবম সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে ২ হাজার ৪৪৩ কর্মকর্তা-কর্মচারী কার্যরত ছিল। সরকার থেকে প্রেষণে নিয়োজিত ১০-১২ জন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ছাড়া বাকি সবাই কমিশনের স্থায়ী কর্মচারী। নির্বাচন পরিচালনার জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসেবে ৫ লাখ পোলিং স্টাফ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর আরও ৫ লাখ সদস্য কমিশনের নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। তবে কমিশনের সাংগঠনিক শক্তির মূল ভিত্তি এর নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারী। দুর্ভাগ্যবশত, অতীতে মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ে উচ্চপর্যায়ের মনোযোগের অভাবে কমিশনের কর্মচারী ব্যবস্থাপনা নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত ছিল। কোনো যুক্তি ছাড়াই কমিশন সচিবালয় ও মাঠপর্যায়কে বিভাজিত করে সম্পূর্ণ পৃথক দুই ধারায় কর্মচারী-কর্মকর্তা নিয়োগ করেছে। এই বিভাজন এত কঠোর ছিল যে এক ধারার কর্মকর্তাদের অন্য ধারার জন্য নির্ধারিত পদে বদলিও খুবই সীমিত ছিল। ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুর কাছাকাছি থাকার ফলে সচিবালয়ের কর্মকর্তারা অনেক সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিয়েছেন, যা মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের ভাগ্যে জোটেনি। এ জন্য মাঠপর্যায়ে একটা চাপা অসন্তোষ ছিল। এ ছাড়া উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবে সব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে দক্ষতার অভাব প্রতিনিয়ত লক্ষ করা গেছে—বিশেষ করে এঁদের অনেকের কম্পিউটারের জ্ঞান ছিল হতাশাব্যঞ্জক। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে হলে তাঁদের মনোবল যেমন চাঙা করা প্রয়োজন, তেমনি কমিশনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে তাঁদের এমনভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে, যেন কমিশনের প্রতিটি সিদ্ধান্তের সঙ্গে তাঁরা একাত্মতা প্রকাশ করতে পারেন এবং অর্পিত দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে পালন করে গর্ববোধ করতে পারেন।

কমিশনের মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমি কমিশনের জনবল বিন্যাস ও প্রশিক্ষণের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করি। নির্বাচনী ব্যবস্থাপনায় নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে সেগুলো ধারণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বহুমুখী পেশার বহুসংখ্যক নতুন পদ সৃষ্টি, বিদ্যমান পদসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং কাজের ধরনধারন ও পরিমাণ নির্ধারণ করে একটি যুগোপযোগী সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে কমিশন একজন আন্তর্জাতিক উপদেশকের নেতৃত্বে কমিশনের সাংগঠনিক চাহিদা নিরূপণের জন্য একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে। বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ওই কমিটি একটি পরিবর্তিত সাংগঠনিক কাঠামোর রূপরেখা কমিশনের বিবেচনার জন্য পেশ করে। কমিশন ওই রিপোর্ট পর্যালোচনা করে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইনের অধীনে গঠিত কমিটির বিবেচনার জন্য একটি সাংগঠনিক কাঠামোর প্রস্তাব তৈরি করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে প্রনিক ওই কমিটির চেয়ারম্যান এবং অর্থ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব ওই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কমিটির সদস্য। আইনের মাধ্যমে এই কমিটি গঠনের অর্থ এই যে, এই কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত জনবলসম্পর্কিত সব প্রস্তাব জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ে অগ্রায়ণ করা হবে সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে সরকারি আদেশ জারির জন্য, গৃহীত প্রস্তাবগুলোর ওপর আমলাতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য নয়।

আমার নেতৃত্বাধীন কমিটি উপস্থাপিত কাঠামোতে কিছু পরিবর্তন সুপারিশ করে প্রস্তাবগুলো অনুমোদন করে। সেসব সংশোধনীসহ নতুন প্রস্তাব নিয়ে ২০০৯ সালের ৩ জানুয়ারি প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদনের জন্য এক সভায় মিলিত হই। কিন্তু কিছুকাল পরই নির্বাচিত সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করবে—এই কারণ দেখিয়ে প্রস্তাবগুলো অনুমোদনে প্রধান উপদেষ্টা সম্মত হলেন না।

নতুন সরকারের কাছে আমাদের প্রস্তাবনা পেশ করার পর দ্রুত অনুধাবন করতে পারলাম যে হয় নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইনের বিধান এদের কাছে স্পষ্ট নয় অথবা এর মর্মার্থ এদের মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে। আবহমানকাল থেকে জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয় তাদের কাছে পেশ করা প্রস্তাবগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কাটছাঁট করতে অভ্যস্ত। এ ধরনের প্রক্রিয়া ছাড়া সরকারি আদেশ জারি করতে হবে এমনটা তাদের কল্পনারও অতীত। দীর্ঘ দুই বছর এই দুই মন্ত্রণালয় আমাদের বহুবার ঘুরিয়েও সরকারি আদেশ জারি করতে গড়িমসি করায় বাধ্য হয়ে প্রধানমন্ত্রীকে পত্র লিখে তাঁর সরাসরি হস্তক্ষেপ কামনা করতে হয়। তার পরও অর্থ মন্ত্রণালয় কমিটি প্রস্তাবিত পদসংখ্যা ৪৬৫ থেকে হ্রাস করে ৪১৬-তে নামিয়ে অনুমোদনপত্র জারি করে।

চূড়ান্তভাবে বরাদ্দ জনবল প্রস্তাবমতো না হলেও একটি বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে একটি আদেশের মাধ্যমে একসঙ্গে এতগুলো নতুন পদের সৃষ্টি খুব সহজে ঘটে না। সেই আঙ্গিকে নতুন সাংগঠনিক কাঠামো আমাদের কমিশনের জন্য একটি বিরাট অর্জন। কমিশন ইতিমধ্যে মাঠপর্যায় ও সচিবালয়ের বিভাজন তুলে দিয়ে একটি একক ধারার কর্মিবাহিনী প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছে। ফলে দীর্ঘদিনের একটি অসংগতি দূরীভূত হলো। কিন্তু নবসৃষ্ট পদে শতভাগ পদোন্নতি প্রদানের সন্তুষ্টি পেতে আমরা ব্যর্থ হলাম। সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধির আইনি জটিলতা ও কর্মকর্তাদের সম্মিলিত আন্ত-জ্যেষ্ঠতাসংক্রান্ত বিরোধ তাঁদের মধ্যে এত তীব্র ও চেতনার এত গভীরে লালিত যে কমিশনের কোনো সিদ্ধান্তই সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। যখনই একাধিক ক্যাডার কিংবা উপ-ক্যাডারকে একীভূত করা হয়, আন্ত-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্যেষ্ঠতা নির্ণয়ে সবাইকে একইভাবে সন্তুষ্ট করা যায় না। এ জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সমঝোতা ও সহমর্মিতার প্রয়োজন। চাকরিজীবনের শুরুতে আমার অন্যতম গুরু বিভাগীয় কমিশনার এম আলাউদ্দিন এ ধরনের সমস্যার অসমাধানযোগ্যতার কথাই বলেছিলেন। দীর্ঘ ৪৫ বছর পর সেই সত্য আবার আমি পুনরায় আবিষ্কার করলাম।

কমিশনের ভৌতিক অবকাঠামো নির্মাণ

শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হিসেবে প্রায়ই এর স্বাধীনতার কথা বলা হয়ে থাকে। স্বাধীনতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা যত দূর সম্ভব কমিয়ে আনা। কমিশনে যোগ দেওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই দেখতে পেলাম যে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামোর অভাব কমিশনের পরনির্ভরতার একটি জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। স্বাধীনতার পর এত বছর পার হয়ে গেল কিন্তু কমিশন তার একটি নিজস্ব প্রধান কার্যালয় পেল না। সামান্য একটু জায়গার দরকার হলে সরকারের ঘাটে ঘাটে ঘুরেও কোনো ফল পাওয়া যায় না। কমিশনের আঞ্চলিক কার্যালয়গুলো ভাড়াটে বাড়িতে অবস্থিত, যেগুলোর নিরাপত্তা ও যৌক্তিকতা নিয়ে বহুবার প্রশ্ন তোলা হয়েছে। আর জেলা ও উপজেলায় এসব অফিসের করুণ অবস্থার কথা যত কম বলা যায়, ততই ভালো। দু-একটি ব্যতিক্রম বাদে জেলা কিংবা উপজেলা কমপ্লেক্সের সবচেয়ে নিকৃষ্ট কক্ষগুলো কমিশনের এসব অফিসের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। জেলা ও উপজেলা নির্বাচন অফিসারদের মধ্যে এমন একটা প্রশাসনিক কৃষ্টির সৃষ্টি করা হয়েছে, যেন তাঁরা ডিসি কিংবা টিএনওর অফিসের অঙ্গ এবং তাঁদেরই আজ্ঞাবহ।

আমি স্পষ্ট অনুধাবন করলাম যে এই কর্মিবাহিনীকে কমিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে উজ্জীবিত করতে হলে সরকারের একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং তা করতে হলে তাঁদের ডিসি-টিএনওর প্রভাববলয় থেকে মুক্ত করে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এ জন্য নিজস্ব দপ্তর প্রতিষ্ঠা করে তাঁদের প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে হবে। আর এসব উদ্যোগ যত দূর সম্ভব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেই গ্রহণ করে কাজ শুরু করে দিয়ে যেতে হবে, যাতে পরে কেউ এই অবকাঠামো উন্নয়নের বিষয়টি পাল্টে দিতে না পারে।

প্রথমেই আমরা নির্বাচন কমিশনের প্রধান কার্যালয়ের জন্য সরকারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে প্রয়োজনীয় জমি বরাদ্দ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করি। খুব দ্রুত আগারগাঁওয়ে ৩ দশমিক ৫ একরের একটি কর্নার প্লট কমিশনের অনুকূলে বরাদ্দ করা হয়। অতীতে দুবার জমি কিংবা ভবন বরাদ্দ করা হয়েছিল; কিন্তু দুবারই তা বাতিল করা হয়। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে এ জমি যেন হাতছাড়া না হয়, সে জন্য আমরা দ্রুত জমির মূল্য পরিশোধ করে জমির দখল বুঝে নিই। সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেও আমাদের মেয়াদকালে নির্মাণকাজ শুরু করা যায়নি। বরাদ্দ করা প্লটের মাঝখানে অনেক আগে অননুমোদিতভাবে নির্মিত দুটি আবাসিক ভবন ভেঙে জায়গা খালি না করা পর্যন্ত নির্মাণ শুরু করা সম্ভব ছিল না। যাহোক, এখন কাজ শুরু হয়েছে এবং তা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণের ব্যাপকতা, জমি অধিগ্রহণের দীর্ঘসূত্রতা এবং বিরাট অঙ্কের অর্থসংস্থান নিয়ে নানাবিধ বিকল্পের চিন্তাভাবনা করছিলাম। ইতিমধ্যে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও এনআইডি প্রস্তুতকরণের কাজে যতই গতির সঞ্চার হচ্ছিল, ততই আমি উপলব্ধি করছিলাম যে এনআইডিসহ ভোটার নিবন্ধনের কাজ সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণ করে আমাদের কেন্দ্রীভূত সার্ভিসকে মাঠপর্যায়ে উপজেলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করতে হবে। আর এ জন্য মাঠপর্যায়ের সব অফিসে প্রয়োজনীয় লোকবল, যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম স্থাপন করে প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করে সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। কমিশনের স্বাধীনতার ধারণাটির সঙ্গে উপজেলা পর্যায়ে সেবা বিকেন্দ্রীকরণের তাগিদ অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনায় নতুন মাত্রা যোগ করে।

উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু উপজেলা কমপ্লেক্স এবং জেলা সদরের বাইরে দেশের প্রতিটি উপজেলায় কমপ্লেক্স নির্মিত হয়েছে। সেখানে উপজেলা নির্বাচন অফিস স্থাপনের সিদ্ধান্ত এবং এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি ৩৯৪টি উপজেলায় জমি অধিগ্রহণের ঝামেলা থেকে আমাদের মুক্ত করে। বাকি চ্যালেঞ্জ থাকল প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান। দৈবক্রমে সেটা পেতেও বেশি বিলম্ব হলো না।

প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে অনেক কম অর্থ ব্যয় করে PERP প্রকল্পে মালামাল সংগ্রহের ফলে প্রায় অর্ধেকের মতো বরাদ্দ করা অর্থ অব্যয়িত থেকে যায়। আমি এই অর্থ অবকাঠামো নির্মাণ-ব্যয়ের জন্য মৌখিকভাবে ঢাকার তদানীন্তন ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীকে প্রস্তাব করলে তিনি আমাকে পরামর্শ দেন যে অফিস নির্মাণের জন্য বরাদ্দ চাইলে ডিএফআইডি তাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্মত হবে না। তবে কমিশনের সেবা বিকেন্দ্রীকরণ, ভোটার তালিকা এবং এনআইডি-সংক্রান্ত সমুদয় কাজে ব্যবহৃত প্রযুক্তির একটি দক্ষ নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের যৌক্তিকতা তুলে ধরলে দাতারা তাতে সম্মত হতে পারে। তিনিই এই স্থাপনাগুলোকে অফিস হিসেবে আখ্যায়িত না করে 'সার্ভার স্টেশন' নামে অভিহিতকরণের প্রস্তাব রাখেন। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ওই অব্যয়িত অর্থকে পুঁজি করে মোট ২৫১ কোটি ৪১ লাখ টাকা ব্যয়ে সার্ভার স্টেশন প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়।

উপজেলা পর্যায়ে আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞ কর্মকর্তা না থাকার কারণে স্থান নির্বাচন ও অবকাঠামো নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয় যথাক্রমে টিএনও ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-কে। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে চারটি সিটি করপোরেশন নির্বাচন এবং উপনির্বাচনগুলোতে কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তাদের রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নিয়োগের বিষয়টি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তারা ভালোভাবে গ্রহণ করেননি। বিভিন্ন জেলা সফরকালে তার আভাস আমি পেয়েছি। আমাদের কর্মকর্তাদের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নিয়োগের কোনো পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু তার পরও এই বিষয়টি প্রশাসন ক্যাডারের জুনিয়র কর্মকর্তাদের মধ্যে যে অহেতুক হিংসা ও বিদ্বেষের জন্ম দিতে পারে, তা জানতে পারলাম যখন প্রকল্পের তত্ত্বাবধানকারী বিদেশি উপদেশক আমাদের জানালেন যে কমপ্লেক্সের মধ্যে সবচেয়ে অনুপযুক্ত ও নিকৃষ্ট মানের জায়গা উপজেলা নির্বাচন অফিস নির্মাণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। আমি তাৎক্ষণিকভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম স্থগিত করে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানিয়ে দিই যে তিন কমিশনার ও কমিশন সচিব সরেজমিনে কমপ্লেক্স পরিদর্শন করে স্থান নির্বাচন করবেন। এই কাজ আমাদের সময় ও শারীরিক সামর্থ্যের নিরিখে একটি পর্বতপ্রমাণ চ্যালেঞ্জ ছিল। তবু আমরা কতিপয় উপজেলা বাদে (যেগুলো সেনাবাহিনী থেকে প্রেষণে নিযুক্ত প্রকল্প পরিচালক পরিদর্শন করেছেন) ৩৯৪টি উপজেলার সবগুলোতেই সরেজমিনে গিয়ে স্থান নির্বাচন করেছি। এ জন্য আমি ১৬৮টি উপজেলা পরিদর্শন করেছি।

উপজেলা পর্যায়ে অধিগ্রহণ করা জমি থেকে আমাদের অনুকূলে জমি বরাদ্দের উদাহরণ টেনে আমরা ১৮টি জেলায় ডিসি কমপ্লেক্সের অব্যবহৃত জমি কমিশনের অনুকূলে বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব পাঠাই। প্রাথমিকভাবে এখানেও প্রস্তাবটি প্রশাসন ক্যাডারের জুনিয়র কর্মকর্তাদের ঈর্ষার কারণে যুগ্ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সচিব পর্যায়েই বাতিল করে আমাদের অবহিত করা হয়। উপায়ান্তর না দেখে আবার আমরা প্রধানমন্ত্রীর শরণাপন্ন হই এবং তাঁর হস্তক্ষেপে সমস্যার সমাধান হয়। শেষ হিসাব অনুযায়ী, ৩৯৪টি উপজেলায় উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আর ৫১টি জেলা ও নয়টি বিভাগে অধিকাংশ ভবনই নির্মিত হয়ে গেছে, আর বাকিগুলোর কাজ দ্রুত সমাপ্তির পথে। অনেক বাধার সম্মুখীন হলেও এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন নির্বাচন কমিশনের সামগ্রিক প্রশাসন, জনগণকে দ্রুত সেবা প্রদান এবং উন্নততর নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

আন্তপ্রতিষ্ঠান সম্পর্ক

সরকার ও নির্বাচন কমিশন : নির্বাচন কমিশনের ওপর অর্পিত সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে সরকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধু নির্বাচন অনুষ্ঠানকালেই নয়, কমিশনের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অহরহ সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন। কমিশনকে তার চাহিদামতো সহায়তা প্রদান কমিশনের কাজে হস্তক্ষেপ নয়। হস্তক্ষেপ তখনই সংঘটিত হয়, যখন কমিশন না চাইলেও সরকারি ইচ্ছা কমিশনের ওপর চাপানো হয় কিংবা যা চাওয়া হয়, তা প্রদান থেকে সরকার বিরত থাকে।

ড. ফখরুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাদের মেয়াদকালে আমাদের সর্বতোভাবে সহায়তা করেছে। আমরা দায়িত্ব গ্রহণের অল্প পরই আমাদের অনুরোধে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন আমাদের প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য আগারগাঁওয়ে ৩ দশমিক ৫ একরের একটি কর্নার প্লট বরাদ্দ করেন। একইভাবে স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আনোয়ারুল ইকবাল খুব সহজেই দেশের সব উপজেলা কমপ্লেক্সে সার্ভার স্টেশন নির্মাণের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন।

বিদগ্ধজন ও কমিশনের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান উপদেষ্টা তাঁর নিজ উদ্যোগে ২০০৮ সালের ৯ মার্চ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় অধ্যাদেশ ২০০৮ জারির মাধ্যমে কমিশন সচিবালয়কে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বিযুক্ত করে সম্পূর্ণ স্বাধীন একটি সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ, জনবল নিয়োগ এবং আর্থিক বরাদ্দ ও অর্থ ছাড়করণের বিষয়েও অনেক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের দায়িত্ব গ্রহণের আগেই প্রধান উপদেষ্টা স্ব-উদ্যোগে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করে তাঁর দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। পরবর্তী সময় প্রকল্প প্রণয়ন থেকে শুরু করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পুরো সময়ে যখনই প্রয়োজন হয়েছে, তাঁর সরকারের কাছে চাহিদাপত্র পাঠিয়ে আমরা তা পেয়েছি।

তবে নির্বাচন কমিশনের প্রতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যুগান্তকারী সহযোগিতার ক্ষেত্রটি নির্বাচনী আইনের সংস্কার প্রস্তাবগুলো নির্দ্বিধায় গ্রহণের মধ্যে ব্যাপৃত আছে। এসব সংস্কার এত মৌলিক যে আগামী বহুকাল ধরে এই কার্যক্রম সবার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

স্বল্পভাষী ও সদালাপী প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন শিষ্টাচারের এক অনন্য নিদর্শন। ২০০৭ সালের ২১ মার্চ ছবিসহ ভোটার তালিকা ও এনআইডি প্রস্তুতকরণের বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রদানের পর থেকে কবে নাগাদ সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে নবম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে, তার একটা সময়সীমা প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে কমিশনের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল। সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে পরামর্শক্রমে আমরা একটি রোডম্যাপের প্রথম খসড়া নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আলাপ করি। কিন্তু খসড়া চূড়ান্ত করার সময় তিনি কয়েক দিনের সরকারি সফরে দেশের বাইরে অবস্থান করছিলেন। এদিকে এই সময়সূচি প্রকাশের দাবি এমন জোরালো হয়ে উঠল যে, কমিশনের সিদ্ধান্তক্রমে আমি প্রধান উপদেষ্টার অনুপস্থিতিকালে ২০০৭ সালের ৫ এপ্রিল ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নের জন্য ১৮ মাসের একটি সময়সূচি ঘোষণা করি। সময়সূচি ঘোষণা করে পারিপার্শ্বিক চাপমুক্ত হলাম ঠিকই; তবে মনে একটা সংশয় থেকে গেল যে প্রধান উপদেষ্টাকে চূড়ান্ত খসড়া না দেখিয়ে ঘোষণা দেওয়ায় তিনি হয়তো মনঃক্ষুণ্ন হবেন। দিল্লি থেকে ফিরে প্রধান উপদেষ্টা নিজেই আমাকে ফোন করে জানালেন যে তাঁর জন্য অপেক্ষা না করে রোডম্যাপটি প্রকাশ করে আমরা ভালোই করেছি। এ বিষয়ে বিবিসি ও ভারতীয় মিডিয়ায় ইতিবাচক মন্তব্য করা হয়েছে। তিনি আরও বললেন, তোমাদের হাতকে শক্ত করার জন্য আমি খুব শিগগির তোমাদের সময়সূচি সমর্থন করে বক্তব্য দেব। প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ২০০৭ সালের ১৮ এপ্রিল প্রধান উপদেষ্টা আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের কর্মসূচির প্রতি তাঁর সমর্থন জানালেন।

সীমানা পুনর্নির্ধারণের সিদ্ধান্তের ওপর হাইকোর্টে ১৮টি রিট পিটিশন শুনানির জন্য গৃহীত হলে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান হুমকির মুখে পড়ে। এত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথ পাড়ি দিয়ে শুধু সীমানার ঝঞ্ঝাটের কারণে নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন বন্ধ হোক, এটা প্রধান উপদেষ্টার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্বার্থে তিনি সীমানা নির্ধারণ জলাঞ্জলি দিয়ে পুরোনো সীমানা অনুযায়ী নির্বাচন করতে হলে তাই করা উচিত মর্মে কয়েকবার তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন। কিন্তু আমরা প্রতিবারই আমাদের দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করে বলেছি যে, পুনর্নির্ধারিত সীমানা অনুযায়ীই আমাদের নির্বাচন করা উচিত হবে। তাঁর অভিমতে আমরা সায় না দিলেও আমাদের প্রত্যয়ে তিনি আস্থা স্থাপন করেছেন।

২০০৯ সালের জানুয়ারিতে ক্ষমতার পালাবদলের পর সরকারের সঙ্গে কমিশনের সম্পর্কের শুরুটা ভালোই ছিল। আইনের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারি করা অধ্যাদেশগুলো সংসদ অধিবেশন শুরু হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে সংসদ কর্তৃক গৃহীত না হলে সেগুলো বাতিল হয়ে যায়। নতুন সরকারের সমর্থনে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের সংশোধনী-সংবলিত অধ্যাদেশটি মাত্র দুটি ধারার সংশোধনী সাপেক্ষ এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয় অধ্যাদেশটি কোনো পরিবর্তন ছাড়াই সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়। সরকার আইনি সংস্কারের এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে নির্বাচন কমিশনের হাতকে যথেষ্ট শক্তিশালী করেছে।

এই সরকারের আমলে বেশ কয়েকটি জাতীয় সংসদ আসনের উপনির্বাচন এবং পাঁচ হাজারের অধিক স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে তাঁর মন্ত্রিপরিষদের সদস্য কেউই নির্বাচনকে প্রভাবিত করার জন্য কমিশনের ওপর কোনো ধরনের চাপ সৃষ্টি কিংবা নির্বাচনকালীন মাঠপর্যায়ের প্রশাসনে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেননি। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় সরকার নির্বাচনকালীন সময়ে বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্যের আচরণ সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথে বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, কমিশন নির্বাচন স্থগিত করে এযাবৎ নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যয় করা সমুদয় অর্থ সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের কাছ থেকে আদায় করবে মর্মে পত্র লিখে তাঁদের এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য করে।

রাজনৈতিক পর্যায়ে সম্পর্ক যথাযথ থাকলেও প্রশাসনিক পর্যায়ে কমিশনের ভাগ্য ততটা সুপ্রসন্ন ছিল না। কমিশন সচিবালয় অধ্যাদেশটি আইনে রূপান্তরিত হয়ে বহাল থাকল ঠিকই; কিন্তু এটির বাস্তবায়নে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের যৎসামান্য ক্ষমতা ছাড় দেওয়ার মানসিকতা এখনো তৈরি না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হওয়ার ফলে দীর্ঘসূত্রতা আর লালফিতার দৌরাত্ম্য থেকেই গেল। প্রনিক-এর নেতৃত্বে পরিচালিত কমিটির সুপারিশ আমলাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া পাস হয়ে যাবে, এটা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে কল্পনারও অতীত ছিল। এসব কারণেই কমিশনের পরিবর্তিত সাংগঠনিক কাঠামো ও অর্থ ছাড়করণের বিষয়টি বারবার কমিশন বলার পরও আইনের বিধি অনুযায়ী নিষ্পন্ন হতে এখনো বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। আর এসব ব্যাপারে বারবার প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করাও প্রশাসনিক রীতিশুদ্ধ নয়।

বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সার্ভার স্টেশনের স্থান নির্বাচন, ভূমি বরাদ্দ কিংবা ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়ে প্রশাসনের নেতিবাচক ও ঈর্ষাপরায়ণ দৃষ্টিভঙ্গির কথা এর আগে উল্লেখ করেছি।

প্রশাসনের সূক্ষ্ম বৈরিতা ও ঈর্ষার কারণে কমিশনের মধ্যমেয়াদি মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনার অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে। সরকার থেকে প্রেষণে নিয়োজিত সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও অন্যান্য পদস্থ কর্মকর্তা বাংলাদেশ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগসাজশে শূন্য পদ থাকা সত্ত্বেও কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তাদের পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত করেছে। বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-অধ্যুষিত কমিশনে এসবের প্রতিকার চেয়েও কোনো ফল হয়নি।

দেশের সাড়ে ৯ কোটি নাগরিকের ব্যক্তিগত তথ্যসমৃদ্ধ ডাটাবেসের ভিত্তিতে জারি করা এনআইডি আরও উন্নত প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম ব্যবহার করে নতুন স্মার্টকার্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন সার্ভিস প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রচলনের জন্য ইতিমধ্যে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন কার্যকর করা হয়েছে। আর এই উদ্যোগ এগিয়ে নেওয়ার জন্য বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় প্রায় ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে ২০১১ সালে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আবারও প্রশাসনের কিছু কর্মকর্তার বৈরিতা ও ঈর্ষার কারণে কখনো পরিসংখ্যান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে, আবার কখনো প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মাধ্যমে নতুন করে ১৬ কোটি নাগরিকের ডাটাবেস তৈরি করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। আমি জানি, এ উদ্যোগ সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। নির্বাচন কমিশনের ডাটাবেস ও জন্মনিবন্ধন অধিদপ্তরের ডাটাকে সংকলিত করেই পপুলেশন রেজিস্ট্রি তৈরি করা সম্ভব এবং সেটাই কাম্য। সোজা পথে না গিয়ে এসব কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের বিভ্রান্ত করে কমিশনের প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছেন। ছবিসহ ভোটার তালিকা কার্যক্রমের মতো একটি সফল উদ্যোগকে সাময়িকভাবে উপেক্ষা করা হলেও এখানেই সবাইকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার ফিরে আসতে হবে। কেননা, এরকম একটি নির্ভুল ও প্রামাণিক তথ্যভান্ডার নিকট-ভবিষ্যতে তৈরি করার সামর্থ্য সরকারের নেই।

আমাদের মেয়াদের আধা পথ পাড়ি দেওয়ার পর থেকেই সরকারের কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত সহযোগিতা পাইনি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আমাদের কাজের প্রকৃতি ও চাহিদা অনুযায়ী আমরা যাঁদের কমিশন সচিবালয়ে নিয়োগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছি, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমরা তাঁদের পেয়েছি। তাঁদের বদলির পর সচিব ও অতিরিক্ত সচিব পদে আমরা তিনজনের একটি করে প্যানেল পাঠিয়ে তাঁদের মধ্য থেকে কাউকে প্রেষণে নিয়োগের জন্য অনুরোধপত্র পাঠাই। কিন্তু আমাদের সে অনুরোধ উপেক্ষা করে সরকার সম্পূর্ণ প্রযুক্তিবিমুখ ও অকর্মণ্য এক ব্যক্তিকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়। একইভাবে আরেক নেতিবাচক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি অতিরিক্ত সচিব হিসেবে কমিশনে এসে কমিশনের গতিময়তাকে স্তব্ধ করে দেন। সরকারি কর্মকমিশন কর্তৃক সুপারিশ করা এবং সব পর্যায়ের যাচাই-বাছাই করে ছাড়পত্র পাওয়া শত শত প্রার্থীর নিয়োগের নথি প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে মাসের পর মাস আটকে রাখা হয়েছে; অথচ এগুলোর সবই উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তার পদ এবং প্রতিটি উপজেলার জন্য মাত্র একটি পদই বরাদ্দ আছে।

কমিশনের অনুরোধের প্রতি সরকারের অবজ্ঞার সবচেয়ে নিকৃষ্ট উদাহরণ ছিল নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েনের আদেশ প্রদান থেকে বিরত থাকা। নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর আমি জানতে পেরেছি যে সরকার আমাদের অনুরোধ পাওয়ার পরপরই এই অনুরোধ রক্ষা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সিদ্ধান্তটি সম্পর্কে আমাদের জানানো হয়নি। নির্বাচনের দুই দিন আগে কমিশনার এম সাখাওয়াত হোসেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে নারায়ণগঞ্জে সভা করতে গিয়ে সেনাবাহিনীর কোনো সদস্যের উপস্থিতি দেখতে না পেয়ে একটা বিপর্যয়ের আশঙ্কা করেন। অনেক ঘাট ঘুরে আমরা জানতে পারি, এ নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েনের বিষয়ে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের কোনো সিদ্ধান্ত নেই। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কোন বাহিনীকে কখন, কোথায় এবং কীভাবে মোতায়েন করা হবে, এসব নির্ণয় করার দায়িত্ব কমিশনের। কমিশন সরকারের কাছে যে ধরনের সাহায্য চাইবে, সরকার তা দিতে বাধ্য। এখানে সরকারের নিজস্ব সিদ্ধান্তের কোনো সুযোগ নেই। অথচ সরকার তা-ই করে কমিশনকে যথেষ্ট বিপাকে ফেলেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎকণ্ঠা আর সংশয়ের মধ্য দিয়ে সেনাবাহিনীর সঙ্গে আমার সম্পর্কের শুরু। তবে যতই সময় পার হচ্ছিল, ততই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে একে অপরের তুলনামূলক সামর্থ্য, ক্ষমতা ও দক্ষতা সম্পর্কে সচেতনতা আমাদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সহনশীলতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে যৌথভাবে কাজ করার একটা সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে।

সেনাবাহিনীর সঙ্গে আমার সংযোগ এই প্রথম নয়। ১৯৬৮ সালে শিক্ষানবিশ অফিসার হিসেবে আমি ১৯ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্টের সঙ্গে তাদের শীতকালীন প্রশিক্ষণে তিন মাস সংযুক্ত ছিলাম। পরে ১৯৬৯-৭১ সময়ে ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসনামলে আমি পাকিস্তানের উভয় অংশে মাঠপর্যায়ের কাজ করেছি। সামরিক গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কথা বাদ দিলে, সেনাবাহিনীর কাজ সোজাসাপ্টা: কোনো অনুক্ত উদ্দেশ্য মাথায় রেখে এরা সাধারণত রেখে-ঢেকে কোনো কাজ করে না। আর সে কারণেই ২০০৭ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি সেনাবাহিনীর একটি বিশেষজ্ঞ দল যখন স্ব-উদ্যোগে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং এনআইডি প্রস্তুত করার জন্য প্রকল্পের একটি ধারণাপত্র উপদেষ্টা পরিষদের অবগতির জন্য উপস্থাপন করে, তখন স্বভাবতই এ কাজে তাদের এত আগ্রহের বিষয়টি আমার মনে অনেক সংশয়ের সৃষ্টি করে। সেনাবাহিনী কি এই ভোটার ডাটাবেস তৈরি করে আমাদের শুধু তাদের শর্তে ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে তারা নিজেরাই এর স্বত্ব সংরক্ষণ করতে চায়? সে ক্ষেত্রে এটি ব্যবহারে তাদের এমন কি কোনো পরিকল্পনা আছে, যা ব্যক্তি পর্যায়ে নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন করতে পারে? নাকি তারা সত্যিকার অর্থেই এই প্রকল্পের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বেসামরিক প্রশাসনকে সহযোগিতা করার পাশাপাশি তাদের পেশাদারি ও সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করতে চায়?

এক সপ্তাহের ব্যবধানে উপদেষ্টা পরিষদের সভার একটি বিজ্ঞপ্তি আমার সংশয়কে আরও ঘনীভূত করল। ওই সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রস্তুত করা একটি কার্যপত্র, যেখানে ছবিসহ ভোটার তালিকা ও এনআইডি প্রস্তুতকরণের জন্য সম্ভাব্য ব্যয়ের একটি প্রাক্কলন সংযুক্ত করা হয়েছে। এই প্রকল্পের স্বত্বাধিকারী ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ যদি কমিশন হয়, তবে এ-সংক্রান্ত সমুদয় বিষয় প্রথমে কমিশনে আসতে হবে। কমিশন তা নিয়মমাফিক প্রক্রিয়াকরণ করে সরকারের বিবেচনার জন্য অগ্রায়ণ করবে। প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকেই সঠিক পদ্ধতি উল্লেখ করে কেন সেনাবাহিনীকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রস্তাবটি কমিশনে পাঠাতে না বলে, তা উপদেষ্টা পরিষদের বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হলো? তাহলে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রেখেই কি সরকার তাদের দিয়ে আমাদের কাজ করাতে চায়? আমি মনস্থির করলাম যে সরকার ও সেনাবাহিনীর কাছে আমি অপ্রিয় হলেও অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এই পদ্ধতির প্রতিবাদ করতে হবে এবং ভোটার তালিকা ও এনআইডি প্রণয়নের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের হাতে নিয়ে আসতে হবে। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সংবিধান আমার এই একক সংগ্রামে ছিল আমার শক্তির প্রধান উৎস। সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদে যে পাঁচটি বিষয়ে কমিশনের ওপর সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পিত আছে, সেগুলোর মধ্যে ভোটার তালিকা প্রণয়ন অন্যতম। উপদেষ্টা পরিষদের সভায় আমি সংবিধানের এই অনুচ্ছেদের উল্লেখ করে নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমার যুক্তি উত্থাপন করলাম। প্রধান উপদেষ্টা এবং সভায় উপস্থিত সেনাবাহিনীর প্রধান, এ বিষয়ে তাঁদের অন্য কোনো চিন্তাভাবনা থাকলেও আমার যুক্তি মেনে নিলেন। ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নের বিষয়ে কমিশনের নিয়ন্ত্রণ স্বীকৃত হলো। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য পদস্থ একজন সেনা কর্মকর্তাকে মনোনীত করার বিষয়েও সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো।

উপদেষ্টা পরিষদের সভার পর আমার সংশয় ও উৎকণ্ঠা বহুলাংশে দূরীভূত হলেও সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কটা কিন্তু খুব সহসাই সহজ হলো না। দ্রুত ভোটার তালিকা প্রণয়নের লক্ষ্যে সেনাবাহিনী বাড়ি বাড়ি গিয়ে তা সংগ্রহের পরিবর্তে কয়েক গ্রামের ভোটারদের নিবন্ধনের জন্য সুবিধাজনক স্থানে ক্যাম্প স্থাপনের পদ্ধতি নিরূপণ করে। এই পদ্ধতির কার্যকারিতা নিয়ে আমাদের সন্দেহ থাকলেও সেনাপ্রধান ও বিশেষজ্ঞ দল এই পদ্ধতিই সর্বোত্তম এবং সময় ও অর্থসাশ্রয়ী হিসেবে এটি গ্রহণে আমাদের বাধ্য করে। এই পদ্ধতি আনুষ্ঠানিকভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরার পর এর বিরুদ্ধে সমালোচনার প্রচণ্ড ঝড় ওঠে। এই সমালোচনার ভালো দিক এই ছিল যে সেনাবাহিনী ভোটার নিবন্ধন-সংক্রান্ত অকারিগরি বিষয়ে, বিশেষ করে ভোটারদের আচার-আচরণ সম্পর্কে, কমিশনের অধিকতর দক্ষতা ও সামর্থ্য সম্পর্কে সচকিত হয়। এই কারণেই ভোটার তালিকা প্রণয়নপদ্ধতি দেশব্যাপী বাস্তবায়নের আগে পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষাসংক্রান্ত আমার প্রস্তাব এক সভায় সেনাপ্রধান 'এতে কালক্ষেপণ ছাড়া আর কিছু হবে না' মর্মে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলেও পরবর্তী সময়ে তিনি এর অন্যতম প্রধান সমর্থক ছিলেন।

সেনাবাহিনীর সঙ্গে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, নবম জাতীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর তারা ভোটার তালিকা, ডাটাবেস, সরঞ্জামাদি এবং উদ্ভাবিত সমুদয় সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার কমিশনের অনুকূলে হস্তান্তর করবে। কিন্তু আমি হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার কিংবা সরঞ্জামাদির চেয়ে এগুলোর ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রযুক্তি হস্তান্তরের বিষয়ে অধিকতর আগ্রহী ছিলাম। প্রকল্পের সরঞ্জামাদি অবশ্যই দায়িত্ব শেষ হওয়ার পর স্বত্বাধিকারীকে বুঝিয়ে দিতে হয়; কিন্তু প্রযুক্তি হস্তান্তর একটি দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি এবং তা প্রকল্প পরিকল্পনাকাল থেকে শুরু হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু প্রযুক্তি হস্তান্তরের বিষয়ে সেনাবাহিনীর অনিচ্ছা কিংবা আগ্রহের অভাবের কারণ সম্পর্কে আমি কখনো জানতে পারিনি। কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তারাই কমিশনের মূল শক্তি। আমি প্রকল্পের কারিগরি উন্নয়ন কর্মসূচিতে এদের সম্পৃক্ত করার কথা বললেও তা করা হয়নি। এমনকি দেশীয় কোন কোন আইটি বিশেষজ্ঞ ফার্মের সহায়তায় সেনাবাহিনী প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার উদ্ভাবন করেছে, তা-ও আমি জানতে পেরেছি প্রকল্প সমাপ্তির কিছুকাল আগে। এসব কারণে এখনো ছবিসহ ভোটার তালিকা ও এনআইডি বিষয়ে কমিশনে একটি পেশাদার কর্মিবাহিনী গড়ে ওঠেনি এবং এখনো উপদেশকদের মাধ্যমে এ কাজ নির্বাহ করতে হচ্ছে।

মাত্র ১৮ মাস সময়ের মধ্যে ৯ কোটি ভোটারের ছবি ও আঙুলের ছাপসহ নির্ভুল তালিকা প্রণয়ন ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। এ কাজ সফলতার সঙ্গে নিষ্পন্ন করতে গিয়ে কমিশন ও সেনাবাহিনী অত্যন্ত নিবিড়ভাবে একে অন্যের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। এই প্রক্রিয়ার শুরুতে উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন থাকলেও তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা এবং পারস্পরিক সামর্থ্য-অসামর্থ্যের বাস্তব অভিজ্ঞতা এই সম্পর্ককে এক দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সশস্ত্র বাহিনী প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হলেও আমাদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তারা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রটোকল মেনে চলেছে। জেনারেল মইন উ আহমেদ থেকে শুরু করে সেনাবাহিনীর সব কর্মকর্তা এই প্রকল্প চলাকালীন আমাদের সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছেন। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে সেনাবাহিনীর মুখ্য ভূমিকা থাকলেও দুর্গম অঞ্চলের ভোটার নিবন্ধনের ক্ষেত্রে নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। সব বাহিনীর সম্মিলিত চেষ্টার ফলেই ছবিসহ ভোটার তালিকা ন্যূনতম সময়ের মধ্যে প্রণয়নের একটি অসম্ভব কাজকে সফলভাবে কমিশন সমাপ্ত করতে পেরেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বাচন কমিশন ও উচ্চ আদালত

নির্বাচন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে উচ্চ আদালতের সম্পৃক্ততার অন্যতম প্রধান উৎস বিভিন্ন ধরনের রিট মামলা। কমিশনের আইনি কাঠামো কিংবা কমিশন কিংবা কমিশন থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার আদেশে কোনো নাগরিক, ভোটার কিংবা প্রার্থী তাঁর অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে বিবেচনা করে এর প্রতিকারের জন্য উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হতে পারেন। যে বছর সংসদ কিংবা অন্য কোনো নির্বাচন প্রত্যাশিত নয়, সে সময় এ ধরনের মামলা রুজু হলে কমিশনের উৎকণ্ঠার কোনো কারণ থাকে না। আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে এবং আদালতের রায় যখন হাতে আসবে, তখন কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সমস্যা দেখা দেয় তখনই, যখন আসন্ন নির্বাচনকে লক্ষ্য করে রিট আবেদন দাখিল করা হয় এবং কোর্ট কর্তৃক সেই আবেদনের ওপর ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে দায়ের করা রিট মামলাগুলো সম্পর্কে আমাদের তিক্ত ও হতাশাব্যঞ্জক অভিজ্ঞতা হয়েছে। সীমানা পুনর্নির্ধারণ এবং রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রার্থীদের মনোনয়ন বাতিল কিংবা গ্রহণসম্পর্কিত কমিশনে আপিলের রায়ের ওপর নির্বাচনকালীন সময়ে সাধারণত রিট মামলা রুজু করা হয়। যেহেতু সমগ্র নির্বাচন-প্রক্রিয়া একটি স্বল্পকালীন সময়সীমার মধ্যে আবদ্ধ, সেহেতু নির্বাচনের সিডিউল রক্ষার বিষয়টি আদালতের সর্বোচ্চ বিবেচনা পাওয়ার যোগ্য। সংসদীয় আসন পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত মোট ১৮টি রিট মামলা গ্রহণ করে আদালত এ-সংক্রান্ত সব কার্যক্রম তিন মাসের জন্য স্থগিত করেন। অথচ সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদে সীমানা পুনর্নির্ধারণ-সংক্রান্ত সব সিদ্ধান্তকে আদালতের এখতিয়ার-বহির্ভূত রাখা হয়েছে। ২৯ ডিসেম্বর ২০০৯ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন ধার্য হয়েছে, অথচ ৪ নভেম্বর পর্যন্ত স্থগিতাদেশ বজায় রেখে উচ্চ আদালত সমগ্র জাতিকে কতটা উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন, তা সহজই অনুমেয়। অবশ্য ওই তারিখে সব কটি রিট খারিজ করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি দ্রুত তফসিল ঘোষণা করে সঠিক সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আশা জাগরূক রাখতে সক্ষম হই।

প্রার্থিতা গ্রহণ কিংবা বাতিলের বিষয়ে আমাদের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আরেকটি শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ২৯ ডিসেম্বর যে নবম সংসদ নির্বাচনের তারিখ, তা বিজ্ঞ বিচারকেরা নিশ্চয়ই জানতেন। তাঁরা নিশ্চয়ই এ-ও জানতেন যে ৩০০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী হাজার হাজার প্রার্থীর নাম ও প্রতীক-সংবলিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যালট পেপার মুদ্রণ এবং এসব সরঞ্জাম দেশের বিভিন্ন পোলিং স্টেশনে পৌঁছানো কত সময় ও শ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার। ৩৮টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের ১ হাজার ৪১৭ জন প্রার্থী ও ১৫০ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী মিলে মোট ১ হাজার ৫৬৭ জন প্রার্থী রিটার্নিং অফিসার বরাবর মনোনয়নপত্র জমা দেন। তাঁদের মধ্যে ৩০৯ জন তাঁদের মনোনয়ন বাতিলের বিরুদ্ধে এবং ৮৬ জনের মনোনয়ন গ্রহণের বিরুদ্ধে কমিশনে আপিল দায়ের করা হয়। এত অধিকসংখ্যক আপিল নিষ্পত্তির জন্য আমাদের হাতে সময় ছিল মাত্র চার দিন—৬, ৭, ৮ ও ১০ ডিসেম্বর। ৯ ডিসেম্বর পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে আমাদের শুনানি বন্ধ ছিল। সকাল ১০টা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত শুনানি গ্রহণ করে আমাদের সব কেস নিষ্পত্তি করতে হয়েছে। আমরা এতসব করার পরও উচ্চ আদালত থেকে নির্বাচনের মাত্র নয় দিন আগে নতুনভাবে ১১ জন প্রার্থীর অন্তর্ভুক্তি কিংবা প্রতীক বরাদ্দের আদেশ পাই। ওই সব আদেশ পরিপালন করতে গিয়ে ওই সব আসনের নির্বাচন প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। চূড়ান্ত দুর্দশা আর হতাশার মধ্যেও আদালতের আদেশ পালন করতে গিয়ে আমাদের লক্ষাধিক ব্যালট পেপার পুড়িয়ে নতুন ব্যালট মুদ্রণ করে সেগুলো যথাসময়ে যথাস্থানে পাঠাতে হয়েছিল।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের মতো সর্বদাই সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারে না কেন, প্রায়ই বিদগ্ধজনের মুখে এমন প্রশ্ন শোনা যায়। আসলে এই দুই দেশের নির্বাচনসংশ্লিষ্ট পরিবেশ এত ভিন্ন যে, এই তুলনা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। অন্যান্যের মধ্যে তিন ধরনের প্রতিষ্ঠান ভারতীয় কমিশনকে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা করে থাকে : রাজনৈতিক দল, প্রশাসন এবং উচ্চ আদালত। দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে যে ধরনের সহযোগিতা পাওয়ার কথা, সব সময় তা পায় না। ভারতে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে রুজু করা রিটের ভিত্তিতে কোনো স্থগিতাদেশ কিংবা শুনানির আদেশ দেওয়া হয় না। নির্বাচনের পর রিটের ওপর শুনানি হয়ে থাকে। আমাদের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে কোনো আদালত নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর নির্বাচন কমিশনকে যুক্তিসংগত নোটিশ ও শুনানির সুযোগ প্রদান না করে অন্তর্বর্তী বা অন্য কোনোভাবে কোনো আদেশ বা নির্দেশ দিতে পারবেন না বলে বিধান করা হয়েছে। এই বিধান ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের মতো ব্যাপক না হলেও মন্দের ভালো। এই বিধানের বাস্তবায়ন কতটুকু হয়, সেটাই হবে দেখার বিষয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক দল

রাজনৈতিক দল কমিশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডার। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার স্বার্থে তাঁদের সঙ্গে কমিশনের একটি কার্যকর সম্পর্ক স্থাপন জরুরি বিবেচনা করেই কমিশন আইনি সংস্কারসংক্রান্ত প্রস্তাবাবলি চূড়ান্ত করার আগে সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপের উদ্যোগ নেয়। দুর্ভাগ্যবশত এই উদ্যোগই দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর সঙ্গে আমাদের সৌহার্দ্যের পরিবর্তে এক অনাকাঙ্ক্ষিত বৈরিতার সূচনা করে।

কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে সংলাপ-প্রক্রিয়া শুরু করার আগেই ২০০৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর বিএনপির সহদপ্তর সম্পাদক রিজভী আহমদ এক পত্র মারফত আমাদের অবহিত করেন যে, দলের চেয়ারপারসন দলের মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়াকে দল থেকে বহিষ্কার করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনকে দলের মহাসচিব নিয়োগ করেছেন। অন্যদিকে ৯ সেপ্টেম্বর তারিখে বিএনপির দপ্তর সম্পাদক মফিকুল হাসান তৃপ্তি এক পত্রের মাধ্যমে জানান যে দলের মহাসচিবকে বহিষ্কারের আগে কোনো কারণ দর্শাও নোটিশ জারি না করায় এবং পরবর্তী সময়ে ওই আদেশ জাতীয় স্থায়ী কমিটি কর্তৃক অনুসমর্থিত না হওয়ায় এই আদেশ সম্পূর্ণ বেআইনি। এই পরিপ্রেক্ষিতে মান্নান ভূঁইয়া আইনত এখনো দলীয় মহাসচিব পদে বহাল আছেন।

বিএনপির সঙ্গে সংলাপের তারিখ আরও দুই মাস পর নির্ধারিত থাকায় বিষয়টি নিয়ে কমিশনে কোনো আলোচনা না করে এই সময়ের মধ্যে দল নিজেই এ সমস্যার সমাধান করে ফেলবে আমরা এই আশায় রইলাম।

সংলাপের জন্য নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে ১৫ দিন আগে দলের সচিব বরাবর আমন্ত্রণপত্র ও কার্যপত্র পাঠাতে হয়। বিএনপির সঙ্গে সংলাপের দিন ঘনিয়ে আসছিল; কিন্তু তাদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কোনো সমাধান হলো না। উভয় পক্ষই চেয়ারপারসনের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করে তারাই মূল বিএনপি বলে দাবি করে সংলাপের আমন্ত্রণপত্র পাওয়ার জন্য কমিশনের ওপর চাপ অব্যাহত রাখল। বিষয়টি কমিশনের জন্য সহজ ছিল না : কমিশন কোনো দলের অভ্যন্তরীণ বিবাদে জড়িয়ে পড়তে চায় না।

বিএনপিকে আমন্ত্রণ করার বিষয়ে কমিশন যখন দ্বিধাগ্রস্ত, তখন ৩১ অক্টোবর বিএনপির প্রাক্তন এমপি এবং মন্ত্রী হাফিজ উদ্দিন আহম্মদ স্বাক্ষরিত এক পত্রের মাধ্যমে অবগত করানো হয় যে বিগত ২৯ অক্টোবর রাতে দলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থায়ী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দলের চেয়ারপারসনের অনুপস্থিতির কারণে দলের স্থায়ী কমিটির জ্যেষ্ঠ সদস্য এম সাইফুর রহমানকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন এবং হাফিজ উদ্দিন আহম্মদকে অস্থায়ী মহাসচিবের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ওই পত্রে সংলাপের জন্য আমন্ত্রণপত্র হাফিজউদ্দিন বরাবর প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। পত্রের সঙ্গে স্থায়ী কমিটির একটি কার্যবিবরণীও সংযুক্ত করা হয়।

স্থায়ী কমিটির কার্যবিবরণীটি কমিশন গুরুত্বের সঙ্গে বিএনপির ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রের সূত্রে পর্যালোচনা করে। পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে দল থেকে বহিষ্কৃত সদস্যদের কারণ দর্শাও নোটিশ না দেওয়া হলেও 'সকল ক্ষেত্রে যথা শিগগির সম্ভব জাতীয় স্থায়ী কমিটির অনুমোদন নিতে হবে'—এই বিধানটি পরিপালন করা আবশ্যকীয়। ২৯ অক্টোবর তারিখে অনুষ্ঠিত স্থায়ী কমিটির সভায় কার্যত ওই আবশ্যকীয় বিধানের পরিপালন করা হয়েছে বলে কমিশন মনে করে। বিএনপির স্থায়ী কমিটির জীবিত ১৪ জন সদস্যের মধ্যে তখন তিনজন কারারুদ্ধ ছিলেন আর দুজন ওই সভায় যোগ দেননি। মোট সাতজন সদস্য সভায় যোগ দিয়েছিলেন, যা প্রয়োজনীয় কোরাম পূরণ করেছিল। এ ছাড়া ভেঙে দেওয়া অষ্টম সংসদের ৫৪ জন সাংসদ লিখিতভাবে সাইফুর রহমান কমিটিকে সমর্থন করে বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন, যা হাফিজ উদ্দিন কমিশনে অগ্রায়ণ করেন।

কমিশনের কোনো কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী বিবদমান উভয় পক্ষকেই আমন্ত্রণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেটা করলে তা হতো কমিশনের জন্য আত্মঘাতী। কমিশন কর্তৃক উভয় পক্ষকে আমন্ত্রণ করার অর্থ উভয়কেই দল হিসেবে স্বীকার করা এবং সেটি করা হলে বিএনপিকে কমিশন দ্বিখণ্ডিত করেছে বলে যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক অভিযোগটি করা হয়, তা-ই সত্য বলে প্রমাণিত হতো। তা ছাড়া যে কঠোর মানদণ্ডের ভিত্তিতে দেশে বিদ্যমান দেড় শতেরও বেশি দলের মধ্য থেকে মাত্র ১৬টি দলকে সংলাপের জন্য বাছাই করা হয়েছিল, সেই মানদণ্ডের কঠোরতাও আর রক্ষা করা সম্ভব হতো না। বিএনপির উভয় পক্ষকে সংলাপে ডাকলে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ওয়ার্কার্স পার্টি, ইসলামী আন্দোলন ও মুসলিম লীগের মতো দলগুলো, যেগুলো বহু উপদলে বিভক্ত, আমন্ত্রণ না জানানোর আর কোনো কারণ থাকত না।

সব দিক বিবেচনা করে কমিশন সর্বসম্মতিক্রমে বিএনপির পক্ষে অস্থায়ী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাসচিব হাফিজ উদ্দিন আহম্মদকে সংলাপে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণপত্র পাঠানোর সিদ্ধান্ত প্রদান করে।

আমরা আমাদের সাধ্যমতো নৈর্ব্যক্তিক থেকে বিএনপি উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছি। বিএনপির মহাসচিবকে বহিষ্কারের বিষয়ে আমাদের কোনো ভূমিকা নেই—বিএনপি নিজেই এই সমস্যার সৃষ্টি করেছে। আমাদের প্রচেষ্টায় আমরা কৌশলী না হয়ে যুক্তিবাদী থেকেছি; রাজনীতির বিচিত্র খেলা অনুধাবন না করে আইনের অনুশাসন অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। পদ্ধতিগতভাবে এই প্রচেষ্টা শুদ্ধ হলেও রাজনৈতিকভাবে তা যথাযথ ছিল না। সে কারণে আমাদের মেয়াদকালেই আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখতে পাই যে এই পুরো ঘটনায় যাঁরা মুখ্য ভূমিকা পালন করে আমাদের বিভ্রান্ত করেছিলেন, তাঁরাই আবার সসম্মানে পার্টিতে পুনর্বাসিত হয়ে সুযোগ পেলেই কমিশনকে গালমন্দ করার প্রতিযোগিতায় শামিল হলেন। বিএনপিকে দ্বিখণ্ডিত করার অভিযোগ যদি কারও ওপর বর্তায়, তাহলে এসব ব্যক্তিই এ জন্য দায়ী এবং তাঁদের শাস্তি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাঁদের পুনর্বাসনকে বৈধতা দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনের ওপর বিএনপির বৈরিতা অব্যাহত থাকল।

আমাদের মেয়াদকালের শেষ সময় পর্যন্ত বিএনপির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে আমরা বিদ্যমান কতিপয় আইন সংশোধন ও নতুন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিই। এবারও নিবন্ধন করা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপে বসে আমরা সংশোধনী ও আইনের খসড়াগুলো চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত নিই এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপিকে সংলাপে আসার জন্য একাধিকবার আমন্ত্রণপত্র পাঠাই। আমাদের আমন্ত্রণের উত্তরে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব কী কী কারণে আমাদের সঙ্গে সংলাপে বসতে আগ্রহী নন, তা লিখিতভাবে আমাদের অবহিত করেন। আমি প্রতিটি অভিযোগ কমিশন সচিবালয়ের সহায়তায় পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করে দেখেছি যে এগুলো হয় তথ্যবিকৃতি কিংবা অসত্য ভাষণের দোষে দুষ্ট। আমি প্রতিটি অভিযোগের ওপর আমাদের বক্তব্য প্রস্তুত করেছি। এই দুটি দলিলের একটির সঙ্গে আরেকটিকে মিলিয়ে পাঠ করলে বিএনপি-উত্থাপিত এসব অভিযোগের যে কোনো ভিত্তি নেই, তা সুস্পষ্ট হবে। এসবের গুরুত্ব অনুধাবন করে আমি পত্রটি হুবহু প্রকাশ করে এগুলোর অনুচ্ছেদওয়ারি জবাবও পাঠকের অবগতি ও বিবেচনার জন্য নিচে তুলে ধরলাম :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিবের পত্রের অনুলিপি

তারিখ : ১৩ জুন ২০১১ ইং
বরাবর
ড. মোহাম্মদ সাদিক
ভারপ্রাপ্ত সচিব
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
সূত্র : **আপনার পত্র নং নিকস/প্র-৩/রাদ/সংলাপ/৫(১৩২)/২০১১/৭২, তারিখ : ২৫ মে, ২০১১ ইং**

প্রিয় মহোদয়,

আসসালামু আলাইকুম।

আপনার সূত্রেল্লেখিত পত্রে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসাবে কতিপয় বিদ্যমান আইন সংশোধন ও নতুন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ কমিশন গ্রহণ করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর প্রেক্ষাপট হিসাবে নবম জাতীয় নির্বাচনের আগে কমিশন কর্তৃক গৃহীত এ-জাতীয় কিছু পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

২। ২০০৭ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি কমিশন দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে রাজনৈতিক দল নিবন্ধনসহ নির্বাচন অনুষ্ঠানের নামে যত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে প্রায় সবই ছিল পক্ষপাতমূলক, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং তৎকালীন সরকারের ইচ্ছা অনুযায়ী বিএনপিকে নিশ্চিহ্ন করা এবং অন্য একটি দলকে নির্বাচনে জয়ী করার লক্ষ্যে। এ উদ্দেশ্য সাধনের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বিএনপিকে দল হিসাবে নির্বাচন থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য একটি বিকল্প বেআইনি বিএনপি দাঁড় করিয়ে সেটাকে স্বীকৃতি দেওয়ার অপচেষ্টা করে নির্বাচন কমিশন। দলীয় প্রধান এবং নেতা-কর্মীদের বাধার মুখে এ ষড়যন্ত্র ফলপ্রসূ হয়নি।

৩। নতুন করে ভোটার তালিকা তৈরি করার ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কমিশন নতুন ভোটার তালিকা তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং অসৎ উদ্দেশ্যে সরকারের দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকার আশা পূরণার্থে এর সাথে যোগ করা হয় ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা তৈরির শর্ত। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শত শত কোটি টাকা অপচয় করে ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা তৈরি করার দাবি করা হলেও এ ভোটার তালিকা নির্বাচনের সময় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের দেওয়া হয়নি এবং এখনো দেওয়া হচ্ছে না। তাহলে কেন তখন এই কথিত ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা তৈরি করা হয়েছিল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই তথাকথিত নির্ভুল ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মিথ্যা তথ্য দিতে বাধ্য করা হয়েছে আগ্রহী ভোটারদের। এ ব্যাপারে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বরাবর সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করেও তার জবাব এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এখানেই শেষ নয়, নির্বাচনকে 'প্রশ্নাতীতভাবে নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু' করার উদ্দেশ্যে ছবিযুক্ত ভোটার তালিকার সাথে যোগ করা হলো ভোটার পরিচয়পত্র যা পরে জাতীয় পরিচয়পত্র নামে অভিহিত করা হয়েছে। আবারও শত শত কোটি টাকা অপচয় করে এই কথিত পরিচয়পত্র ভোট দেবার জন্য প্রয়োজন হবে না বলে কমিশনের ঘোষণা জনগণকে অবাক করেছে এবং এই কার্যক্রম প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন অবৈধ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ বৃদ্ধির সহায়ক হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে।

৪। নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ করার নামে এলাকার যোগাযোগব্যবস্থা, জনগণের মধ্যে দীর্ঘকালের সামাজিক সম্পর্ক, এ সবকিছু উপেক্ষা করে একান্ত যান্ত্রিকভাবে কোনো গ্রহণযোগ্য যুক্তি বা কারণ ছাড়া সীমানা পুনর্নির্ধারণ করে অনেক ক্ষেত্রে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন প্রার্থীদের জন্য অসম অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে এবং একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় জনসংখ্যায় সমতা আনয়নের প্রয়োজনীয়তাকে সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রধান যুক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হলেও বাস্তবে দেখা যায় অনুল্লেখিত কারণে পুনর্নির্ধারিত নির্বাচনী এলাকাসমূহের জনসংখ্যা পৌনে তিন থেকে সোয়া পাঁচ লক্ষ পর্যন্ত আছে। ফলে নির্বাচনী এলাকাসমূহের এই অযৌক্তিক কাটাছেঁড়ার পিছনে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

৫। ঢাকা সিটি করপোরেশনের মেয়াদ শেষ হয়েছে প্রায় ৪ বছর আগে। নির্বাচন কমিশন অন্তত তিনবার নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু সরকারের আপত্তির মুখে প্রতিবারই কমিশন কোনো কারণ ছাড়াই তাদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে। এ থেকে জনগণের এই ধারণা হয়েছে যে যত দিন পর্যন্ত সরকারের পছন্দ মোতাবেক প্রার্থী জয়ী হবার পরিস্থিতি সৃষ্টি না হবে, তত দিন পর্যন্ত কমিশন এই নির্বাচন নিয়ে অগ্রসর হবে না। কমিশনের 'স্বাধীনভাবে' দায়িত্ব পালন করার দাবি যে কতটা বাস্তবতাবর্জিত এটাই একটি প্রমাণ।

৬। পৌর নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে প্রতিরক্ষাবাহিনী নিয়োগের বিধান থাকা এবং নির্বাচন কমিশন কর্তৃক একাধিকবার পৌর নির্বাচনে সেনাবাহিনী নিয়োগের ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন তা কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছে, এর ফলে সরকারি দল সমর্থিত প্রার্থীদের পক্ষে নির্বাচনে বিপুল কারচুপি করা সম্ভব হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেখানে কমিশন আইনগত ও সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে ব্যর্থ, সেখানে তাদের নিরপেক্ষতার দাবি কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। ভোলা জাতীয় সংসদ উপনির্বাচনেও একই ঘটনা ঘটেছে।

৭। সংবিধান অনুযায়ী নব্বই দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান বাধ্যতামূলক। কমিশন বিভিন্ন অজুহাতে এই নির্বাচন নব্বই দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনকে সংবিধান লঙ্ঘনের দায়ে দায়ী করেছে। এই দায় মাথায় নিয়ে কমিশনের পক্ষে আগামী নির্বাচন সম্পর্কে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ জনমনে আস্থার সৃষ্টি করবে না।

৮। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৮৭.২ শতাংশ ভোটার উপস্থিতি শুধু বাংলাদেশ নয়, পৃথিবীর যেকোনো দেশের ভোটার উপস্থিতির হারকে ম্লান করে দিয়েছে। অনেক ভোটকেন্দ্রে ৯৮ শতাংশ এবং কয়েকটি কেন্দ্রে ১০০ ভাগের বেশি ভোটার ভোট দেওয়ার অভিযোগ সম্পর্কে কমিশনের তরফ থেকে কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যার অনুপস্থিতি কমিশনের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে ব্যাপক বিরূপ ধারণার সৃষ্টি করেছে।

৯। ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রধান নির্বাচন কমিশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনিসহ নির্বাচন কমিশনের অন্য সদস্যদের চুক্তির মেয়াদ প্রায় সমাপ্তির পথে। এই পরিস্থিতিতে মেয়াদের শেষ সময়ে এসে বিতর্কিত এই কমিশনের আগামী নির্বাচনসংক্রান্ত আইনকানুন, বিধিবিধান সংশোধন বা প্রণয়নের উদ্যোগ না নিয়ে তা পরবর্তী নির্বাচন কমিশনের জন্য রেখে যাওয়াই যথাযথ হবে বলে আমরা মনে করি। আমরা এটাও মনে করি যে, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল নিবন্ধন, ভোটার তালিকা তৈরি, বিভিন্ন নির্বাচন ও উপনির্বাচন পরিচালনাসহ সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে যে নির্বাচন কমিশন পক্ষপাতদুষ্ট ও দুর্বল আচরণের মাধ্যমে জনগণের আস্থা হারিয়েছে, সেই কমিশনের সাথে আগামী নির্বাচনসম্পর্কিত আইনকানুন, বিধিবিধান সংশোধন বা প্রণয়ন প্রসঙ্গে আলোচনা সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সাধনে ফলপ্রসূ হবে না।

ধন্যবাদান্তে—
আপনার বিশ্বস্ত,
মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর
ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিএনপির অস্থায়ী মহাসচিবের পত্রে উল্লিখিত অভিযোগসমূহের জবাব

ক. সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হওয়ার কারণে সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনকে সংবিধান লঙ্ঘনের দায়ে দায়ী করেছে। এই দায় নিয়ে কমিশনের পক্ষে আগামী নির্বাচন সম্পর্কে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ জনমনে আস্থার সৃষ্টি করবে না।

সুপ্রিম কোর্টের কোন আদেশে কমিশনকে সংবিধান লঙ্ঘনের দায়ে দায়ী করা হয়েছে তা আমাদের জানা নেই। পত্রে এ ধরনের কোনো সূত্রের উল্লেখ নেই, বরং ২০০৭ সালের রিট মামলা নম্বর ৭১৩-এর রায় প্রদানকালে মাননীয় বিচারপতিগণ নিম্নোক্তরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন :

It appears that though there is a provision for holding the parliamentary elections within 90 days from the date of dissolution thereof but because of declaration of emergency as per Article 141 A-C of the Constitution and suspension of the fundamental rights and other unavoidable circumstances, the Election Commission and the Caretaker Government were not in a position to hold the election within that period. The present Caretaker Government is under legal obligation to the Election Commission in removing the existing defects to upgrade the obsolete methods (that) presently exist and to introduce the most modern methods like preparation of electoral roll, identification of document, namely voter ID card/national ID card, modern ballot box, by amending all provisions of electoral laws in the present context.

...Under these facts and circumstances, we are of the view that the Election Commission should hold the parliamentary election as well as all other elections, after fulfilling the observations and directions made hereinabove.

খ. ২০০৭ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে রাজনৈতিক দল নিবন্ধনসহ নির্বাচন অনুষ্ঠানের নামে যত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে প্রায় সবই ছিল পক্ষপাতমূলক, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং তৎকালীন সরকারের ইচ্ছা অনুযায়ী বিএনপিকে নিশ্চিহ্ন করা এবং অন্য একটি দলকে নির্বাচনে জয়ী করার লক্ষ্যে। এ উদ্দেশ্য সাধনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বিএনপিকে দল হিসেবে নির্বাচন থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য একটি বিকল্প বেআইনি বিএনপি দাঁড় করিয়ে সেটাকে স্বীকৃতি দেওয়ার অপচেষ্টা করে নির্বাচন কমিশন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে কোনো ধরনের যোগাযোগের আগেই দল থেকে মহাসচিবকে বহিষ্কারের প্রতিক্রিয়া বিএনপিতে অভ্যন্তরীণ দলীয় কোন্দলের সৃষ্টি করে, যা অনাকাঙ্ক্ষিত পক্ষ-প্রতিপক্ষের রূপ পরিগ্রহ করে। উভয় পক্ষই কমিশন আয়োজিত সংলাপে যোগদানের নিমিত্ত লিখিত অনুরোধ জানানোর পরই শুধু নির্বাচন কমিশন পক্ষ-প্রতিপক্ষ সম্পর্কে অবহিত হয় এবং প্রাপ্ত দলিলাদির ভিত্তিতে এক পক্ষকে সংলাপে ডাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। উভয় পক্ষই দলীয় প্রধানের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রদর্শন করেই কমিশনে তাদের দাবি পেশ করতে থাকে। বিএনপির মতো একটি প্রতিষ্ঠিত দলের অস্তিত্ব কমিশনের সংলাপে যোগ দেওয়ার ওপর নিশ্চয়ই নির্ভর করে না। প্রেক্ষাপট বিবেচনা না করে এবং নিজেদের সমকালীন ভূমিকা বিশ্লেষণ না করে উদ্ভূত রাজনৈতিক দায়ভার অন্যায়ভাবে কমিশনের ওপর চাপানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

গ. সুপ্রিম কোর্টের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও নতুন ভোটার তালিকা তৈরি এবং ছবিসহ ভোটার তালিকার উদ্যোগ গ্রহণ করে সরকারকে দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

ক-তে উল্লিখিত সুপ্রিম কোর্টের রায়টি এ বিষয়ে উচ্চ আদালতের সর্বশেষ রায়। ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সরকার ২০০৭ সালে পূর্বতন আইন বাতিল করে ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ, ২০০৭ জারি করে। ওই আইনের বিধান অনুসরণ করেই ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। তা ছাড়া কী প্রেক্ষিতে কমিশন ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, তা এত দ্রুত বিস্মৃত হওয়ার কথা নয়।

National Democratic Institute নামক একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে ২০০৬ সালের ভোটার তালিকার একটি কঠোর পরিবীক্ষণ করে ৯ কোটি ৩৩ লাখ ৭১ হাজার ৩৯৯ জন ভোটারের শতকরা ১৩ ভাগ বা ১ কোটি ২১ লাখ ৩৮ হাজার ২৮১ জন ভোটার উদ্বৃত্ত বা ভুয়া মর্মে শনাক্ত করে। ভোটার ডাটাবেসের গোঁজামিল ও অসংগতি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথে অন্যতম প্রধান বাধা। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায়ই ছিল ছবি ও আঙুলের ছাপসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন, যেখানে প্রতিটি নাগরিককে ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য নিবন্ধন কেন্দ্রে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হতে হয়। আগের ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল না বলেই ভুয়া ভোটার বা একাধিকবার ভোটার হওয়ার সুযোগ ছিল। সাড়ে ৮ কোটি ভোটারের নতুন করে নিবন্ধনের জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮ মাস সময়ও পর্যাপ্ত ছিল না। তবু বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দিনরাত পরিশ্রম করে এই কাজটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে।

ঘ. ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ভোটারদের মিথ্যা তথ্য দিতে বাধ্য করা হয়েছে।

ছবি ও আঙুলের ছাপসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন একটি কম্পিউটারভিত্তিক উচ্চপ্রযুক্তিসম্পন্ন উদ্যোগ। এখানে প্রতিটি আউটপুটের সঙ্গে সফটওয়্যার উন্নয়নের প্রশ্ন জড়িত। উন্নয়ন পর্যায়ে ছোটখাটো সমস্যার উদ্ভব হতেই পারে। ২০০৭-০৮ সালে দেশব্যাপী ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নকালে শুধু বর্তমান ঠিকানাতেই নিবন্ধন করা যেত। স্থায়ী ঠিকানায় নিবন্ধন করার সফটওয়্যার উন্নয়নের পর্যায়ে ছিল। এ বিষয়ে একাধিকবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিএনপির প্রতিনিধিদলকে তাদের সর্বশেষ পরিস্থিতি অবহিতও করেছেন। বর্তমানে উল্লিখিত সমস্যার সমাধানও হয়ে গেছে।

প্রোগ্রাম উন্নয়নকালীন ছোটখাটো সমস্যার সূত্র ধরে পুরো প্রোগ্রামটি প্রত্যাখ্যান করার মানসিকতা উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহার ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের জন্য মোটেই সহায়ক নয়।

ঙ. ভোট দেওয়ার জন্য পরিচয়পত্রের প্রয়োজন হবে না—কমিশনের এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে শত শত কোটি টাকা অপচয় করে কেন ভোটার তালিকা প্রণয়নের সময় দীর্ঘায়িত করা হলো?

ছবিসহ ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয়পত্র একই কার্যসূচিভুক্ত থাকলেও ভোট প্রদানের জন্য পরিচয়পত্রের কোনো ভূমিকা রাখা হয়নি। জাতীয় পরিচয়পত্র ভোটার আইডি নয়।

জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরির কারণে ভোটার তালিকা প্রণয়নে কোনো বিলম্ব ঘটেনি। ভোটার তালিকার কাজ শেষ করেই জাতীয় পরিচয়পত্র প্রস্তুতকরণ ও বিতরণের কাজ হাতে নেওয়া হয়।

জাতীয় পরিচয়পত্র প্রস্তুতকরণ ও মুদ্রণে শত শত কোটি নয়, মোট খরচ হয়েছে ৩৭ কোটি ১৭ লাখ ২২ হাজার টাকা।

চ. সীমানা পুনর্নির্ধারণে বিশেষ রাজনৈতিক দলের সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকার জনসংখ্যায় সমতা আনয়নের যুক্তি দেখালেও পুনর্নির্ধারিত নির্বাচনী এলাকার জনসংখ্যা পৌনে তিন লাখ থেকে সোয়া পাঁচ লাখ পর্যন্ত আছে।

আদমশুমারি রিপোর্ট প্রকাশের পর জনসংখ্যার ভিত্তিতে সংসদীয় আসনগুলোর সীমানা পুনর্নির্ধারণ করার আইনি বিধান আছে। ২০০৭ সালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০০১ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট প্রকাশের পর ওই রিপোর্টে প্রাপ্ত দেশের মোট জনসংখ্যা অনুযায়ী প্রতিটি আসনের গড় জনসংখ্যা ৪ লাখ ১৪ হাজার ৫১৮ জনে নির্ধারিত থাকার কথা। অর্থাৎ গাণিতিকভাবে সমুদয় ৩০০ আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করলে প্রতিটি আসনের জনসংখ্যা তা-ই হওয়া উচিত। কিন্তু যান্ত্রিকভাবে এটি করলে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত বিভাজন করতে হয়, যা সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই সীমানা নির্ধারণকে সহনীয় পর্যায়ে আনতে ৪,১৪,৫১৮-এর ২৫ শতাংশ কম-বেশি ধরে আসনগুলোর সীমানা পুনর্বিন্যাস করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত চূড়ান্ত ফলাফল নিচের ছক থেকে দেখা যাবে।

	২০০১	২০০৮
২.৭৫ লাখের নিচে	২৩	২
২.৭৫ লাখ থেকে ৩ লাখের নিচে	১৭	৭
৩ লাখ থেকে ৪ লাখের নিচে	১১২	১১৬
৪ লাখ থেকে ৫ লাখের নিচে	১০০	১৫৩
৫ লাখ থেকে ৫.২৫ লাখের নিচে	১৫	১৩
৫.২৫ লাখ থেকে ৬ লাখের নিচে	১৩	৭
৬ লাখ ও তদূর্ধ্ব	২০	২
	৩০০	৩০০

AMARBOI.COM

ওপরের ছক থেকে দেখা যাবে, ২০০১ সালে ২.৭৫ লাখের নিচে ২৩টি আসন ছিল, যা ২০০৮ সালে ২-এ নামিয়ে আনা সম্ভব হয়। একইভাবে ২০০১ সালে ৬ লাখ ও তদূর্ধ্ব জন-অধ্যুষিত আসনের সংখ্যা ছিল ২০, যা ২০০৮ সালে ২-এ নামিয়ে আনা সম্ভব হয়।

কঠোরভাবে আইনের বিধান অনুসরণ করে খসড়া তালিকা প্রকাশের পর ৭২টি আসনের পুনর্নির্ধারিত সীমানার ওপর ৩ হাজার ৬৯০টি আপত্তি গণশুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয় এবং পরবর্তী সময়ে তা Constituency Map of Bangladesh শীর্ষক সংকলনের মাধ্যমে সমুদয় তথ্যসহ সবার অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়েছে। সীমানা পুনর্নির্ধারণকাজে সবার সন্তুষ্টি বিধান সম্ভব নয়। এখানে বিবেচ্য বিষয় বিধৃত নীতিমালা অনুযায়ী কাজটি করা হয়েছে কি না। Geographical Information System ও নীতিমালা কঠোরভাবে পরিপালন করেই কাজ করা হয়েছে। গাণিতিক হিসাবের মধ্যে কোনো দলকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছ. পৌর নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে প্রতিরক্ষা বাহিনী নিয়োগের ঘোষণা সত্ত্বেও কমিশন তা করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে সরকারি দলের প্রার্থীরা বিপুল কারসাজি করেছে।

নির্বাচনের কাজে কমিশন দেশের নিয়মিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকেই ব্যবহার করার পক্ষপাতী। প্রয়োজনে এদের শক্তিশালীকরণের জন্য সরকার উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। তবু কমিশন ২৪৮টির মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ৫৬টি পৌর নির্বাচনেই সেনাবাহিনী নিয়োগ করেছিল। বাকিগুলোতে সেনাবাহিনীর শীতকালীন প্রশিক্ষণের কারণে কমিশন তাদের আর নিয়োগ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

কারচুপির অভিযোগও নিতান্তই মনগড়া। কারণ, সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহে কর্মরত নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল নির্বাচন সার্বিকভাবে সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়েছে মর্মে কমিশনে প্রতিবেদন পেশ করেছে। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতেও এই বক্তব্যের যথেষ্ট প্রতিফলন দেখা গেছে।

জ. অন্তত তিনবার মেয়াদোত্তীর্ণ ঢাকা সিটি করপোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েও সরকারের আপত্তির মুখে প্রতিবারই কমিশন কোনো কারণ ছাড়াই তাদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে। কমিশনের 'স্বাধীনভাবে' দায়িত্ব পালন করার দাবি যে কতটা বাস্তবতাবর্জিত এটাই একটি প্রমাণ।

কমিশন কখনো ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠানের শিডিউল ঘোষণা করেনি; কারণ স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) আইন ২০০৯-এর ধারা ৩৪(১) অনুযায়ী, মেয়াদোত্তীর্ণ সিটি করপোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত কমিশন এককভাবে গ্রহণ করতে পারে না। শুধু প্রথমবার গঠনের ক্ষেত্রে কিংবা মেয়াদ শেষ সমাসন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে কিংবা করপোরেশন গঠন বাতিলের ক্ষেত্রে, ১৮০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আইনি বাধ্যবাধকতা আছে। কিন্তু মেয়াদোত্তীর্ণ হলে কী করা হবে, সে সম্পর্কে আইনে সুস্পষ্ট করে কিছু বলা নেই। যে কারণে ঢাকা সিটি করপোরেশন নির্বাচনের শিডিউল ঘোষণার ক্ষেত্রে কমিশনকে সরকারের শরণাপন্ন হতে হয়। স্মর্তব্য, এই আইনের প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকারীও স্থানীয় সরকার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন নয়।

ঝ. নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচনে ৮৭.২ শতাংশ ভোটার উপস্থিতি শুধু বাংলাদেশ নয়, পৃথিবীর যেকোনো দেশের ভোটার উপস্থিতিকে ম্লান করে দিয়েছে। অনেক কেন্দ্রে ৯৮ শতাংশ এবং কয়েকটি কেন্দ্রে ১০০ ভাগেরও বেশি ভোটার ভোট দেওয়ার অভিযোগ সম্পর্কে ব্যাখ্যার অনুপস্থিতি কমিশনের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্যই নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতির হার অনেক দেশের রেকর্ডকেই ম্লান করে দিয়েছে। সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে ভোটার যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হয়, এটা তারই প্রমাণ।

সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে ভোটার উপস্থিতির হার ক্রমান্বয়েই বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিকট-অতীতে অনুষ্ঠিত দুটি সংসদ নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতির হার ছিল নিম্নরূপ: ১৯৯৬ সালে ৭৪.৯৬% ও ২০০১ সালে ৭৫.৫৪%। ২০০৮ সালে শতকরা ১০০ ভাগ সঠিক ভোটার তালিকা প্রণয়নের ফলে ও অনুকূল পরিবেশের কারণে ভোটার উপস্থিতির হার ছিল সাম্প্রতিককালের সর্বোচ্চ রেকর্ড। তবে এনডিআই-এর হিসাবমতে পূর্বতন ভোটার তালিকায় দ্বৈত ও ভুয়া ভোটার বাদ দিলে (১৩%) ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে ভোটার উপস্থিতির হারও ২০০৮ সালের সঙ্গে তুলনামূলক প্রতীয়মান হবে।

কোনো কোনো কেন্দ্রে ১০০ শতাংশ ভোট প্রদানের বিষয়ে নিবিড় তদন্তে দেখা গেছে, কতিপয় প্রিসাইডিং কর্মকর্তার অনভিজ্ঞতা ও রেজাল্ট শিট নির্দেশমতো পূরণে ব্যর্থতার কারণে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। অপ্রদত্ত ভোটকে বাতিল ভোটের কলামে দেখিয়ে মোট ভোটার সংখ্যার সঙ্গে ফলাফলের সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অবশ্য এতে ফলাফলের কোনো হেরফের হয়নি। মোট ৩৫ হাজার ২১৪টি কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র ৪৩টি কেন্দ্রে (০.১২২%) এই অঘটন ঘটেছে। এসব কারণিক ভ্রান্তি অপনোদন করে সংসদ নির্বাচনের সমুদয় ফলাফল বহু আগেই ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়, সে জন্য ফলাফল ঘোষণার ফরমও পরিবর্তন করা হয়েছে।

ঞ. শেষ সময়ে বিতর্কিত কমিশনের আগামী নির্বাচনসংক্রান্ত কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করাই যথাযথ।

এ কমিশন মোটেও বিতর্কিত নয়, কেউ কেউ অহেতুক এটিকে বিতর্কিত বানাতে চায়। একটি প্রতিষ্ঠানের বর্ষপঞ্জিতে সাত মাস অনেকটাই লম্বা সময়। জনগণের ট্যাক্সের টাকা থেকে মাসে মাসে বেতন-ভাতা নেওয়া হবে এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা হবে কিন্তু সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন না করে সাত মাস কমিশন অবসর যাপন করবে, এ পরামর্শ যেমন অযৌক্তিক, তেমনি অনাকাঙ্ক্ষিত। দায়িত্বভার ত্যাগের দিন পর্যন্ত কমিশনকে পূর্ণ উদ্যমে জনস্বার্থে কাজ করে যেতে হবে এবং সেটাই ছিল কমিশনের অঙ্গীকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে ভাবনা

যেকোনো দেশে পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান হচ্ছে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনপ্রক্রিয়াকে এক কথায় 'নির্বাচনী গণতন্ত্র' বলা হয়ে থাকে, যার মাধ্যমে ভোটাররা তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে দেশে সরকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন। বলা দরকার যে, নির্বাচনী গণতন্ত্র কিন্তু কোনো বিশ্লেষণেই পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্র নয়, যদিও আমাদের দেশের রাজনীতি এটিকেই পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্র হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা করে।

নির্বাচনী গণতন্ত্রের ধারণাটি পশ্চিমা ধ্যান-ধারণা থেকে উদ্ভূত; অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের বিষয়টি মূলত আন্তর্জাতিক এনজিও এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রতিটি যোগ্য নাগরিকের ভোটার ও প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার প্রয়োগ, নিয়মিত ও পর্যায়ক্রমিক নির্বাচন অনুষ্ঠান, নির্বাচন পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা ইত্যাদি বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা সরকারকাঠামোকে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের উপাদান হিসেবে উল্লেখ করেননি। কারণ, পাশ্চাত্যে সরকারকাঠামো কোনো বিতর্কের বিষয় নয়; দেশে সংবিধান অনুযায়ী যে কাঠামো বিদ্যমান, সেটির অধীনেই নির্বাচন সবার কাছে গ্রহণযোগ্য। আমাদের দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার-পদ্ধতি এখন একটি তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। আমি সে বিতর্কে না গিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিংবা অন্য যেকোনো ব্যবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কী কী বিষয় নিশ্চিত করা প্রয়োজন, সে সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু কথা বলতে চাই।

অবাধ নির্বাচনী ব্যবস্থার মূল ভিত্তি একটি দক্ষ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন। সাম্প্রতিক কালে নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা বৃদ্ধির পক্ষে সরকারের তরফ থেকে প্রায়ই জোরালো বক্তব্য শোনা গেছে। তবে স্বাধীনতা বলতে তারা কী বোঝাতে চায়, তার কোনো সুস্পষ্ট রূপরেখা কিংবা ব্যাখ্যা কারও কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। কমিশনের স্বাধীনতা বৃদ্ধির নামে বর্তমান কমিশন গঠনের আগে সরকার যে কাজটি করেছে তা হলো, কমিশনারদের সংখ্যা তিন থেকে পাঁচে বৃদ্ধি করে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারাটির সংশোধন। অথচ আমাদের কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি কমিশনারের সংখ্যা তিনজনে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষেই তাদের দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছিল। এই সংখ্যা বৃদ্ধিতে কমিশনের তো কোনো উপকারই হয়নি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বরং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমন্বয়ে দীর্ঘসূত্রতা ও অনাকাঙ্ক্ষিত জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে।

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য কমিশনের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা অবশ্যই একটি সঠিক পদক্ষেপ। কিন্তু স্বাধীনতার বিভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণ করে যেসব ক্ষেত্রে ঘাটতি কিংবা দুর্বলতা আছে, সেসব প্রশমনের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ না করে শুধু বক্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে তা অন্তঃসারশূন্য রাজনৈতিক বক্তব্যেই পর্যবসিত হবে।

কমিশনের স্বাধীনতা দুই ধরনের স্বতন্ত্র অথচ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত উপাদানের সার্থক সমন্বয়ের মধ্যে নিহিত। প্রথম উপাদানটি কাঠামোগত, যার সহায়তায় কমিশন প্রশাসন, প্রযুক্তি, আইনি কাঠামো ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তার ওপর বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের সক্ষমতা অর্জন করে। এই উপাদানকে সামগ্রিকভাবে কাঠামোগত স্বাধীনতা বলা যেতে পারে। স্বাধীনতার অপর উপাদানটি আচরণগত, যার প্রভাবে কমিশনাররা একক কিংবা সমষ্টিগতভাবে সব ভয়-ভীতি কিংবা অনুরাগ-বিরাগের ঊর্ধ্বে থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং তা বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকেন। স্বাধীনতার এই উপাদানকে আচরণগত স্বাধীনতা হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।

আমার অভিজ্ঞতায় আমি যত দূর দেখেছি, কাঠামোগত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এখন যথেষ্ট ক্ষমতাবান ও শক্তিশালী। নির্বাচনপ্রক্রিয়ার 'তত্ত্বাবধায়ন, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ' বিষয়ে সংবিধানে কমিশনকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে এই একই ধরনের একটি বিধান আছে এবং সেই সূত্রে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট এই মর্মে অসংখ্য রুলিং প্রদান করেছে যে সংবিধানের বিধানাবলি পরিপালন সাপেক্ষ ভারতীয় নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনার জন্য যেকোনো ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে পূর্ণ ক্ষমতাবান। বিশেষ করে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের এক রুলিংয়ে এই মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে যে, নির্বাচন পরিচালনাকালে কোনো বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবিলায় যদি বিদ্যমান আইনে কোনো বিধান না থাকে, কিংবা বিধান যদি অপ্রতুল প্রতীয়মান হয়, তবে সে ক্ষেত্রে সংবিধানের অধীনে প্রাপ্ত অবশিষ্ট ক্ষমতা অনুযায়ী কমিশন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। আবদুল মোমিন চৌধুরী কর্তৃক রুজু করা রিট নিষ্পত্তিকালে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টও ভারতীয় পূর্ব নজির উল্লেখ করে একই ধরনের সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান আইন। ২০০৮ সালে সুশীল সমাজ, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি ও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে একাধিকবার আলোচনার পর নির্বাচনে প্রার্থী নির্বাচন, নির্বাচনী প্রচারণা, নির্বাচনী ব্যয়, ভোট প্রদানপদ্ধতি, নির্বাচনী বিবাদ নিষ্পত্তি এবং রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বিরাজমান আইনের দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে পদ্ধতি উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক আকারে সংশোধনীসমূহ কার্যকর করা হয়েছে। একক সংশোধনীর মাধ্যমে এত মৌলিক, বহুমুখী ও ব্যাপক সংস্কার বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের ইতিহাসে এই প্রথম।

২০০৮ সালে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় অধ্যাদেশ জারির পর কমিশনের স্বাধীনতার বিষয়টি এই প্রথমবারের মতো একটি প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কমিশন সচিবালয়কে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে বিযুক্ত করে এটিকে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। নিজস্ব সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ, জনবল নিয়োগ ও অর্থ ছাড়করণের ক্ষেত্রে কমিশনকে এমন ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, যেন এসব প্রক্রিয়ায় কমিশনকে বারবার সরকারের দ্বারস্থ হতে না হয়।

দুঃখের বিষয়, সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের আমলাতন্ত্রের অসহযোগিতার কারণে পূর্ণমাত্রায় এই লক্ষ্যের বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না। এই দুই মন্ত্রণালয়েরই নিম্ন ও মধ্য পর্যায়ের আমলারা অন্যান্য মন্ত্রণালয় কিংবা সংস্থা থেকে পাওয়া প্রস্তাবগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এত অভ্যস্ত যে তাদের নিরীক্ষা ছাড়া কোনো সরকারি আদেশ জারি করার মানসিকতা তাদের নেই। তাদের মানসিকতার পরিবর্তন হলেই তারা সচিবালয় আইনের মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারবে এবং কমিশনের কাঠামোগত স্বাধীনতার পক্ষে একটা বিরাট বাধা অপসারিত হবে।

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য কমিশনের কাঠামোগত স্বাধীনতার প্রয়োজন কিন্তু এটি যথেষ্ট নয়। দেশের বিভাজিত রাজনীতির প্রেক্ষাপটে সর্বজনশ্রদ্ধেয়, অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হওয়া প্রয়োজন, যাঁরা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবেন। কমিশনাররা সরকারি পর্যায়ে অনেক উচ্চ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত; ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্সে তাঁদের অবস্থান প্রতিমন্ত্রীদের সমতুল্য। বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনার যথাক্রমে আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকদের মতোই এসব সুবিধা ভোগ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকেন। এ কারণে সরকারের সচিব কিংবা হাইকোর্টের বিচারপতি পদমর্যাদার নিচে কোনো ব্যক্তিকে কমিশনার হিসেবে নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা সমীচীন নয়। স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে কখনোই সচিব পদমর্যাদার নিচে কাউকে নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। পাকিস্তানেও শুধু সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরাই কমিশনারদের পদ অলংকৃত করেছেন। এখানে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কমিশন সচিবালয় একজন সচিবের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। সে অবস্থায় তার নিচের পদমর্যাদার কেউ তার ওপর সমাসীন হলে সচিবালয়-কমিশন সম্পর্কেও নানা ধরনের বাড়তি ঝামেলার সৃষ্টি হয়।

কমিশনার নির্বাচনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয়, প্রার্থীদের অতীত সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য উদ্‌ঘাটন। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে লেজুড়বৃত্তির ছাত্ররাজনীতির কারণে ছাত্রজীবনে কিংবা পরবর্তীকালে বিভিন্নভাবে শিক্ষাগত কিংবা অন্যান্য যোগ্যতার মাপকাঠিতে অনেকেই কমিশনার পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য বিবেচিত হলেও শুধু রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার কারণে তাঁরা এই পদের জন্য উপযুক্ত না-ও হতে পারেন। সঠিকভাবে অনুসন্ধান করলে আমাদের দেশে মেধা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, চাকরিজীবনের অভিজ্ঞতা, আর্থিক যশ ও সুনামের অধিকারী বহু কর্মকর্তার হদিস পাওয়া সম্ভব। দুর্ভাগ্যবশত রাজনৈতিক বিচারে এঁরা উপযুক্ত হন না দেখেই এঁদের কথা কেউ চিন্তা করে না। ১৯৭২ সালে প্রণীত আমাদের সংবিধানে কমিশনারদের নিয়োগের জন্য আইন প্রণয়নের বিধান করা হলেও স্বাধীনতার ৪১ বছর পরও এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। আমাদের কমিশন উদ্যোগী হয়ে কমিশনারদের নিয়োগ বিবেচনাকালে যোগ্যতা-অযোগ্যতার কিছু মান নির্ধারণ করে একটি আইনের খসড়া সরকারের বিবেচনার জন্য পেশ করেছিল। সেই খসড়ায় আরও প্রস্তাব করা হয়েছিল যে নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ যেন সব দলের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সম্পন্ন করা হয়। সে লক্ষ্যে বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সমন্বয়ে একটি সার্চ কমিটি গঠন করে তাদের সুপারিশ জাতীয় সংসদের কার্য উপদেষ্টা কমিটির বিবেচনা ও অনুমোদনেরও প্রস্তাব করা হয়েছিল। কার্য উপদেষ্টা কমিটিই সংসদের একমাত্র কমিটি, যেখানে সরকারপ্রধান, বিরোধীদলীয় নেতা ও সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী অন্যান্য দলের নেতারা সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত আছেন। দুঃখের বিষয় এই যে বর্তমান কমিশন গঠনকালে বাছাইকারী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কমিটিসংক্রান্ত সুপারিশটি ব্যতিরেকে সরকার আর কোনো সুপারিশ কার্যকর না করে তড়িঘড়ি ওই কমিটির মাধ্যমে মনোনয়ন সংগ্রহ করে এবং জনগণ, মিডিয়া, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং সংসদীয় কোনো কমিটির যাচাই-বাছাই ছাড়াই তা চূড়ান্ত করে। ফলে নবগঠিত কমিশনের সদস্যদের যোগ্যতা এবং তাঁদের অতীত রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা সম্বন্ধে জনমনে নানা সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে এবং অনেক রাজনৈতিক দলই তাঁদের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেছে।

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণার ক্ষেত্রে সবার জন্য সমতার নীতি আর ভোটারদের অবাধে ভোট প্রদানের নিশ্চয়তার বিধান। আমাদের সময়ে বিভিন্ন নির্বাচন পরিচালনা করে আমি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়ার বিষয়ে দুটি মূল প্রতিপাদ্যে উপনীত হয়েছি, যার ভিত্তিতে নির্বাচন পরিচালনা পদ্ধতি নির্ধারণ করা সংগত হবে।

১. যে ধরনের সরকারকাঠামোই থাকুক না কেন, নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে নানাভাবে ব্যাহত করে যেকোনোভাবে জয়ী হওয়ার জন্য রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীরা চেষ্টা চালান।
২. নির্বাচন কমিশন নিজস্ব কর্মকর্তা সহযোগে সরেজমিনে নির্বাচনপ্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে (১)-এ বর্ণিত প্রবণতা নিয়ন্ত্রণে সক্ষম।

উপরিউক্ত দুই প্রস্তাবের ভিত্তিতে নির্বাচন পরিচালনা করতে হলে নির্বাচনের সময় কমিশনের নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রের বিস্তার যত ছোট হবে, কমিশনের কার্যকারিতা তত বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে, যদি নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সেনাবাহিনী ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে একই দিনে সারা দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই নির্বাচনী আইন লঙ্ঘন কিংবা সহিংসতার মুখে বিপন্ন হতে পারে। আমাদের কমিশনের অভিজ্ঞতার আলোকে আমি মনে করি, জাতীয় সংসদ কিংবা উপজেলা-পৌরসভা কিংবা ইউনিয়ন পরিষদ—এসবের কোনো নির্বাচনই একই দিনে অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকা কমিশনের জন্য প্রশাসনিকভাবে যেমন সুবিধাজনক, তেমনি ভোটারদের ভোট প্রদানের জন্যও নিরাপদ। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে তাই সব নির্বাচন পর্যায়ক্রমিক হতে হবে।

প্রভাবশালী প্রার্থীরা, বিশেষ করে সরকারদলীয় প্রার্থীরা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচির মাধ্যমে সমতার নীতি ব্যাহত করার চেষ্টা চালান। আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঠপর্যায়ের প্রশাসনকে স্তরে স্তরে নিজেদের আস্থাভাজন কর্মকর্তাদের দিয়ে সাজানোর ইতিহাস তো আমরা জানি। প্রশাসনের অনাকাঙ্ক্ষিত দলীয়করণ সব সময়ই গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিরাট বাধা। আমি অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি যে হাতেগোনা কতিপয় অঙ্গসংগঠনের ক্যাডার, যাঁরা পরবর্তীকালে বিসিএস ক্যাডারে চাকরিপ্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা বাদে বাকিরা নিরপেক্ষতার সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে চান। অনেক সময়ই ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে তাঁদের অনেক অপকর্মে লিপ্ত হতে হয়। নির্বাচনের সময় নির্বাচনসংক্রান্ত সব বিষয়ে এবং নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে বিদ্যমান সরকারের এমন সব সিদ্ধান্তের ওপর নির্বাচন কমিশনের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ কঠোর করতে হবে।

সবশেষে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার অবারিত হতে হবে। সনাতন পদ্ধতিতে সিল-ছাপ্পর দিয়ে ভোট প্রদানের পদ্ধতি অনেক অনাচারের সৃষ্টি করেছে। এসব খুঁটিনাটি সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য আমরা ইভিএম পদ্ধতি ব্যবহারের উদ্যোগ নিই। একইভাবে সীমানা পুনর্নির্ধারণে আমরা জিআইএস পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছি। ভবিষ্যতে অহিনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েনের ক্ষেত্রেও জিআইএস অবদান রাখতে পারে। আর ছবিসহ ভোটার তালিকা ও পরিচয়পত্র প্রণয়নের প্রযুক্তি এখন কমিশনের রুটিন কাজের মতো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অফিস পর্যন্ত ব্যাপৃত হয়েছে।

১৯৯১ সালে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর দেশের চারটি ভিন্ন ভিন্ন কমিশন কর্তৃক চারটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেশি ও আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী দল এবং গণমাধ্যম সব কটি নির্বাচন সার্বিক সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়েছে মর্মে প্রত্যয়ন করার পরও পরাজিত দল এবং প্রার্থীরা সব কটি নির্বাচনের ফলাফলই প্রত্যাখ্যান করেছে। এই ধরনের হতাশাব্যঞ্জক অভিজ্ঞতার আলোকে নির্বাচন কমিশনের কাঠামোগত ও আচরণগত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা হলেও এবং সাধ্যাতীত ভালো নির্বাচন অনুষ্ঠান করা গেলেও সব রাজনৈতিক দল তা নির্দ্বিধায় মেনে নেবে কি না, আমার সন্দেহ আছে। এ জন্য যে উদার মন ও মানসিকতার প্রয়োজন, তা আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নেই। সে কারণেই শুধু নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীনতা প্রদান করলেই তা যথেষ্ট হবে না। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের সবচেয়ে বড় স্টেকহোল্ডার রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা ও সহমর্মিতারও প্রয়োজন হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য মুখ্য প্রতিষ্ঠান হলেও এই প্রক্রিয়ায় বহুবিধ সংগঠন ও বিভিন্ন সংস্থার লাখ লাখ কর্মী ভোট গ্রহণের আগে ও পরে কয়েক সপ্তাহ সম্পৃক্ত থাকেন। অসংখ্য খুঁটিনাটি বিষয় সামাল দিতে গিয়ে মানবিক ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের দেশের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলগুলো এই ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে স্বাভাবিক মানবিক দুর্বলতা হিসেবে ক্ষমাসুন্দর চোখে না দেখে পোলিং স্টাফ তথা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সজ্ঞানে ভোটের ফলাফলকে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা হিসেবে জনসমক্ষে তুলে ধরেন। অবশ্য এঁদের মধ্যে হাতে গোনা দু-চারজন ইচ্ছাকৃতভাবে আচরণবিধি লঙ্ঘন কিংবা পদ্ধতির হেরফের করতে পারেন। কিন্তু সংখ্যায় এঁরা এত নগণ্য যে এঁদের হিসাবে না আনাই সমীচীন। তবু কথিত এসব ত্রুটি-বিচ্যুতিকে অনেক সময়ই বিশাল আকারের একটা অপকর্ম হিসেবে তুলে ধরে সমগ্র নির্বাচন প্রচেষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। অথচ আমাদের মতো উন্নয়নশীল অনেক দেশেই এ ধরনের বিচ্যুতি নিয়ে কেউ এক মুহূর্তের জন্যও তাঁদের মূল্যবান সময় নষ্ট করতে চান না।

এ প্রসঙ্গে ২০১১ সালের এপ্রিল মাসে নাইজেরিয়ার জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণকালে সংঘটিত বিরাট আকারের বিপর্যয়ের কথা উল্লেখ করতে পারি। ওই বছর ৯ এপ্রিল সকাল আটটা থেকে বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও বেশ কিছু কেন্দ্রে কোনো পোলিং স্টাফ কিংবা ভোটের মালামাল তখনো পৌঁছায়নি। কেন্দ্রের বাইরে সারিবদ্ধ ভোটারদের বিপুল উপস্থিতি, কিন্তু তাদের দেখার কেউ নেই। আবার কোনো কোনো ভোটকেন্দ্রে দেরিতে হলেও ভোট গ্রহণ শুরু হয়। এমন সময় দুপুরের দিকে অনেকগুলো কেন্দ্রের পোলিং-স্টাফ আবিষ্কার করে যে তাদের কাছে পর্যাপ্ত ব্যালট ও রেজাল্ট শিট নেই। এমন পরিস্থিতিতে দুপুরের পর নাইজেরীয় নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান দেশব্যাপী ভোট গ্রহণ স্থগিত করে প্রথমে ৪ এপ্রিলে ও পরে ৯ এপ্রিল ভোট গ্রহণের তারিখ পুনর্নির্ধারণ করেন। এ ধরনের গুরুতর বিচ্যুতি অবশ্যই নির্বাচন কমিশনের অব্যবস্থাপনা ও অদক্ষতার পরিচয় বহন করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সব কটি রাজনৈতিক দলই বিষয়টি নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য না করে কমিশনের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে এক অভূতপূর্ব দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়। তাদের এই উদার দৃষ্টিভঙ্গি দেশকে এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের হাত থেকে রক্ষা করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর যে গতিপ্রকৃতি, তাতে তারা প্রয়োজনে এ ধরনের উদারতা দেখাবে, তেমনটা কেউ আশা করে না। তবে আমাদের দেশে আসলেই সংঘটিত ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যই যে শুধু নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করা হয়, তা নয়। অনেক সময়ই কল্পিত ও সূক্ষ্ম কারচুপির অজুহাত তুলেও সার্বিকভাবে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনকে বিতর্কিত করার চেষ্টা করা হয়। নির্বাচনে পরাজয় মেনে না নেওয়ার মানসিকতা থেকে এই ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। আমাদের রাজনীতিবিদেরা পশ্চিমা ধাঁচের গণতন্ত্রের গুণকীর্তনে সোচ্চার। কিন্তু ওই সব দেশে গণতন্ত্রচর্চার, বিশেষ করে দলীয় রাজনীতি পরিচালনায় যুগ যুগ ধরে প্রচলিত যেসব লিখিত ও অলিখিত বিধান আছে, সেগুলোর অনুসরণ তো দূরের কথা, সেগুলো সম্পর্কে কোনো আলোচনা করতেও কেউ আগ্রহী হন না। ওই সব দেশে সংসদ নির্বাচনে পরাজিত দলের নেতা পরাজয়ের দায়দায়িত্ব নিয়ে নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ান। আমাদের দেশে এই রীতি নেই, বরং পরাজয়ের দায়ভার অন্যের ওপর চাপিয়ে নেতারা পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্ত হতে চান। এটা জাতীয় পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সমভাবে বিস্তৃত এবং সে জন্য পরাজয়ের বিরুদ্ধে যুক্তি তৈরি করার জন্য একটা ঐকতানের সৃষ্টি করা হয়। সম্ভাব্য পরাজয়ের পক্ষে যুক্তি তৈরি করা প্রতিটি রাজনৈতিক দলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকেই এই কৌশলের ওপর কাজ শুরু হয়। দলীয় কর্মীরা নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা লঙ্ঘন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষপাতিত্ব এবং নির্বাচনের দিন ভোট জালিয়াতি ও কারচুপির ওপর অবিরাম অভিযোগ করতে থাকেন।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, যেসব আসনে দলীয় প্রার্থীর বিপুল ভোটে জয়ের সম্ভাবনা আছে, সেসব আসনেও শুরু থেকেই তাঁরা অনিয়ম, কারচুপি ও পক্ষপাতিত্বের নানা অভিযোগ রিটার্নিং কর্মকর্তা, কমিশন কিংবা মিডিয়ার কাছে পেশ করতে থাকেন। ফল প্রকাশের পর এত জাল-জুয়াচুরির পরও তাঁরা কীভাবে জয়ী হলেন, জিজ্ঞেস করলে তাঁদের বাঁধা উত্তর—কারচুপি অবশ্যই হয়েছে, না হলে আমরা আরও অধিক ভোটে জয়ী হতাম। এসব অভিযোগের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এগুলো সব মৌখিকভাবে মুঠোফোন কিংবা এসএমএসের মাধ্যমে করা হয়। অথচ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ হলো: অভিযোগ লিখিত হতে হবে, যেখানে অপরাধের ধরন, অপরাধ সংঘটনের স্থান, সময়, কাল এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিযোগকারীর সম্পূর্ণ পরিচিতি লিপিবদ্ধ থাকতে হবে। কিন্তু শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায় না। তবু এসব বায়বীয় অভিযোগের ভিত্তিতেই ১০ লক্ষাধিক লোকের মাসাধিক কালের অক্লান্ত পরিশ্রমে অনুষ্ঠিত নির্বাচনকে তাঁরা পক্ষপাতদুষ্ট, প্রহসনমূলক কিংবা সূক্ষ্ম কারসাজির শিকার আখ্যা দিয়ে সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচনকে বিতর্কিত করতে চান। অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে নির্বাচন কমিশন পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়ার পর সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কলাকৌশল উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করে সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা করলেও তা সুষ্ঠু ও সর্বজনীন বলে স্বীকৃতি পাবে না। সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত নির্বাচন 'সুষ্ঠু হয়েছে' এই মর্মে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব রাজনৈতিক দলের প্রত্যয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

আমাদের দেশে নির্বাচনপ্রক্রিয়ার একটি মৌলিক দুর্বলতা হচ্ছে স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অংশীদারির অভাব। ঘটনাচক্রে নির্বাচন কমিশন আর রাজনৈতিক দলের মধ্যে একটা অনাকাঙ্ক্ষিত বিভাজনের সৃষ্টি হয়েছে। যেন নির্বাচন কমিশন একটি পক্ষ, যারা নির্বাচন অনুষ্ঠান করবে এবং রাজনৈতিক দল আরেকটি পক্ষ, যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। বিষয়টিকে এভাবে বিন্যস্ত না করে সম্পূর্ণ বিষয়টিকে যদি একটি সম্মিলিত ও একক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা হয়, তাতে পক্ষের ধারণাটির পরিবর্তে অংশীদারির বিষয়টি মুখ্য হয়ে উঠবে। অংশীদারেরা নিজ নিজ দায়িত্বের ভার বহন করেই যাঁর যাঁর কাজটি করে থাকেন। এ ক্ষেত্রেও যদি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের পক্ষ মনে না করে অংশীদার হিসেবে নির্বাচন ব্যবস্থাপনাকে সাজানো হয়, তবে অবশ্যই সঠিকভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়ভার অনেকটাই তাদের ওপর অর্পণ করা সম্ভব।

এই আঙ্গিকে পরীক্ষামূলকভাবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের কিছু দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। যেমন নির্বাচনী আচরণবিধি পরিপালনের বিষয়ে অংশগ্রহণকারী সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে কয়েকটি সংসদীয় আসনের জন্য একটি করে 'যৌথ মনিটরিং কমিটি' মাঠে নামানো যেতে পারে। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মিলিতভাবে এই কমিটির কর্মপরিধি ও দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করা যেতে পারে। প্রতিটি নির্বাচনের পর যৌথ মূল্যায়নের মাধ্যমে পর্যালোচনা করে এর গঠন ও কর্মপরিধি প্রয়োজনে পরিবর্তন করা যেতে পারে। কয়েক দফা পরীক্ষার পর এই কমিটি সফল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রমাণিত হলে সব আসনের জন্যই পর্যায়ক্রমে এ ধরনের কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

একইভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সম্মিলিতভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালনের জন্য ওই এলাকার রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে 'ভোটকেন্দ্র শৃঙ্খলা কমিটি' গঠন করা যেতে পারে এবং একইভাবে পর্যায়ক্রমে এটি সব কেন্দ্রেই বিস্তৃত করা যেতে পারে। অংশীদারির এ ধারণাকে এগিয়ে নিয়ে সব প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণাও প্রজেকশন সভার মাধ্যমে যৌথভাবে নিষ্পন্ন করা যায়। আরও অনেক নির্বাচনপ্রক্রিয়া আছে, যেখানে রাজনৈতিক দলগুলোকে সম্পৃক্ত করে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়ভার তাদের ওপর অর্পণ করা যায়। নির্বাচন অনুষ্ঠান বহুবিধ প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত প্রয়াস। রাজনৈতিক দলের পরাজয় মেনে না নেওয়ার সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের এককভাবে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায় থেকে মুক্ত হতে হবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~